বুদ্ধদেব বসু : নানা প্রসঙ্গ

সম্পাদনায় : আনন্দ রায়

বর্ণালী
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা—৭০০০০৯

গ্রন্থস্বত্ব :
আনন্দ রায়

প্রথম প্রকাশ :
মার্চ, ১৯৬০

প্রকাশক :
কান্তিরঞ্জন ঘোষ

প্রচ্ছদের স্কেচ :
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক :
অরুণ কুমার বোস
নিউ বঙ্গশ্রী প্রেস
১২/২ মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

আমাদের সকলের সামনে বুদ্ধদেব বসুকে
প্রকাশিত ও বিকশিত করার পেছনে যাঁর অবদান অনেক, সেই
শ্রদ্ধেয় সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষকে—

নবীন কবি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯৩১]

কিছুকাল পূর্বে একবার যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে ঢাকায় গিয়েছিলুম ; তখন বুদ্ধদেব বসুর একখানি কবিতা আমার হাতে পড়ে। সেই সময়ে তাঁর কিশোর বয়স। মনে আছে লেখাটি পড়ে আমার কোন একজন সঙ্গীকে বলেছিলুম, এই কবিতায় ছন্দ, ভাষা এবং ভাব গ্রন্থনের যে পরিচয় পাওয়া গেল তাতে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হয়েছে কেবল কবিত্ব-শক্তিমাত্র নয় এর মধ্যে কবিতার প্রতিভা রয়েচে, একদিন প্রকাশ পাবে।···বোধকরি মহাযুদ্ধের অপঘাতে বা অন্য গভীরতর ভূমিকম্পে য়ুরোপের ভিং নড়ে গেছে। সেখানে সাহিত্যে-শিল্পে-সমাজে-বাণিজ্যে আজ সর্বত্রই যে একটা কষ্টকল্পনা দেখা যাচ্চে সেটাকে যদি আমরা উৎকর্ষের লক্ষণ মনে করি তবে প্রদীপের শিখার অন্তিম চাঞ্চল্যকেও তেলের প্রাচুর্যের লক্ষণ বলে মনে করা যেতে পারে। অনেক সভ্যতা য়ুরোপীয় শরৎকালের বনপল্লবের মতো মরবার আগে অতি প্রগল্‌ভ রং ফলিয়ে গেছে। সেটাকে বসন্তের উপরে টেক্কা দেওয়া বলে কেউ যেন ধরে না নেন। মাঝে মাঝে ভয় হয়েছে আমরা য়ুরোপের বর্তমান কালকে চিরকাল বলে মেনে নেবার ভুল করছি।

যাইহোক বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে বেশি কথা বলবার অধিকার আমার নেই। দৈবক্রমে বুদ্ধদেব বসুর লেখার প্রথম যে পরিচয় পেয়েছিলুম তার থেকে আমার মনের মধ্যে এ বিশ্বাস ছিল যে বাংলাসাহিত্যে নিঃসন্দেহে তিনি সম্মান লাভ করবেন। আগামীকালের সাহিত্যদৌবারিক যাঁরা, যথাযোগ্য আসনে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ভার তাঁদেরই পরে। টিকিট তাঁরাই দেখে নেবেন, আমরা বাইরে থেকে নমস্কার করে বিদায় নেব।

সম্প্রতি দিলীপকুমার কয়েকটি কাঁচি-ছাঁটা পাতায় তাঁর আপন মন্তব্যের দ্বারা পরিকীর্ণ করে বুদ্ধদেব বসুর ছয়টি কবিতা আমাকে পড়তে পাঠিয়েচেন। তার মধ্যে কয়েকটি কবিতা সবটা দেননি। যে কয়টি ও যতটুকু কবিতা পাওয়া গেল পড়ে খুসি হলুম। খুসি হলুম বললে মনে হবে মুরুব্বিয়ানা করচি। কেননা যখন-তখন

ব্যবহারের ঘর্ষণে ঐ কথাটার ধার ক্ষয়ে গেছে। তবু বলতে হবে খুসি হওয়ার চেয়ে বড়ো দাম কবিতার পক্ষে আর কিছু নেই। এই রচনাগুলি জলভরা ঘনমেঘের মতো, যার ভিতর থেকে সূর্যের আলোর রক্তরশ্মি বিচ্ছুরিত। ভয় ছিল পাছে সৃষ্টি ছাড়া নূতনত্বের দলদর্প প্রয়াস দেখা যায়। সে দুর্লক্ষণ না দেখে আরাম পেয়েছি। কবিতাগুলিতে সহজ স্বকীয়তার গাম্ভীর্য ছন্দে ভাষায় ও উপমায় ঐশ্বর্যশালী।

যে কয়টি কবিতা আমার সামনে এসে পড়েছে তার বাইরে নিশ্চয় আরো অনেক লেখা আছে। হয়তো কেবলমাত্র এই লেখাগুলি নিয়ে সমগ্রভাবে কবির বিচার করা সঙ্গত হবে না। তার হাতে যে যন্ত্রটি আছে তার কতকগুলি তন্ত্র, তার কোন কোন পর্দায় কত রকমের সুরের মীড় লেগেছে, তা বলতে পারলুম না। যে লেখা কয়টি দেখলুম তার সমস্তগুলি নিয়ে মনে হোলো এ যেন একটি দ্বীপ। এই দ্বীপের বিশেষ একটি আবহাওয়া, ফল ফুল, ধ্বনি ও বর্ণ। এর সরল উর্বরতার বিশেষ একটি সীমার মধ্যে এক জাতীয় বেদনার উপনিবেশ। দ্বীপটি সুন্দর কিন্তু নিভৃত হয়তো এর পরে দেখা যাবে দ্বীপপুঞ্জ, হয়তো প্রকাশ পাবে উদার বিচিত্র মহাদ্বীপে "তমালতালীবনরাজিনীলা" তটরেখা। কিন্তু সৃষ্টি সম্বন্ধে ফরমাস চলে না। যা পাওয়া গেল সব যদি গজমুক্তার কৌটো হয় তবে আবদার করলে চলবে না কই কোথায়।

'বিচিত্রা', কার্তিক—১৩৩৮

হঠাৎ আলোর ঝলকানি

প্রমথ চৌধুরী

[১৯৩৫]

"হঠাৎ আলোর ঝলকানি" একখানি নতুন বই। এ বইয়ের লেখক শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু। শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব জনৈক তরুণ লেখক হলেও পাঠক সমাজের নিকট সুপরিচিত। কারণ তাঁর কলম ইতিমধ্যেই বহু গল্প উপন্যাসের প্রসব করেছে। বুদ্ধদেবের লেখনীর সৃজনশক্তি অফুরন্ত—বারোমাসই তা যুগপৎ ফলন্ত ও ফুলন্ত।

বই লিখলেই আমরা নিন্দা প্রশংসার ভাগী হই। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ লেখকের কপালে যা জোটে সে হচ্ছে - সমালোচকের মুরুব্বিয়ানা, স্বল্প নিন্দা অথবা স্বল্প প্রশংসা কিন্তু বুদ্ধদেবের কপালে যে নিন্দা প্রশংসা জুটেছে তার একমাত্র বিশেষণ হচ্ছে 'অতি'। এই 'অতি' জিনিশটাকে আমি ডরাই, কারণ আমার বিশ্বাস যে অতিনিন্দুক এবং অতিস্তাবক উভয়েই সাহিত্যের বাজারে একদরের জরুরী। এই কারণেই বুদ্ধদেবের কোনো লেখা সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে আমার কখনো উৎসাহ হয়নি। এ ক্ষেত্রে সমালোচনার অর্থ হচ্ছে বাক্-বিতণ্ডা। আর এক কথা, আমি যদি এ ক্ষেত্রে সমালোচনার বাম মার্গ অবলম্বন করতুম, তাহলে লোকে বলত যে আমি শিঙ্ বাঁকাচ্ছি হিংসেয়, অপর পক্ষে আমি যদি দক্ষিণ মার্গ অবলম্বন করতুম, তাহলে লোকে বলত আমি শিঙ্ ভেঙে বাছুরের দলে মিশেছি।

আজকে যে তাঁর নতুন বইখানির প্রশংসা করতে উদ্যত হয়েছি, তার কারণ এখানি প্রবন্ধের বই—গল্পের বই নয়। বিশেষতঃ এ প্রবন্ধগুলি আমরা যে জাতীয় প্রবন্ধ লিখি সে জাতীয় প্রবন্ধ নয়। অর্থাৎ এ সব প্রবন্ধের এমন কোন বিষয় নেই, যা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পেতে পারে। জিওগ্রাফি, হিস্টরি, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম কিংবা নীতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেননি। বলা বাহুল্য যে, কোন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ সেই বিষয়ই আমাদের লেখায় সাহায্য করে। কিন্তু মনকে সেই বিষয়ের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ করাই এ জাতীয় প্রবন্ধ লেখকের প্রধান কর্তব্য। এ জাতীয় জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের অন্তরে মন থাকে কি নাও থাকতে পারে—।

কিন্তু আর-এক জাতীয় প্রবন্ধ আছে, যার উদ্দেশ্য যে-কোনো নিত্য পরিচিত নগণ্য বিষয় অবলম্বন ক'রে লেখকের আত্মপ্রকাশ করা। এ পুস্তকে একটি প্রবন্ধ আছে, যার বিষয় হচ্ছে "বাথরুম"। অবশ্য এ-বিষয়েও গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লেখা যায়। মহেঞ্জদারোয় যখন ড্রেন ছিল, তখন বাথরুমও নিশ্চয় ছিল; তবে কি আকারের স্নানাগার ছিল আর ডারউইনের evolution অনুসারে এ-যুগে তা কি আকার ধারণ করেছে, সে বিষয়ে অবশ্য এমন thesis লেখা যায় যার প্রসাদে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি লাভ করতে পারি।

কিন্তু বুদ্ধদেব সে-জাতীয় প্রবন্ধ লেখেন নি। তিনি বাথরুমকে উপলক্ষ্য ক'রে নিজের কতকগুলি মানসিক ও শারীরিক অনুভূতির এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি আত্মচিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। Lamb এ-জাতীয় প্রবন্ধকারদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য এবং তাঁর প্রবন্ধাবলী অতুলনীয়। এ-জাতীয় প্রবন্ধ মানুষের এত ভালো লাগে, কেননা তার প্রসাদে লেখক নামক একটি মানুষকে পুরো পাওয়া যায়। এবং সেই সঙ্গে নিজের মনের সূক্ষ্ম শরীরের।

আমি অবশ্য বুদ্ধদেবকে Lamb-এর সঙ্গে এক ব্র্যাকেটভুক্ত করতে চাইনে। আমার উদ্দেশ্য বুদ্ধদেবের প্রবন্ধের জাত চিনিয়ে দেওয়া। আর এই শ্রেণীর প্রবন্ধকেই যথার্থ সাহিত্য বলা হয়। এ-জাতীয় প্রবন্ধের প্রধান গুণ হচ্ছে তা কিছুই প্রমাণ করতে চায় না, কোনো-কিছু শিক্ষা দিতে চায় না। সুতরাং fact ও logic-এর লৌহশৃঙ্খল থেকে এ-রকম লেখা মুক্ত। এর ভিতর যে fact আছে, সে হচ্ছে লেখকের ব্যক্তিগত শরীর ও মনের fact। আমাদের ব্যক্তিত্ব দেহ ও এ-দুয়ের যোগফল মাত্র।

এ-শ্রেণীর প্রবন্ধ যদি প্রলাপ না হয়, যদি তার কোনো রূপ থাকে ত সে-রূপ আমাদের বৈষয়িক মনের ভিতরে কি বাইরে যে মন আছে সেই অনির্দিষ্ট মনকে স্পর্শ করে, আর নানা চিন্তার উদ্রেক করে। বুদ্ধদেবের প্রবন্ধগুলির ভিতর সেই রূপ আছে। তাঁর প্রবন্ধগুলি হ য ব র ল নয়। তাঁর দু-টি প্রবন্ধ আমার খুব ভালো লেগেছে। একটির নাম "রূপ ও স্বরূপ"—অপরটির "মৃত্যু জল্পনা"। আমার মতে "মৃত্যু জল্পনা"-ই এ-পুস্তকের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। দেহ ও মন ঐকান্তিক অবসাদগ্রস্ত হ'লে মানুষের অর্ধমৃত অর্ধজীবিত মনের যে-অবস্থা হয়, তার চমৎকার বর্ণনা। আর যিনি কখনো নিজের মনের ও অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, তিনিই স্বীকার করতে বাধ্য যে বুদ্ধদেবের বর্ণনা কাল্পনিক নয়, বাস্তবিক। আমি যথার্থ পাঠককে এ-প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ করি।

এখানে আমি লেখকের ভাষা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলতে চাই। বুদ্ধ. বসু

গল্পের ভাষায় ও ভাবের অন্তরে ইংরাজিতে যাকে বলে forced তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যেত। সম্ভবতঃ এ-ও একটা কারণ যার দরুণ তাঁর লেখা অতি নিন্দিত এবং অতি প্রশংসিত হয়েছিল। Forced-সাহিত্য forced-সমালোচনা টেনে আনে।

কিন্তু "রূপ ও স্বরূপ" এবং "মৃত্যু জল্পনা" প্রভৃতি লেখা ভাষায় বহ্বাস্ফোটন ও ভাবের বুক-ফোলানো রূপ থেকে প্রায় মুক্ত। আমরা কোনো লেখকের muscle দেখতে চাইনে, দেখতে চাই তাঁর মন। আর মনের শক্তির একমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় তার আলোয়। আর রঙ্ জিনিষটে যার জন্যে আমরা সাহিত্যিকমাত্রেই লালায়িত তা হচ্ছে আলোরই বিকার। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন আলো জিনিষটা কি? তার উত্তর— কথার জোরে অন্ধের চোখ ফোটানো যায় না।

বুদ্ধদেব কি রকম ভাষায় লিখতে চান, তার পরিচয় তিনি নিজ মুখেই দিয়েছেন। তিনি স্বয়ং সরস্বতীকে বলেছিলেন, 'দেবি! ভাষা এত দুর্বল কেন? ভাষার সেই রহস্য আমাকে বলো যাতে তা দীপ্ত কৃপাণ হ'য়ে ওঠে, প্রবল বন্যা হ'য়ে ওঠে দুরন্ত বহ্নিশিখা।'

লেখকের মহাসৌভাগ্য যে, দেবী সরস্বতী তাঁকে সে-রহস্য বলেন নি। কেননা তাহ'লে বুদ্ধদেবের রচনারীতি হ'য়ে উঠত আলঙ্কারিকেরা যাকে বলেন গৌড়ীরীতি আর ইংরেজেরা যাকে বলেন bombast। ফলে সে ভাষা হ'য়ে উঠত প্রবল বন্যার মতো, দুরন্ত অগ্নিশিখার মতো। অর্থাৎ সাহিত্য জগতে একটি ভীষণ উৎপাত। আমরা পাঠকরা এ-জাতীয় উৎপাতকে ভয় করি, ভালবাসিনে।

সে যাই হোক, তাঁর "বাথরুম"-এও 'দুর্বার জলরাশি'র সাক্ষাৎ আমরা পাইনি, আর তাঁর ক্লাইভ ষ্ট্রীটের চাঁদও দুরন্ত বহ্নিশিখা নয়।

বন্যা, তুফান, অগ্ন্যুৎপাতাদির সঙ্গে কোনরূপ সাদৃশ্য না-থাকলেও ভাষার অন্তরে যে প্রাণ ও স্পষ্ট গতি থাকতে পারে তার প্রমাণ বুদ্ধদেবের কোনো-কোনো প্রবন্ধের মধ্যে পাওয়া যায়। "রূপ ও স্বরূপ"-এর স্বচ্ছন্দ গতি মুক্তছন্দ গদ্যের প্রকৃষ্ট নমুনা। এর ভিতর বন্যা নেই, স্রোত আছে, কিন্তু সে-স্রোত মনকে টেনে নিয়ে যায়।··· বুদ্ধদেবের ভাষার স্পষ্ট গুণ তার গতি ও প্রাণ'।

"বিচিত্রা", অগ্রহায়ণ ১৩৪২

'অশ্লীলতার কাব্য'

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

[১৯৩২]

...এই প্রতিভাশালী নবীন কবি কাব্যামোদী সমাজে সুপরিচিত। কিছুদিন পূর্বে 'অতি আধুনিক' সাহিত্যের প্রতি যে তীব্র বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছিল, তাহার অনেকখানি এই কবিকে সহিতে হইয়াছে। তথাপি বিশেষভাবে যে দু-একটি কবিতা বাজারচালান নীতির মাপকাঠিতে অপাঠ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল, এই গ্রন্থে তাহা হুবহু সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবি যে দুঃসাহসী, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 'দুঃসাহসে দুঃখ হয়'—শৈশবে পাঠ্য পুঁথির মারফত এই অমূল্য উপদেশ পাইয়াও যাঁহারা দুঃসাহস প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকে ঠেকাইবার কোনোই উপায় নাই।

সাহিত্যে, কবিতায় শ্লীল ও অশ্লীলের সীমারেখা লইয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া বন্ধুবর অমল হোম পর্যন্ত অনেক সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন,—সর্ববাদীসম্মত কোনো মীমাংসাই হয় নাই—হইতে পারে না বলিয়াই হয় নাই। কাব্যে অশ্লীলতা কাব্যসৃষ্টির প্রথম যুগ হইতেই ছিল, আছে এবং থাকিবে। এক-এক যুগে দেশ-কাল-পাত্রভেদে প্রকাশভঙ্গির তারতম্য ও ভাষার চাতুর্যের আবরণ কোথাও নিবিড়, কোথাও তরল! একশ্রেণীর রুচিবাগীশ জগতে আছেন এবং থাকিবেন, যাঁহারা সাহিত্যে বা কাব্যে যৌনমিলন সম্পর্কিত আবেগ, আক্ষেপ ও উন্মাদনার বর্ণনা বা ইঙ্গিত মাত্রকেই অশ্লীল মনে করেন ও করিবেন। আবার একশ্রেণীর ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' বা মুখ্যত স্থূল কামবিলাসমূলক পদাবলী শুনিয়া প্রেমাশ্রুবর্ষণ করেন, কিন্তু বুদ্ধদেবের কবিতা শুনিলে অঙ্গুলী দ্বারা কর্ণবিবর রোধ করিবার ভাণ করিয়া লজ্জায় আরক্ত মুখে অধোবদন হন। এই দুই শ্রেণীর কাব্যামোদীরা নিশ্চয়ই 'বন্দীর বন্দনা'-র কোনো-কোনো অংশ বরদাস্ত করিতে পারিবেন না। এজন্য তাঁহাদের দোষ দেওয়া নিষ্ফল।

এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত না হইয়াও যাঁহারা বলেন, অসুস্থ যৌনস্পৃহার

বীভৎসতাকে উলঙ্গ করিয়া প্রকাশ করিয়া সস্তা বাহাদুরী লওয়া ছাড়া এই কবির কাব্যসৃষ্টির মূলে আর কোনো বস্তু নাই, তাঁহারা একদেশদর্শী। প্রত্যেকটি কবিতাকে সমগ্রভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ না করিয়া দু-একটা পংক্তি লইয়া বিদ্রূপ, বিরক্তি এবং কটুভাষা প্রয়োগ করিলে তাহা আর যাহাই হউক, সমালোচনা নহে।

যাঁহারা সাহিত্য-পল্লীতে খড়ম পায়ে দিয়া খট্ খট্ করিয়া পাড়া মাতাইয়া চলাফেরা করেন, তাঁহাদের মুখে বুদ্ধদেবের কবিতার কুৎসা ও অকীর্তির বার্তা পাইয়াছিলাম। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় এই কবির অনেক কবিতাই পড়িয়াছি। সমালোচকগণের নিন্দা ও ধিক্কার সত্ত্বেও বুদ্ধদেব যে কবি, একথা মনে-মনে স্বীকার করিয়াছি। 'বন্দীর বন্দনা' ভালো করিয়া পড়িয়া সেই ধারণাই বদ্ধমূল হইল।

বুদ্ধদেব কবি এবং বর্তমান যুগের কবি।......

মোরে দিয়ে বিধাতার এই শুধু ছিলো প্রয়োজন,
স্রষ্টা শুধু এই চাহে, এ বীভৎস ইন্দ্রিয় মিলন—
নির্বিচারে প্রাণী সৃষ্টি ক'রে থাকে যেমন পশুরা।

বিষ-তিক্ত অভিজ্ঞতার পর এই উগ্র প্রশ্নকে 'অশ্লীল' বলিয়া নাক সিটকাইয়া ফিরাইয়া দেওয়া যায় না। প্রেম, বিবাহ, মন্ত্র ইত্যাদি আভরণহীন নিছক নিবারণ যৌন-লিপ্সা জীবের স্বভাব-ধর্ম—এই সুস্পষ্ট সত্য অপ্রিয় বটে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য কহিবার অধিকার কবির আছে। এবং তাহা বলিতে গিয়া কবি বাজার-চলতি ভণ্ডামির আশ্রয় লন নাই, ক্ষতকে পুষ্পাচ্ছাদিত করিয়া প্রকাশ করেন নাই, সৃষ্টির অন্ধ প্রেরণাকে 'জন্মজন্মান্তরের প্রেম সম্পর্ক' নাম দিয়া নরনারীকে প্রতারণা করিবার চেষ্টা করেন নাই!..

আমি যে রচিব কাব্য এ উদ্দেশ্য ছিলো না স্রষ্টার
তবু কাব্য রচিলাম এই গর্ব বিদ্রোহ—আমার

এই মনুষ্যোচিত গর্বের যে-বিদ্রোহ—সাহিত্য, সংগীত, শিল্প, দর্শন, অবশেষে জড়বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া অন্ধ সৃষ্টিশক্তির অনুগামী মানুষকে তাহার নিজের স্বতন্ত্র সৃষ্টির ঐশ্বর্যে মহীয়ান করিয়াছে, 'বন্দীর বন্দনা' গীতি তাহারই উদ্দেশ্যে উচ্ছ্বসিত।

বলা বাহুল্য বর্তমান যুগের মানুষের সবখানি কথা আলোচ্য কবিতার বইটিতে নাই। এই কবিতা সংগ্রহে কবির একই ভাবের দশটি কবিতা রহিয়াছে। 'উচ্ছ্বসিত যৌবনের সিন্ধুতীরে' বসিয়া 'কামনার ও বাসনার মন্থনসঞ্জাত সুধাবিষ' আহরণ করিয়া কবি কবিতার পাত্র ভরিয়া আনিয়াছেন। তিনি কিছুই পরিহার করেন নাই, আবরণ করেন নাই,.. যৌবনের স্বপ্ন ও কল্পনা, ক্ষুধা ও লোভ যত

বিচিত্র পথে গিয়াছে, সে সকলই পরিভ্রমণ করিয়া কবি 'মোহমুক্ত' হইয়াছেন—নরনারীর আকর্ষণ ও মিলনের অপূর্ণতা ও ত্রুটি সত্ত্বেও ভালোমন্দ সমস্তই প্রথমে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া, পরে 'প্রেমিক' রূপে সন্তোষের সহিত সমগ্রই গ্রহণ করিয়াছেন। বুদ্ধির নয়নে হৃদয়াবেগের বসন বাঁধিয়া, অ-দৃষ্টের অন্ধ অনুগামী হইয়া না-জানার মূঢ় সন্তোষ লইয়া তাঁহার কবিপ্রতিভা প্রসন্নতার ভান করে নাই, মহৎ ও বৃহতের উপর ধ্রুবদৃষ্টি রাখিয়া, ক্ষুব্ধ অসন্তোষ অণুমাত্র গোপন না করিয়া, কামনা ও ভোগকে যথাযথ স্থান দিয়াকবি যৌবনকে বিশ্বাস করিতে বলিয়াছেন।···

এক অতুলনীয় কবিপ্রতিভার প্রভাবে বাংলার কাব্য-সাহিত্য যখন··· আধ্যাত্মিকতার আকাশে অস্পষ্টতার জাল বুনিবার উপক্রম করিতেছিল, তখন যে কয়েকজন কবি উহাকে মর্তমানবের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, বুদ্ধদেব তাঁহাদেরই অন্যতম। এবং এই নবীন ভাবধারাকে কাব্যের রূপান্তরে বহন করিয়া আনিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে আমি অসংকোচেই বলিব—বুদ্ধদেবের স্থান অন্যান্য অনেকের অগ্রে, কাহারো পার্শ্বে, কিন্তু পশ্চাতে নহে।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'
শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৩৯

দারুণ মাস্তুলের কর্ণধারগণের প্রতি'

জীবনানন্দ দাস

[১৯৩৭]

বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী' প্রেমের কাব্য। এ-সব কবিতা পড়তে বসে এগুলো কেন বিদ্রোহের কবিতা নয়, এ-সবের ভিতর ম্লান মানুষের বেদনার কথা নেই কেন, কিংবা হাড়ের থেকে সৌন্দর্য ঝরে গ'ড়ে এ-সব কবিতায় কঙ্কালমুণ্ডের টিটকারি উড়ছে না কেন—এ-রকম সব গূঢ় জিজ্ঞাসা আমার কাছে অত্যন্ত অবান্তর বলে মনে হয়। বাস্তবিক বিদ্রোহ আমাদের জীবনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকলেও সে-টা মানবাত্মার পক্ষে ব্যর্থতারই জিনিশ; এবং যেখানে বিদ্রোহের ততটা অবসর নেই সেখানেও কি জোর ক'রে বিদ্রোহ আনতে হবে? শ্রেষ্ঠ ধর্মসাধনা।—এমন কি শ্রেষ্ঠ শিল্পসাধনা কি তা নয় যা বাহুর স্খলন এবং ক্ষরণ এবং অসামঞ্জস্যের ভিতর থেকে ধীরে ধীরে জ্যামিতির—এবং যেখানে কোন মহত্তর জ্যামিতি আর জ্যামিতি নয় শুধু—সমন্বয় ও সৌন্দর্য খুঁজে নিতে পারে? আমরা স্বীকার ক'রে নেব যে 'কঙ্কাবতী' প্রেমের কাব্য, এবং প্রেমের কবিতাগুলো এই বইয়ের ভিতর কতদূর কবিতা হয়েছে বা অপ্রাসঙ্গিক জিনিস হয়েছে তাই নিয়ে এই কাব্যের বিচার। অন্য নানা রকম কবিতার মতো প্রেমের কবিতার আবির্ভাব হয়েছে বিভিন্ন রকম ব্যাপকতা, গভীরতা, শূণ্যতা বা অন্ধকার নিয়ে। বুদ্ধদেবের এইসব প্রেমের কবিতার ভিতর কোথাও নিরালম্ব শূণ্যতা, শববাহকদের গুমোট নিস্তব্ধতা বা নিষ্ক্রিয় অন্ধকারের বিভীষিকা নেই; কিংবা সাদা সূর্যের আলো ও হাড় আর কড়ি। কড়ি আর হাড় বলে মনে হয় যে দেশে, সে-প্রদেশ নেই এখানে। তা নাই বা রইল, এই বইটি হ'ল কবিতারাজ্যের আর একটা facet। এই কবিতাগুলোর মধ্যে তিনি বরং জীবনকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। জীবন চারদিককার প্রকৃতির রস ও প্রেমাস্পদার সৌন্দর্যের ভিতর নিজেকে গহন ক'রে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে আমাদের চলতি পথের ওপারে কোন ধূসর প্রাসাদের মতো যেন:- যেখানে অন্ধকার সিঁড়ি রয়েছে, রয়েছে রূপ ও কামনার আরশি, জানালায় রঙীন কাঁচ, বাইরে আধো আঁধার, ধূ-ধূ শাদা পথ, ঝাপসা ছায়ার ঝিকিরমিকির আলো, হাওয়ার বেহালা, সোনা ও তামার মতো চাঁদ, এবং সেখানে বেহালার বুকে নাম ফোটে কঙ্কাবতী—কঙ্কাবতী!……

বইটির কোন-কোন কবিতায় পুনরুক্তি বেশি, কথার অজস্র ডালপালার ভিড়ে আবেগ চাপা প'ড়ে পাখা মেলতে পারেনি। কোন কোন কবিতায় জায়গায় জায়গায়

লঘু আমোদের ছোঁয়াচ রয়েছে, কিংবা একেবারে মুখের ভাষায় প্রতিদিনকার জীবনের নানারকম ভঁাজ আবিষ্কার করবার চেষ্টা আছে। কবিতায় সরল মৌখিক ভাষার এ রকমের ব্যবহার 'প্রগতি' পত্রিকার যুগ থেকে শুরু হয়েছে ব'লে মনে হয়; এবং বুদ্ধদেব এর একজন বড় propagandist। কিন্তু এ চেষ্টা সব সময় সম্যকভাবে উৎরেছে ব'লে মনে হয় না।...এইসব কবিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে গম্ভীর এবং পৃথিবীর সীমান্তে যেন কোনো শেষ শতাব্দীতে 'তিমিরতোরণে চাঁদের চূড়' এবং 'আঁধার-জোয়ারে জোনাকির মত তারকা-কণা' নিয়ে আমাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার জন্য সে যা কিছু নিয়ে আসতে পারে তারই স্বপ্ন দেখে সময়সীমানাহীন 'শেষের রাত্রি'। আধুনিক বাংলাকাব্যে বুদ্ধদেব যে একজন প্রথম শ্রেণীর কবি একমাত্র এই কবিতাটির উপরেও সে সত্য নির্ভর করতে পারত।...যারা বলেন 'কঙ্কাবতী'র কবিতাগুলো আধুনিক সময়ের উপযোগী নয়— তাঁরা সময় বা আধুনিক সময় বলতে কোনো একটা কৃত্রিম কিছু তৈরী ক'রে নিয়েছেন 'একখানা হাত' চিরকালই একখানা হাতের রহস্য; 'অন্ধকার সিঁড়ি', আজকের কোনো এক্স-রের আলোতেই অন্ধকার সিঁড়ি ছাড়া আর কিছু হ'য়ে উঠবে না—এবং সেই জন্যেই তা সব সময়ের।...যারা সময় ও সৃষ্টিকে টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে তবুও আরো ভগ্নাংশে পরিণত করতে চান, সময় ও সৃজনের মুখের রূপ তা না হ'লে দেখতে পারবেন না ব'লে, তাঁদের প্রীতির জন্য সৃষ্টি ও সময় নিজেদের ব্যবহার ভুলে যায় না—মানুষের পৃথিবীর কোন একটা তুচ্ছতম শতাব্দীর কোন একটা তুচ্ছতম দিককে তুচ্ছতম শতাব্দীর তুচ্ছতম দিক বলেই মনে করে শুধু সেইসব দারুণ মাস্তুলের কর্ণধারগণ;— যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন কোন মানুষের মন এক কণা বালির ভিতর সমস্ত পৃথিবীকে আবিষ্কাব করে, স্বর্গ খুঁজে পায় একটি ঘাসফুলের ভিতর, হাতের তেলোর ভিতরেই যেন পায় সীমাহীনতাকে এবং অনুপলের ভিতরেই সময়হীনের আস্বাদ পায়। আমাদের মুখ্যতম কবিদের সঙ্গে বুদ্ধদেব সেই কবি যিনি এই আস্বাদ পেয়েছেন;—'কঙ্কাবতী' সেই কাব্য যার ভিতর এই আস্বাদ পেয়ে জলকে ততটা ইন্দ্রজাল বলে মনে হয় না মানুষের হৃদয়ের তৃষিত হবার অনুভবকে যতটা। পৃথিবীর যে কোনো শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য পড়লে হৃদয়ে এই বোধ জন্মায়; হৃদয়ে এই অনুভব জন্মাতে পারেন সেই কবি (এবং তৃপ্তির অব্যর্থ পানীয় তিনি সঙ্গে ক'রেই নিয়ে আসেন) তাঁর কবিতাকে সময় মৃত্তিকা এসে কখনও ক্ষয় করতে পারে না। সময় ও মৃত্তিকার ভিতর বাসা বেঁধে 'কঙ্কাবতী' মৃত্তিকা ও সময়োত্তর কাব্য।...

'কবিতা' ৩,২ (পৌষ ১৩৪৪)

সঙ্গ, নিঃসঙ্গতা ও বুদ্ধদেব

● সন্তোষ কুমার ঘোষ

একটি কলমের থেমে-যাওয়া নিয়ে লিখতে গিয়ে বরাবরের প্রগল্‌ভ একটি কলম আজ কেবলই থেমে-থেমে যাচ্ছে। তাকে যে মুঠো করে ধরে আছে, সে "কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়" গানটার মানে এতদিন বাদে, এই বয়সে, নতুন করে শিখছে। প্রচলিত অর্থে নিঃসম্পর্কিত কারও প্রয়াণে ১৯৪১ সনের ৭ই আগষ্ট যার চোখের পাতা ভিজে যায় সে তো তখন সবে কৈশোরের গণ্ডী ছাড়িয়ে যৌবনের দ্বারোপান্তে উপনীত মাত্র। ওই বয়সে কান্নার গান বীণায় আনা সাজে। কিন্তু পোড়-খাওয়া এই প্রৌঢ়িতে পৌঁছেও তার ভিতর-বাহির যদি ঝাপসা একাকার হয়ে যায়, তবে দোষ-দুর্বলতা তার—কলমের নয়। সে পড়ে বসে কতজনকে সম্মুখের সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে দেখল, তারা দূর থেকে দূরে গেল, তবু কই ইতিপূর্বে সে এত বিচলিত বোধ করেনি তো! কোমল একটি অনুভবের কথা কথায় বাঁধা কত কঠিন, তা এই লেখক আজ আবিষ্কার করছে এই প্রথম। পরে কী লিখবে, লিখতে পারবে তার ঠিক নেই, তাই সবচেয়ে আগে সে অলজ্জ অকুণ্ঠ এই সত্য স্বীকারোক্তিটা লিপিবদ্ধ করে রাখতে চায় অনেক—অনেক দিন পরে সে, নির্মম নির্মেকে সর্বঅঙ্গে ও মনে আবৃত পুরুষ হয়েও আর একজন পুরুষের জন্য কাঁদল। সেই জলে শুধু তার চোখ নয়, তার সত্তা তার অহং-ও ভেসে গেল, বারে বারে, পর পর কয়েক দিন ধরে।

নতুবা এই লেখাটায় সে হাত দিত না। কোনও শেষ শোভাযাত্রায় সে সচরাচর হরিধ্বনিতে গলা মেলায় না কোনও শবাধারে কদাচ পাঠায় না ফুলের মালা। প্রথমত এই কারণে, মর দেহাবশেষ কোনদিন চেয়েও ছাখে না কে দিল, আর কী দিল। আর দেহমুক্ত বলীয়ান যে প্রাণ তার কিছুই দরকার নেই, সে ইন্দ্রিয়নির্ভর কোনও তৃপ্তির জন্য তৃষিত নয়, পার্থিব কোনও পুষ্পেরও জন্যও না। কেননা সেই প্রাণ তখন মহাশূন্যের সহস্রদল নীলোৎপলে বিলীন, সেই প্রাণ তখন অপর্যাপ্ত পারিজাতের আঘ্রাণে রোমাঞ্চিত সর্বোপরি সর্বত-স্বাধীন। এই স্বাধীনতার কথা বুদ্ধদেব নিজেই উচ্চারণ করে গেছেন তাঁর শেষ পর্বের একটি কবিতায়, "শূন্য

শিশি ধ্বংস করে যেদিন, গন্ধ হয়ে জ্বলবো আমি, স্বাধীন" এই মুহূর্তে সন্তপ্ত বা সজল কিছু রচনা অতএব তাঁর স্বাধীনতার প্রার্থনায় হস্তক্ষেপ, যে-কোনও গদ্‌গদ বাক্যবিন্যাস শবাধারে মালা দেওয়ার মতই অর্থহীন। অসময়োচিত। যে 'বন্দী একদা বন্দনা গান গেয়ে তুমুল আলোড়ন আনেন আমাদের সাহিত্যের দিকে এবং "দিগন্তে তাঁর শেষ মুক্তি অভিলাষে বিলাপের ছিটে দিয়ে শুভ্রতাকে যেন কলঙ্কিত না করি। বাধা রুচির বাধা শুচিতাবোধের। আমাদের অগম্য অনায়ত্ত তিনি এখন ঈশ্বরের হাতে।

স্মৃতি ছড়ানো সামনে সজল পাত্রে পাত্রে। সেই নিপুণতা নেই যে, কাঠি ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে আজ জলতরঙ্গের সঙ্গীত বাজাতে পারি। অজস্র ভাবনা সন্ন্যাসীর রুক্ষ চুলের মতো জড়ানো, সাধ্য নেই যে কঙ্কণ চিরুনি চালিয়ে তাতে বিন্যাস আনি। কলম যদি অস্থির হয়ে ওঠে, তার হেতু এই যে, কী লিখব তাই স্থির করা শক্ত হয়ে পড়ছে। মানুষ আসে, মানুষ যায়। যান শিল্পীরাও কিন্তু তাদের সৃষ্টি থাকে। কোন্ বুদ্ধদেবের বিষয়ে আজ লিখব, যে মানুষ গেল না যে শিল্পী রইল, তার সম্পর্কে ? সব বাগবিস্তারই আজ সর্বৈব বাচালতা হবে। তাঁর প্রস্থানের অব্যবহিত পরে লেখক হিসাবে তাঁর মূল্যায়ন অসম্ভব, বিশেষ করে এতদিনই যখন হয়নি। গ্রন্থসংখ্যায় এই ভাষায় তাঁর রেকরড সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে গিয়ে থাকবে, তবে সেটা আদৌ কোন কথা নয়। আসল কথা, তিনি সময়ের চেয়েও আগে চলতে চেয়েছিলেন, যে রাস্তা তৈরি হয়নি, সেই রাস্তায় সর্বাগ্রগামী রূপে পা বাড়িয়েছিলেন। কবিতায় তিনি তো রবীন্দ্রোত্তর যুগে প্রথম বয়সেই প্রধান এবং আচম্বিত একটি কলরোল, সেই সাহসের স্বাক্ষর নিহিত আধুনিক বাংলা কাব্যের মজ্জায় মজ্জায়, ছন্দে মিলে, আর অতি সচেতন শব্দ যোজনায়। একমাত্র সূক্ষ্ম স্নায়ু সেই নিপুণ নির্মাণের যথাযথ্যে অনুকম্পিত হতে পারে, একমাত্র অধ্যবসায়ী প্রযত্ন তাকে আবিষ্কার করে। বিষয়ে আর প্রকরণের দিক থেকেও অশ্রান্ত পথ-পরিক্রমার উদাহরণও আমাদের সাহিত্যে বিরল, ব্যতিক্রম যদি কেউ থাকেন তবে তিনি আবার সেই অনন্য পুরুষ রবীন্দ্রনাথ। "বন্দীর বন্দনা" থেকে "স্বাগত বিদায়"-এ উপনয়ন মানুষ হিসেবে স্বভাবত ঘরকুনো বুদ্ধদেবের পক্ষে বিস্ময়কর, প্রায় অবিশ্বাস্য এক ভূ-পর্যটন। তাঁর কাব্য শরীরের বিশ্লেষণ এবং সেই কবিতার অন্তর্লোক রঞ্জনরশ্মির আলো ফেলে পর্যবেক্ষণ পরবর্তীকালের কবিকুলের পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধানের অপেক্ষায় আছে।

এই প্রসঙ্গে অপ্রিয় তথ্য রূঢ় এই সত্যটাও লিখে রাখতে চাই—সমকালীন যত সতীর্থের বিষয়ে সারা জীবন লিখে গেছেন তিনি তাঁর সম্পর্কে কিন্তু অন্যেরা

ত এ ভগ্নাংশও লেখেননি। কৃপণতা এখানে কৃতজ্ঞতার অন্তরায় হয়ে থাকবে। মনে প ড়ছে সেই "হঠাৎ-আলোর ঝলকানি"-র কালেই."প্রথমা" আর 'কুসুমের মাস' নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা, সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একাধিক সবিস্তার রচনা, সমর সেনকে আবিষ্কার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে উচ্ছ্বসিত স্বীকৃতি এবং জীবনানন্দের প্রতি তাঁর অনাবিল স্তুতি। বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী—কেউই বাদ যান না, কখনোই ব্যক্তিগত অথবা অন্যবিধ মতভেদ বুদ্ধদেবের উদার উচ্চারণের বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। আর পরবর্তীকালে কবিদের উপর তাঁর প্রভাবের পরিমাপ-পরিমাণের কথা টেনে আনা অবান্তর। ঊর্দ্ধতন কোন্ পিতৃপুরুষের কতটুকু রক্ত বা চারিত্র্য আমাদের দেহে কিংবা অস্তিত্বে মিশে আছে আমরা জানি না। তথাপি প্রতিটি শ্রদ্ধাবাসরে মন্ত্রে মন্ত্রে প্রণাম জানাই তাঁদের, গলাজলে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি পূর্ণ করে তাঁদের তর্পণ করি। ওই তর্পণই নিবেদন এবং স্বীকৃতি। স্বীকৃতি আমরা যে সম্ভব হয়েছি, এখনও বেঁচে আছি তার। প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথাই ওঠে না।

কথাশিল্পী বুদ্ধদেবের কথা লিখব কি, যিনি প্রথমাবধি গল্প-উপন্যাসে বলা যায় নির্বিষয়ী, (একটি লোকের সামান্য জ্বর, তাই সেদিন অফিসে যেতে তার তীব্র অনিচ্ছে, এই 'রেখাচিত্রটি" তিনি আঁকেন কত দিন আগে ? সম্ভবত দশক চারেক হবে) পাথুরে শক্ত জমির ওপর কাহিনীর ইমারত গড়া কদাচ যাঁর অভিপ্রেত ছিল না, যিনি ভগীরথ এক অন্তঃসলিল স্রোতোধারার, বনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণবিবর্তনই ছিল যাঁর লক্ষ্য সম্ভবত ধূর্জটিপ্রসাদেরও আগে তিনি মননশীলতায় ব্রতী হয়েছিলেন, ঘরের বাইরে ধূলি আর ধূমে আচ্ছন্ন যে জগৎ সেদিকে তো তাকানই নি, এমন কি জানালায় দাঁড়িয়েও সর্বদা যে আকাশের নীলে নিমগ্ন থেকেছেন তাও নয় সব কিছু থেকে সরে এসে, অনেক কিছু প্রত্যাখ্যান করে তিনি বরং ভালবাসতেন ভিতরের দিকে চোখ ফিরিয়ে সেখানে অন্তর্লীন যে মহা বিশ্ব তারই দিকে তাকিয়ে থাকতে, তার রহস্য উন্মোচিত করতে। এজন্যে আলাদা একটা বাগ্‌ভঙ্গি বস্তুত আলাদা একটা গদ্য রীতিই সৃষ্টি করতে হয়েছিল তাঁকে প্রকাশের একটি ভাষা যা জটিল অথচ স্বচ্ছন্দ প্রবহমান সাবলীল।

এই গদ্যকেই অন্যবিধ আকারে পাই তাঁর প্রবন্ধে—কিন্তু নিরুদাহরণ এই নিবন্ধে তাঁর সাহিত্যের বিচার করতে তো বসি নি সে কাজ আগামীকালের সৎ ও পরিশ্রমী অন্বেষক ও বিশ্লেষকদের জন্য তোলা থাক। আমাদের এই ভাষা যদি টিকে থাকে তবে একদিন না একদিন কৃতজ্ঞ রসবেত্তাদের কেউ না কেউ তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকাটির কথা লিখবেই, জোর গলায় বলবেই। সে কথা আজকে নয়। আজ বরং বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পর বুদ্ধদেবের তুল্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তিত্ব আর দুটি

নেই, শুধু এইটুকু বলে থেমে যাই। আমাদের কালে বুদ্ধদেব বসুই বোধ হয় সেই এক এবং অদ্বিতীয় যাঁকে বলা যায় সর্বতো-লেখক। লেখাকে তিনি তাঁর আয়ুর একটি পর্বে জীবন আর জীবিকা দুই-ই করেন—এই অবেতন অনলস দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত আজকের বিকিকিনির হাটে দুঃসাহসেরই নামান্তর। কোন শিল্পী একলা চলেন, কেউ সবাইকে নিয়ে পথ চলাকে দায় করে নেন। বুদ্ধদেব দুটোকেই মিলিয়েছিলেন। স্বয়ং যিনি প্রধান এক কবি, তাঁর সৃষ্টি তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি নয়—তার চেয়েও বড় কথা, আধুনিক বাংলা কবিতাকে তিনিই নিঃস্বার্থ ভালবাসায় নিঃশর্ত প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। এই হেতুই তাঁর ভূমিকাকে বলছি ঐতিহাসিক। কেউ লেখক, কেউ লেখকদের লেখক। তিনি ছিলেন দ্বিতীয়টি।

॥ দুই ॥

লেখকদের লেখক সম্পর্কে অবিসংবাদী কয়েকটি সত্যের আভাস দিয়ে বরং অমলিন একটি মানুষের কথায় ফিরে আসি। এই লেখাটির শিরোনামা দিয়েছি "সঙ্গ: নিঃসঙ্গতা ও বুদ্ধদেব।" শব্দবন্ধটা তাঁরই, আমি শুধু শেষের নামটি বদলে নিয়েছি। কে জানে বুদ্ধদেব নিজেই হয়তো কোনদিন নিজের সম্পর্কেই কথাটা ভেবে থাকবেন, পরে আপন নামটি কেটে বসান সেই নামটি—যাঁর শস্যক্ষেত্র থেকে বইয়ের পর বইয়ের শিরোনাম আহরণ করেছেন—"রবীন্দ্রনাথ।" সঙ্গ এবং নিঃসঙ্গতা। কথাটা সম্ভবত সব শিল্পীর সম্পর্কেই সত্য। তাঁরা সঙ্গ কামনা করেন বাহিরে—নির্বাচিত কয়েকজনের—আর নিঃসঙ্গতাকে লালন করেন অন্তরে। তলার দিকে প্রতিটি বৃক্ষই যেমন, নিষ্পত্র। পাতা আর পল্লব সে মেলে ধরে ঊর্ধ্বে, সেখানে আলো আর বাতাসের স্পর্শ কামনা করে। বুদ্ধদেবের ব্যক্তিত্বও এই দ্বৈত সত্তায় বিভক্ত, এই ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ যাদের ঘটে, তাদের মধ্যে এই লেখকও একজন।

আমার সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক ছিল না (ঘটনাটা এতই তাজা ও টাটকা যে, বারবার ক্রিয়াপদে অতীতকাল ব্যবহার করতে বাধছে, অন্যমনস্ক হাত মাঝে মাঝেই বর্তমানকালকে টেনে আনতে চাইছে), তবে তার চেয়ে কিছু বেশী ছিল। সেই সম্পর্ক, যা রক্তের চেয়ে ঘন। কিংবা কবে যেন পরানো হয়ে যায় অলক্ষ্য একটা রাখী, যার রঙ রক্তবর্ণ। বহু সকাল, দুপুর, বিকাল সন্ধ্যা, কতবার সন্ধ্যা পেরিয়ে নিশুতি রাত্রিও তার সাক্ষী।

লিখতে লিখতে বিষাদের সঙ্গে উন্নত একটি অহংকার মিশে যাচ্ছে, আমাকে তিনি বন্ধুভাবে গ্রহণ করেছিলেন। অগ্রজের উচ্চ পীঠ থেকে নয়, পাশে বসিয়ে

কাছে বসে। এই সামান্যকে সমানত্বের আসন দিয়ে ধন্য করেন তিনি, আমার মার্জনাযোগ্য অহংকার সেইখানেই। মিথ্যে হয়ে যায়, গিয়েছিলও, সব ব্যবধান, কী বয়সের, কী বিদ্যার। সেই সখ্য সুতরাং এক হিসেবে অসবর্ণ। পাণ্ডিত্য তাঁর পর্বতপ্রমাণ, অধ্যয়নের সীমা সমুদ্র-সমান, ইচ্ছে করলে তুড়ি শুনিয়েই এই অর্বাচীনকে হয়রান করে দিতে পারতেন, কিন্তু কখনও করেননি। কথা বলেছেন অনর্গল, যার যতিচিহ্ন খালি হো-হো ছাদফাটানো সেই হাসি, যা আর কোনো দিন শুনতে পাব না। কত তর্ক করেছি শুধু তাঁর সুরেলা, পরিশীলন-কোমল অথচ প্রত্যয়ে নিশ্চয়তায় অভিব্যক্ত কণ্ঠস্বর শুনব বলে; উত্তেজিত করতে না-ও যদি পারি, একটু উসকে দেব বলে। অধ্যায়টা আজ শেষ, তাই বলে ইতিহাসটা মুছে গেল না, সব স্মৃতি উজ্জ্বল কোনও ধাতুপটে উৎকীর্ণ হয়ে রইল।

বস্তুত "বন্ধু" শব্দটাকেই তিনি একটি বৃহৎ তাৎপর্য দিয়েছিলেন, একটি ব্যাপ্তি যা রবীন্দ্রনাথের গানে কখনও কখনও পাই। 'পিতা', 'প্রভু', কিংবা 'স্বামী'র বিকল্পে রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছেন "বন্ধু" সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কটা হয়ে গেল আরও নিকট, আরও ঘন, আরও স্নিগ্ধ, আরও মরমী। বন্ধুরতা ঘুচে গেল। ভক্তি হয়ে গেল ভালবাসা। বুদ্ধদেব আরও একটু এগিয়ে গেলেন। বন্ধুবৎ ব্যবহারে আপ্লুত করলেন মানুষদেরও, বিশেষত তাদের তাঁর স্বজন-পরিজন যারা। সহজ পরিবেশ "কবিতা-ভবন"-এ সতত বিরাজিত, সেখানে শুধু স্বস্তির শ্বাস, সেখানে শুধু উন্মুক্তির আবেশ; সব খোলা বলেই সকলের মেলা। অন্তত তিনটি প্রজাতির মধ্যে সেই হেতুই অনায়াসে সেতুবন্ধ রচিত হয়ে গেল।

হালকা গল্পের কোন্‌টা কিংবা কতগুলি বলব? কবিতাভবনের নাকতলার নতুন ঠিকানায় গিয়ে তিনি চট করে বাড়ির গণ্ডী ছেড়ে বের হতে চাইতেন না। প্রায় "পাদমেকং ন গচ্ছামির" মতো পণ। ঠাট্টা করে বলেছি "আপনাকে আজ একটু ঘুরিয়ে আনবই। আপনি কি গৌতম বুদ্ধের মতো বোধিবৃক্ষতলে তপের আসনে বসেছেন? একেবারে "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং?"

কোনো দিন হয়তো সম্মত হয়ে বললেন, "আপনার সঙ্গে যেতে পারি।" (আবার আমার সেই অহংকার।) তারপরই একটু থেমে 'রানুকে নেবেন না?' বলেছি "নিশ্চয়, নিশ্চয়। উনিও চলুন।"

রানু অর্থাৎ প্রতিভা বসু। আমার নিজেরই বয়স কম হল না; পরিণত বয়সের দাম্পত্যের এমন মধুর, পরস্পর-নির্ভর, একে আর-একজনকে নিয়ে পরিপূর্ণ ছবি আর কোথাও দেখিনি। মেড ফর ইচ আদার নয় দে ওয়্যার ফর ইচ আদার। অন্তত আমার অভিজ্ঞতায় এই দৃষ্টান্ত তুলনারহিত।

এই লেখকের সঙ্গে একবার বাইরে কোথাও দিন-কয়েক কাটিয়ে আসতে সম্মতও হন। হয়তো শান্তিনিকেতনে, অথবা তুয়ার থেকে অদূরের কোনও সমুদ্র-তীরে। সব থেকে দূরের 'সব পেয়েছির দেশ'-এ তিনি তো এখন গেলেনই, চির-শান্তিনিকেতনেও স্থান হল। শুধু ঐহিক একটি ছোট্ট ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে গেল।

নিজের স্মৃতির কত কথাই তো বলতে পারি। সেই যে সকৌতুকে আমাকে শাসন করে বলা "সন্তোষ ঘোষ আপনি যেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় হবেন না", অবশ্যই একটু বিশেষ অর্থে, কিন্তু এর বেশি বিশদ ব্যাখ্যা দেব না। কিংবা সেই যে একবার বিদেশে কোনান ডয়েলের স্মৃতিধন্য একটা কামরায় আমার দু'পাশে দুই সঙ্গিনী আর টেবিলের ওপাশ থেকে বুদ্ধদেব ক্রমাগত বলছেন "হোয়াই শুড্ সন্তোষ ঘোষ মনোপলাইজ্ অল্ দি ফেয়ার গার্লস্ অ্যারাউণ্ড" মাথা নেড়ে নেড়ে বলছেন তো বলছেনই, কিন্তু মৃদু মৃদু হেসে, সুতরাং ঈর্ষা নয়।

ঈর্ষা বরং আমি আজ করি তাঁকে—বিনা বাক্যে, সদর্পে প্রস্থান করলেন বলে; অতর্কিতে রোগ এল, কিন্তু রোগকে সে সঙ্গী করে আনল না। মৃত্যু তাঁর দেহকে অমোঘ অধিকার করল কিন্তু বিনিময়ে মৃত্যু-যন্ত্রণা দিল না। মৃত্যুটা তাঁর, যন্ত্রণা যা, তা আমাদের। যে-গানটির কাব্যমূল্য আর আবেদন তাঁকে কম্পিত করত যেন সেই গানেরই সুর ধরে তিনি গভীর কোন অন্ধকার পার হয়ে গেলেন। অচেতন অবস্থা থেকে চির-অচেতনায় এই অবস্থিতি, এ যেন "অন্ধকার হতে অন্ধকারে চলে গেল দিন।" তাঁর জীবন আর মৃত্যুর সম্মিলনও তেমনই। তাঁর সমকালীর লেখককুলে, সহযাত্রী-মহলে যিনি ছিলেন কনিষ্ঠ, মৃত্যুর অমৃতপানে তিনি সহসা সকলের জ্যেষ্ঠ হয়ে গেলেন। সেই তিনি, বুদ্ধদেব বসু, যিনি কারও বিষয়ে ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশে কখনও কোনও বক্রোক্তি করেননি। মতভেদের ক্ষেত্রে উক্তির পরিবর্তে বড়জোর অবতারণা করেছেন যুক্তির। সভার মাঝে কেউ ব্যক্তিবিশেষ সম্পর্কে কটাক্ষ করে যেই কিছু বলতে গেছে অমনই হাত তুলে, বিব্রত মুদ্রার ভঙ্গি ফুটিয়ে বলে উঠেছেন "আহা, ওসব কথা থাক।" চলে গেছেন প্রসঙ্গান্তরে। কতবার দেখেছি, আর এই হেতুই তাঁকে সর্বাগ্রে 'অমলিন মানুষ' বলেছি। তাঁর সঙ্গে মতান্তর হত, কিন্তু মনান্তর নয়। মান অভিমান ঘটেছে হয়তো, তবু কলহান্তরিত হওয়ার ব্যাপারটাই ছিল অসম্ভব, অজ্ঞাত। সব ছাপিয়ে ভাবসম্মিলনই ছিল সত্য।

॥ তিন ॥

মৃত্যুকে আর তেমন করে দেখি না, আগে যেমন দেখতাম। প্রাথমিক বিহ্বলতার জোয়ার নেমে গেলে আজকাল তার নরম পলিমাটির গন্ধ পাই। মৃত্যু

বিনষ্টি নয়, আসলে হয়তো নতুন সত্তার সৃষ্টি ; লয় নয়, বরং নির্ভার আরও নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। কোনও কোনও আঁধার আলোর অধিক হতে পারে, বিশ্বাস করি। এখন বুঝি, আমাদের বিধিতে দেহকে নিরালোক গহনে স্থাপন না করে প্রজ্জলন্ত চিতায় সমর্পণ করা হয় কেন। জীবনভোর মানুষ জ্বলে যে। চিতা সেই জ্বলার রূপক। যা শেষ হয়ে গেল, তার। এর পর নির্বাণ, এর পর প্রশান্তি, শীতল। সেই মৃত্যুরই দাবি, শেষ ছাইটুকুও ধুয়ে মুছে ফেলা, ঘড়া ঘড়া জল, অবশেষে অস্থি-বিসর্জন। কিন্তু মুছে গেল কী ; অবসান কিসের? ক্ষুদ্র সীমিত অর্থে যাকে বেঁচে থাকা বলি, শুধু সেইটুকু মোটে। নতুবা মৃত্যু শুধু মুছে দেয় না, এক অর্থে একদিন নিজেও মুছে যায়।

বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রেও মুছে যাবে, হয়তো বা ইতিমধ্যেই গিয়েছে, লেখাটা শেষ করার আগে এই প্রগাঢ় প্রত্যয়টি উচ্চারণ করছি। শিল্পী হিসাবে যিনি কোনদিন আপন সৃষ্টিকে জনপ্রিয়তার তৌলে তুলে বিকোতে যাননি ; যাঁর উপহারের উপযুক্ত কিছু বই বাদে অনেক গ্রন্থ সংস্করণান্তরের স্বাদ পায়নি, কতগুলি তো আবার দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার স্বর্গীয় তালিকায় উন্নীত ; বাংলার ব্যবসায়িক মঞ্চের বা চিত্রপটের কোনও প্রয়োজন মেটাতে যতদূর জানি কোনও দিন যাঁর তল্লাশ কেউ করেনি, তিনি তো অবশ্যই দ্বারস্থ হননি কারও, তাঁর অনমনীয় দেহে বজ্রের শক্তি নিহিত ছিল, মহাকায় নন ; বলেই হয়তো তাঁর মধ্যে একদিন বিদ্রোহের মহাকায় স্পর্ধা জন্ম নিয়েছিল। আত্মখণ্ডন, আত্মখণ্ডন, যার কিছু কিছু নমুনা পাই বুদ্ধদেবের বিবিধ গ্রন্থের নাম করণেও। আঁধারকে তিনি নির্দ্বিধায় "আলোর অধিক' বলেন, এক নিশ্বাসে 'স্বাগত' বলেই 'বিদায়' নিতে তাঁর বাধে না। একদিন 'চিরদিন'— অর্থাৎ একটি দিন লহমায় চিরকালীন হয়ে যায়। 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর'-এও দেখি বৈপরীত্যের সহ-অবস্থিতি। বোঝা যায় বিপরীতকে মিলিয়ে, দুই মেরুকে নিকটে এনে, তিনি কী-যেন, হয়তো বা কোনও একটা সমন্বয় খুঁজছেন, আজীবন খুঁজে গেছেন।

যেখানে খণ্ডন ছিল না, আগাগোড়া একটানা সুর বেজে গেছে, সে তাঁর পিপাসা, সে তাঁর ভালবাসা। জীবনের সকাল বেলায় যিনি লিখেছিলেন 'বিধাতা, জানো না তুমি কী অপার পিপাসা আমার অমৃতের তরে" ('বন্দীর বন্দনা') বিকালে এসেও প্রায় ওই একই কথা : "যা কিছু লিখেছি, সব, সবই ভালোবাসার কবিতা....ভালোবাসি সবচেয়ে সত্য করে" ('শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর')। এই ঘোষণারও প্রতিতুলনা রবীন্দ্রনাথে পাব "সেই ভালোবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি"—('সেঁজুতি।') তাঁর রচনায় প্রধানতম সম্বাদী সুর এইটিই।

রবীন্দ্রনাথ, যাঁর কাছে বারে বারে ফিরবেন বলেই বুদ্ধদেব মাঝে মাঝে সরে যেতে চেয়েছেন, পারেননি। অস্বীকার অর্ঘ্য হয়ে গেছে। মাধ্যাকর্ষ তাঁকে অরোধ্য টানে টেনে এনেছে। এই মাধ্যাকর্ষের নাম শ্রদ্ধা, এই মাধ্যাকর্ষের নাম সেই 'ভালোবাসা'। একটু ভালো করে দেখার দরকারেই কখনও কখনও একটু দূরে গিয়ে বসা।

এলোমেলো ভাবনার যা স্বভাব, কোথায় বুদ্ধদেবের মরণের স্বরূপ নির্ণয় করছিলাম, আর কথায় কথায় কোথায় এসে পড়েছি! খেই ফিরে পেতে তাঁর ছড়ানো যত অসমাপ্ত কাজ তা নিয়ে খেদ প্রকাশ করব কি? বোধ হয় সেটাও হবে অহেতুক। ন জায়তে, ম্রিয়তে বা কদাচিৎ—গীতোক্ত এই বাণী অস্তবস্ত দেহ সম্পর্কে যদিও নয়, আবহমান আত্মার বিষয়ে। জীবের জন্ম যদি না হয়ে থাকে, মৃত্যুও তবে অলীক। কিন্তু অত দূর যাব না। এ-ও বলব না যে, সমগ্র বিশ্ব যখন পূর্ব থেকেই পূর্ণ তখন তা থেকে তিলমাত্র যোগ বিয়োগও অসম্ভব। এখানে যা অসম্পূর্ণ রইল, অন্যত্র তা ভরে উঠবে এই ভরসাও অবাস্তব। এখানে মানুষের বোধের সঙ্গে প্রবোধের বিরোধ ঘটে। কেন না, পরম বিশ্বাসের বাইরে প্রতিদিনের জীবনে একটা ব্যবহারিক আশ্বাসের প্রয়োজন আছে।

বিবিধ বিদেশী ভাষার পথে প্রান্তরে পর্যটনে ক্লান্ত, তিনি অবশেষে স্থির একটি নীড় পেয়েছিলেন তাঁর স্বদেশের সংস্কৃতে; নিমগ্ন হয়েছিলেন মহাভারতে, পুরাণে। মহাভারতের প্রতিটি প্রধান চরিত্রের যে তন্নিষ্ঠ, গভীর ও তুলনামূলক বিচার তিনি আরম্ভ করেন, তার উপমা বিশ্বের মহত্তম সাহিত্যসৃষ্টিসমূহ নিয়ে তুলনীয় কোনও কাজে কোথাও মিলবে কিনা জানি না, তবে তাঁর আরব্ধ লেখনের শেষ পরিচ্ছেদ-গুলির পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বুঝি শাদাই থেকে গেল। ব্রত-উদযাপন হল না।

তবু যেন নিরাশ্বাস দীর্ঘশ্বাস না ফেলি। সব কাজ সম্পন্ন করে এ-জগতে এ-যাবৎ কতজনই বা গিয়েছেন। যেতে পারেন? না মহত্তম শিল্পীরা, না মহাপুরুষেরা। তাঁদের কাজের ভার নেয় অপরে, অনুবর্তী যারা। "যত কিছু ছিল কাজ/সাঙ্গ তো করেছি আজ"। এই আত্মতুষ্টি কি কারও পক্ষেই প্রকৃত? সময়ে এসে কেউ কি কখনও থামে? কাজ কিন্তু থেমে থাকে না, এগিয়ে যায়। "কিছুই থাকবে না, কিছুই থাকবে না":—কথাটা খণ্ডিত সত্য মাত্র। কিছু থাকে না, আবার সবই থাকে। কিছু কিছু এবং কোনো কোনো মানুষ হয়তো-বা অনেকটা দূরে সরে যায়, এইমাত্র। সূর্য অস্ত গেলে দীনহীন কুটিরে কুটিরেও মাটির প্রদীপ জ্বলে। কাজ করতে করতে বুদ্ধদেব দূরে চলে গেলেন, এখন আমাদের তাঁর কাছে যেতে হবে। আমরা যাব। অস্তরাগ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই সাধ্যমতো নম্র-মৃদু দীপ জেলে জেলে তমসাকে তপস্যা করে তুলব। কেন না, যা "মৃত্যুর পরে" আসলে তা "জন্মের আগে" এই উদ্দীপক বাণী বুদ্ধদেবের একটি কবিতারই।

শাপভ্রষ্ট দেবশিশু

শুভাষ মুখোপাধ্যায়

আর পাঁচজন বাঙালী ছেলের মতোই আমারও ছিল ডাকে লেখা পাঠাবার বাতিক। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে একটা দুটো ছাপাও হ'তো। কিন্তু অমনোনীত হওয়াটাই ছিল তখন মোটের ওপর আমার লেখার বিধিলিপি।

ক্রমে একটা সময় এল, টুকটাক যা পাঠাই তাই লেগে যায়। এই সময় 'কবিতা'-সম্পাদকের কাছ-থেকে-পাওয়া চিঠি আমার প্রথম চমক। একটি পোস্টকার্ডে দু-টি কবিতা মনোনীত হওয়ার দু-ছত্র খবরের তলায় একটি রোমহর্ষক নামের স্বাক্ষর—বুদ্ধদেব বসু। চিঠিতে আমাকে বলা হয়েছিল সুবিধে মতো আমি যেন একদিন যাই।

তখন আমরা থাকি রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে মহানির্বাণ মঠের কাছে। সেখান থেকে কবিতাভবন দু ফার্লংও নয়। কিন্তু সাহস করতে বেশ খানিকটা সময় লাগল।

তখন পর্যন্ত আমার যত বাক-ফাট্টাই বন্ধুদের সামনে। তার বাইরে সাত চড়েও বড়ো একটা রা-কাড়তাম না। বলতে গেলে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমি বন্ধুদের হাতে মানুষ, ভাষাশিক্ষা, সাহিত্যের চিন্তাভাবনা—এ-সমস্তই বন্ধুদের সূত্রে পাওয়া। নামকরা লোকদের পাড়ামাড়াবার সাহসও হ'ত না।

কবিতাভবনের সিঁড়ি দিয়ে উঠছি আর বুক ঢিপ-ঢিপ করছে।

বুদ্ধদেব বসুকে কখনও চোখে দেখিনি। কবিতা পড়েছি, অসম্ভব ভালো লেগেছে, গল্প উপন্যাস পড়েছি সামান্যই। তখন পর্যন্ত আমার ধারণা, বড়ো কারো কাছে যাওয়া মানেই নিজের ক্ষুদ্রত্ব সম্বন্ধে অতিরিক্ত জ্ঞান লাভ করা। কথাটা মনে হ'তেই আমার উৎসাহ নিবে এল।

তা সত্ত্বেও সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলাম নিতান্তই বুদ্ধদেব বসুকে দেখবার অদম্য কৌতূহলবশে। ভীরু হাতে ক্ষীণতম শব্দে কড়া নাড়িয়ে ভাবছি বুদ্ধদেব বসু বাড়িতে না-থাকলে কী ভালো যে হয়! হঠাৎ দরজা খুলে গেল। আন্দাজেই বুঝতে পারলাম দরজা খুলেছেন খোদ বুদ্ধদেব বসু। আমার আর তখন পিছু হটার উপায় নেই।

আমি নাম বলতেই 'এস, এস' ব'লে তৎক্ষণাৎ সাদরে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেলেন। একটা ঢাকা বারান্দায় বসবার জায়গা। লোকটা দেখছি বাঘও নয়, ভাল্লুকও নয়। বেশ অমায়িক কণ্ঠস্বর। তবু ভয়ে জড়সড় হ'য়ে বসলাম। বেশ বুঝতে পারছি আমার মুখ শুকিয়ে গেছে।

বসতে-না বসতেই "সকালের প্রার্থনা" আর "রোমান্টিক", আমার পাঠানো এই দু-টি কবিতা নিয়ে উনি কথা শুরু ক'রে দিলেন। কোথায় কোন শব্দ কেমন লাগসই হয়েছে তা বললেন। মুখ বুজে ব'সে আমি কথাগুলো গিলছিলাম। একজন অজানা অচেনা আনাড়ি লেখকের ডাকে পাঠানো পাণ্ডুলিপি প'ড়ে অমন একজন ডাকসাইটে লেখক এত কথা ভেবেছেন, এতেই আমি কী যে আনন্দে আটখানা হয়েছিলাম বলার নয়। ঠিক আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার ভাব হ'ল তা নয়; মনে অসম্ভব জোর পেলাম।

পরদিন বন্ধুদের না-বলা অবধি আমার পেট ফুলে থাকল। বলতে গিয়ে দেখি এক নতুন জ্বালা। কেউ বিশ্বাস করে না। যে বন্ধুর কাছে আধুনিক কবিতায় আমার প্রথম হাতেখড়ি, যদি-বা সে বিশ্বাস করল, তবু আমার এই আত্মবিজ্ঞাপনে সে শঙ্কা অনুভব না ক'রে পারেনি। কেননা এতে মাথা ঘুরে যাওয়ার ভয় থাকে।

আমার 'পদাতিক' বইটি বার হওয়ার পর বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা'য় তা নিয়ে যে-দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন, ছাপা হওয়ার আগে সে-সম্বন্ধে বিন্দু-বিসর্গও আমি জানতাম না। অথচ ততদিনে আমি 'কবিতা'র আড্ডায় নিয়মিত যাই-আমি। কবিতা লেখেন-না এমন অনেকেই সে-আসরে আসতেন। কবিতা তো বটেই, আরও বহু ব্যাপারে আমাদের মতের তফাত ছিল—কিন্তু ভিন্ন মতের জন্যে সেদিন কেউ কাউকে দূরে ঠেলে দেয় নি। 'কবিতা' পত্রিকা আর 'কবিতাভবনের আড্ডা'—এ-দুটোর ছিল পৃথক সত্তা। 'কবিতা' ছিল একজনেরই হাত-ধরা—বুদ্ধদেব বসুর। তাতে অনেকের সহযোগ থাকলে, আর-কারো হস্তক্ষেপ গ্রাহ্য হ'ত না।

নিজের বইয়ের প্রসঙ্গ যদিও এড়িয়ে যাওয়াই সমীচীন, তা সত্ত্বেও নতুন লেখকের অভিজ্ঞতা হিসেবে কয়েকটি কথা বলা এখানে অবান্তর হবে না।

'পদাতিক'-এর আলোচনা 'কবিতা'য় প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন—অতি প্রশংসায় ছেলেটির মাথা ঘুরে যাবে। নিজের মাথা ঘুরে গেলে নিজে টের পাওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। কিন্তু সমর সেনের মাথা যে ঘুরে যায়নি, সেটা আমি দেখেছি। আজকালকার নামী সম্পাদকেরা সেদিক থেকে

অতিমাত্রায় হিসেবি ; নতুন লেখকদের পাছে মাথা ঘুরে যায়, সেইজন্য তাদের চুল পাকা পর্যন্ত তাঁরা অপেক্ষা করেন। অনেকে অপেক্ষা করেন লেখক টেঁসে যাওয়া পর্যন্ত। থুথু দিয়ে সাহিত্যে চিড়ে ভেজে না এই আপ্তবাক্য মনে করে মনে রেখেও আমি বলব, নিরুত্তাপ আশ্রয়ের চেয়ে নতুন লেখকদের লেখার পক্ষে বরং স্বাস্থ্যকর ঈষদুষ্ণ প্রশ্রয়।

তিরিশ বছর আগের কথা। এখনও মনে হয় এই সেদিন।

আমি তখন লেখা ছেড়ে আস্তে-আস্তে পার্টির কাজে ডুবছি। মাঝে মাঝে বুদ্ধদেব বসুর বাড়ি যাই। বেআইনী কাগজপত্র পড়াই, চাঁদা আদায় করি, বিবৃতিতে সই নিই। আমার নতুন পৃথিবী গড়ার সংকল্প তাঁর মধ্যে সংক্রামিত করতে পেরেছি মনে ক'রে খুশী হ'য়ে ফিরে আসি। কিছুদিন পরে গিয়ে দেখি আমার সব ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। ইতিমধ্যে কার কাছে কী শুনে উল্টো কথায় তিনি নেচে ব'সে আছেন। উল্টে আমাকেই কিনা বলেন, পার্টির খপ্পরে প'ড়ে লেখা নষ্ট করছি। সেই রাগে দীর্ঘদিন তাঁর মুখদর্শন করিনি।

দীর্ঘ দিন। কিন্তু বরাবর নয়। হঠাৎ-হঠাৎ গিয়েছি। আবার সেই তর্ক। আবার সেই অনুযোগ। কবিতা তখন আমার কাছে দূরের স্মৃতি। গিয়েছি কবিতার টানে নয়, মানুষটার টানে।

ব'লে না-দিলে আমার মনেই পড়ত না বুদ্ধদেব বসুর বয়স হয়েছে। তিরিশ বছর ধরে তাঁকে দেখছি। সমানে লিখছেন। সমানে নিজেকে বদলাচ্ছেন। লেখার মধ্যে কোথাও এমন ক্লান্তি নেই যা-দিয়ে ধরা যাবে যে, তাঁর বয়স হয়েছে। তাঁর সৃষ্টির উৎস আজও অফুরন্ত। এখনও নতুন পথে পা-বাড়াতে তিনি ভয় পান না, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এখনও তিনি অকাতর। একে কি বয়স হওয়া বলে ?

কিন্তু তার চেয়েও আমার অবাক লাগে, অবিরাম নিজে লিখেও অন্যের লেখা সম্বন্ধে কি ক'রে একজন এতটা শ্রদ্ধা এতটা আগ্রহ দেখাবার ফুসরত ক'রে উঠতে পেরেছেন ! যখন 'প্রগতি' বেরিয়েছে, বলতে গেলে তখন থেকেই আধুনিকবাংলা সাহিত্যের সারথ্য তাঁর হাতে। তাই প্রতিপক্ষ সবচেয়ে বেশী শরবর্ষণ করেছে তাঁরই বিরুদ্ধে। সমকালীন লেখকদের মুক্তকণ্ঠে স্বাগত জানানো, অঙ্কুরেই প্রতিভাকে চিহ্নিত করা, বুক দিয়ে আগলানো—সাহিত্যে এভাবে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর কাজ আর কে করেছেন ? অথচ তার মধ্যে বিন্দুমাত্র মুরুব্বিয়ানার ভাব নেই। বাংলা সাহিত্যে তাঁর ভূমিকা পৃষ্ঠ-পোষকের নয়—প্রহরী-জাগা শাস্ত্রীর কিংবা সেনাপতির। ...

অথচ লোকটাকে ভালো লেগেছিল অতশত বুঝে-শুনে নয়, বাংলা সাহিত্যে

তাঁর অসামান্যতার হিসেব নিকেশ করে নয়—প্রায় অকিঞ্চিৎকর কারণে। লেখার ব্যাপারে এত খুঁতখুঁতেও মানুষ হ'তে পারে। তা সে কবিতার পাণ্ডুলিপিই হোক আর বাজারের ফর্দই হোক। দামী কাগজে রঙীন কালিতে ছবির মতন হস্তাক্ষর। বানানে, শব্দচয়নে, যতিচিহ্ন মাত্রাতিরিক্ত মনোযোগ। ছাপার হরফ নির্বাচনে, পৃষ্ঠাসজ্জায় পুঙ্খানুপুঙ্খতা। লেখার বইয়ের জগৎ সম্বন্ধে ছেলেমানুষী বিস্ময়। ঘর-ফাটানো হো হো শব্দে হাসি। পরনিন্দা পরচর্চায় আগ্রহের অভাব। বাংলাভাষার প্রতি সামান্যহীন মমত্ব। বিত্তবৈভবের সোনার-হরিণে তাঁর সম্মোহ। সাহিত্য তাঁর লক্ষ্মণের গণ্ডি। তার বাইরে তিনি সর্বদাই অপহরণযোগ্য। দোষেগুণে মানুষ তো সবাই। কিন্তু এমন অকৃত্রিম অকপট খোলামেলা মানুষ কম আছে। আপাদমস্তক বর্মাবৃত হ'য়ে তিনি লড়েন না, স্থির লক্ষ্যে তাঁর গায়ে তীর বেঁধানো সম্ভব। মনে এক, মুখে আর-এক নয়, বাইরে থেকে তাঁর ভেতর দেখা যায়।

বিরুদ্ধ মত নিয়েও সাহিত্যে সহাবস্থানে আমি বিশ্বাসী। ঘোট দলাদলিকে যাঁরা নিরেট নিশ্ছিদ্র ব'লে ধরে নেন, তাঁদের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতায় মেলে না। যুদ্ধের সময় যখন আমরা 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' গড়ে তুলছিলাম, তখন সব দলের লেখকের কাছে আমাকে যেতে হয়েছিল। দেখা গেল, গোষ্ঠীগত ভাগগুলো চূড়ান্তও নয়, দুরপনেয়ও নয়। আড়ালগুলো সরাতে পারলেই লেখকদের এক করা যায়। পরস্পরের অনেক মন-গড়া সন্দেহ অবিশ্বাস সাক্ষাতে দূর করা সম্ভব। ঘরকুনো, মেজাজী, অনমনীয় বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে আমার যে-ভয় ছিল, দেখলাম আমাদের উৎসাহের বানে তিনিও ভেসে গেছেন।

যুদ্ধ শেষ হ'তেই আবার সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। কবিতাভবনের ঝুল-বারান্দায় টাঙানো নেতাজীর প্রতিকৃতি দেখে বোঝা গেল, হাওয়া এখন দিক বদলেছে। ভয়ে-ভয়ে কড়া নাড়ি। সেই চিরপরিচিত সহৃদয় অভ্যর্থনা। আবার তর্ক। আবার অনুযোগ। আমার বিশ্বাস স্থির, কলম স্তব্ধ। তাঁর বিশ্বাস পরিবর্তমান, কলম নিরলস।

বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে প্রকাশ্যে মতের লড়াই ক'রে দেখেছি, তাতে ব্যক্তিগত সম্পর্কে চিড় খায়নি।

জেল থেকে বেরিয়ে একবার 'কবিতা-ভবনে' গিয়েছি। তখন তাঁর রাজনৈতিক মত রীতিমতোভাবে আমাদের বিপরীত মার্গে। কথায়-কথায় ম্লান হেসে বলেছিলেন—শুনেছি, ফরাসী দেশে রাজনৈতিক মতভেদ সত্ত্বেও আরাগঁ আর মরিয়াক নাকি পরস্পরের লেখা শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়েন।

সুখের বিষয়, ফরাসীদেশের সে-ঘটনা না-জেনেও বুদ্ধদেব বসু কিংবা বিরোধী মতের লেখকদের লেখা সে-সময়ে আমি কিংবা আমার সমমতের লেখকেরা শ্রদ্ধার সঙ্গেই প'ড়েছি। কখনও হয়ত বক্তব্য এড়িয়ে রচনার গুণ মন স্পর্শ করেছে। মতামতের উত্তাপ রসবোধে কোনো প্রভাব ফেলেনি তা নয়। কিন্তু মন খোলা রাখার চেষ্টা ছিল।

এলোমেলোভাবে বছরের পর বছর টপ্‌কে অনেক দূর এসে প'ড়েছি। অথচ আসল কথাটাই বলা হয়নি। গদ্যের চেয়েও বুদ্ধদেব বসুর কবিতাই আমাকে বেশি টানে। বলা উচিত, তাঁর চিন্তামূলক গদ্য যত বেশি ভালো লাগে, তার চেয়েও ঢের বেশি ভালো লাগে তাঁর কবিতা। অন্য-সব দায় সেরে কবিতায় তিনি হ'তে চান সহজ স্বচ্ছন্দ; কিন্তু নির্ভার নয়। সেইজন্যেই বোধহয় পয়ারের পদবন্ধনই তাঁর হাতে সবচেয়ে বেশি খোলে। প্রায় চল্লিশ বছরের পুরণো হ'য়েও 'বন্দীর বন্দনা'র আবেগ এখনও ক্ষুরধার।

শাপভ্রষ্ট দেবশিশু? মূলত তাই। আর সেইজন্যেই বুদ্ধদেব বসু সব-কিছু ছাড়িয়ে কবি। ঘরের বাইরে তাঁর অপার বিস্ময়। সব জেনে-বুঝে শেষ করে ফেলার মধ্যে তিনি নেই। বোধহয় সব কবির মধ্যেই থাকে সেই শিশু। যার বয়স কখনও বাড়ে না। জীবনে যার ক্লান্তি নেই। শব্দ নিয়ে যার খেলা।

শব্দের চোখ-কান আছে। সেইজন্যেই বোধহয় শব্দও এক রকমের অভিজ্ঞতা। এ-কথা বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে কয়েকবার আমার মনে হয়েছে। নইলে ঘর ছেড়ে যিনি নড়েন না, বাইরের সঙ্গে যার সম্পর্ক প্রধানত লেখা, আর মুখের শব্দে—কী ক'রে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেন?

আসলে মানুষ শুধু লেখা বদলায় না, লেখাও মানুষকে বদলায়। বাইরের তাড়না যতটা না, তার চেয়ে অন্তঃপ্রেরণাই হয় সে-পরিবর্তনের আসল চাবিকাঠি। যতদিন গেছে, ততই বুদ্ধদেব বসু যে মাটির টান বেশি-বেশি ক'রে অনুভব করেছেন, তার কারণ বাংলা ভাষার সঙ্গে তাঁর নাড়ির বন্ধন।

শব্দের ভেতর দিয়ে এই যোগ। দেশজ ভাবনায় এ-যেন তাঁর দূর দেশান্তর থেকে ক্রমশঃ ঘরে ফেরা।

কবিতার এই পালাবদল তাঁর বহিরঙ্গে, তাঁর অন্তর্দেশীয় যোগাযোগে, নতুন ক'রে কোনো রূপান্তর ঘটাবে না কি? মাটি আর মানুষের কোনো দায়ই তাঁর ওপর বর্তাবে না?

আমি ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা নই। কিন্তু ঘোর আশাবাদী।

বুদ্ধদেব

অজিত দত্ত

বুদ্ধদেব সম্বন্ধে আমি কি লিখবো ? ওর বিচিত্র বহুধাবিস্তৃত বিপুল সাহিত্য-সৃষ্টির কোনো আলোচনা বা বিচার করবার সামর্থ্য বা ইচ্ছে আমার নেই। এখন বুদ্ধদেবের কথা ভাবতে গেলে কেবল কতগুলি স্মৃতি ধারাবাহিক ছায়াচিত্রের মতো মনে আসে। অনেক খুঁটিনাটি কথা, অনেক ব্যক্তিগত কথা। এগুলির কোনো মূল্যই হয়তো আর কারুর কাছে নেই, তবু আজ শুধু সেই কথাগুলোই বলতে পারি আর কিছুই মনে আসে না।

সম্প্রতি বুদ্ধদেব স্মৃতিকথা লিখছিলো। অনেক ছোটখাটো কথা ভুলে গিয়েছিল, দু-একবার আমাকে টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করেছে—'টুনু, তোমার মনে আছে অমুকরা যে রাস্তায় থাকতো তার নাম কী ?' এ জাতীয় খুঁটিনাটি বিস্মৃতি। আমিও অনেক কথা ভুলে গেছি। ঢাকার অনেক রাস্তার নাম সে-সময়ে যাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল বা যাঁরা কখনো সখনো আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছেন, তাঁদের কারুর কারুর নাম। কিন্তু বুদ্ধদেবের সঙ্গে আমার দীর্ঘকালেরা বন্ধুত্বের এমন খুব কম কথাই আছে, যা মনে পড়ে না।

বুদ্ধদেবের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯২১ সালের শেষের দিক। আমি তখন ক্লাস এইট-এ পড়ি। বুদ্ধদা (ডাঃ প্রভু গুহ ঠাকুরতা) আলাপ করিয়ে দিলেন। বুদ্ধদেবরা তখন সবেমাত্র ওর রোগশয্যাশায়ী দাদামশাই চিন্তাহরণ সিংহকে নিয়ে নোয়াখালি থেকে ঢাকা এসেছে। যতদুর মনে পড়ে, ওরা ফরাসগঞ্জে বাসা নিয়েছিলো। যেদিন আলাপ হলো সেদিন বলেই মনে পড়ে, আমি বুদ্ধদেবের সঙ্গে ওর বাড়ি গেলাম। বুদ্ধদেব চা খেতে চাইলো, ওর দিদিমা (যাঁকে ও ম বলে ডাকতো) বোধ হয় রোগী নিয়ে বিব্রত ছিলেন, তিনি তখনি চা করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। আমিই চা বানালাম। শৈশব থেকেই আমি চায়ের নেশাগ্রস্ত। সেই নেশার ঝোঁকেই নিজেই ভালো চা তৈরী করতে শিখেছিলাম। আমার এ নেশা পিতৃদত্ত। আমার চার বছর বয়সেই আমি পিতৃহীন হই। আমার বাবার যেটুকু স্মৃতি আমার মনে আছে, তা হচ্ছে শীতের ভোররাতে আমাকে

ঘুম থেকে তুলে তাঁর লেপের নিচে টেনে নিয়ে তাঁর বেড-টী থেকে চামচে করে আমার মুখে চা ঢেলে দিচ্ছেন। বুদ্ধদেবও চায়ের মস্ত ভক্ত ছিলো। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, বছর দুই আগে একদিন বেলা বারোটা সাড়ে বারোটা নাগাদ বুদ্ধদেব এলো। ২০২ ছেড়ে নাকতলা চলে যাবার পর বড় একটা আসতো না, নিতান্ত এ-পাড়ায় এলে দেখা করে যেতো। আমার স্ত্রী চায়ের প্রস্তাব করতেই সাগ্রহে সম্মত হলো। চা খেতে খেতে বললে, 'টুনু, তুমি কি এখনো আমার মতো চা ভালোবাসো ?' আমি বললাম, চায়ের প্রীতি আমার একটুও কমেনি, কফি বা অন্য কোনো লোভনীয় পানীয় আমাকে চা থেকে টেনে নিতে পারেনি।' বুদ্ধদেব বললে, 'আমিও এখনও চা ঠিক তেমনই ভালোবাসি।' অবশ্য বুদ্ধদেব যে কীরূপ চা খেতো তা তো সকলেই জানেন।

কথায় কথায় অনেক দূর চলে এলাম। প্রথম পরিচয়ের পর থেকে কলেজে ঢোকা পর্যন্ত এমন এক দিনের কথাও মনে পড়ছে না, যে দিন আমরা দুজনে মিলিত হইনি। পুরনো পলটনে চলে না যাওয়া পর্যন্ত সাধারণত বুদ্ধদেবই আমাদের বাড়িতে আসতো। বুদ্ধদেবের এবং আমার এ আকর্ষণের প্রধান কারণ বোধ হয় ছিলো সাহিত্যানুরাগ। মতের, রুচির ও পছন্দের মিলও অনেকটা ছিল। বুদ্ধদেব সেই বয়সেই খুদে হলেও একজন পরিপূর্ণ লেখক হয়ে উঠেছিল। কবিতা তো প্রচুর লিখতোই, অন্যান্য লেখাতেও বেশ হাত পাকাচ্ছিলো ওর নিজস্ব পত্রিকা ক্ষণিকার মধ্য দিয়ে। তাতে সম্পাদক থেকে গল্প কবিতা প্রবন্ধ সব কিছুরই লেখক ছিলো বুদ্ধদেব।

আমি সে সময় পর্যন্ত খুব কমই লিখেছি। কবিতাই লিখতাম, তাও অনেকটা লুকিয়ে চুরিয়ে। নিজের লেখার ক্ষমতায় আমার কোনো আস্থা ছিলো না। কিন্তু একটা বিষয়ে আমি বুদ্ধদেবের মনের কাছে আসতে পেরেছিলাম। সে হচ্ছে সাহিত্য প্রীতি বা সাহিত্য পাঠের ঝোঁক। সাহিত্যানুরাগের ব্যাপারে এতদিন আমি ছিলাম বন্ধুহীন এবং বাড়িতেও এ বিষয়ে উৎসাহদাতা দূরে থাকুক, ছোট ছেলের পক্ষে কবিতা গল্প উপন্যাস নাটক পড়া তখনকার দিনে গুরুজনরা অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলেই মনে করতেন। তবু আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ইতিমধ্যেই কাকার আলমারি থেকে বসুমতীর গ্রন্থাবলী মারফত বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাবলী, মধুসূদন দত্তর কবিতা ও নাটক, রমেশচন্দ্রের ও অন্যান্য অনেক লেখকের অনেক বই এবং প্রথম বছর থেকে শুরু করে বাঁধানো প্রবাসী, ভারতবর্ষ ও মানসী ও মর্মবাণী এবং আরো অনেক পত্র-পত্রিকা ও বই—যা এখন পাওয়া যায় না—সবই পড়ে শেষ করেছিলাম। বুদ্ধদেবের তো ইংরেজী শিক্ষা ওর দাদামশাই ওকে ভালোমতোই

দিয়েছিলেন এবং শেকস্‌পীয়র সমেত ইংরেজী সাহিত্যের অনেকখানি ওর ইতিমধ্যেই পড়া হয়ে গিয়েছিলো। ঢাকা এসে ওর সাহিত্যিক মনের সঙ্গী হতে পারে এমন বোধ হয় আর কাউকেই বুদ্ধদেব পায়নি। বুদ্ধদার সঙ্গে আমাদের বয়সের ব্যবধান অনেকখানি। তাঁর সঙ্গে কখনো কখনো সাহিত্যালোচনা হতো, কিন্তু নিবিড় বন্ধুত্বের সুযোগ ছিলো না। তা ছাড়া বুদ্ধদা অল্পদিন পরেই কয়েক বছরের জন্য আমেরিকা চলে যান।

১৯২২ সালে বুদ্ধদেব ঢাকার কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হলো, ক্লাস এইট-এ। আমি তখন ক্লাস নাইন-এ উঠেছি।

ম্যাট্রিকুলেশন পাস করা পর্যন্ত আমরা দুজনে ছিলাম নিত্যসহচর। ম্যাট্রিক পাস করা পর্যন্ত অমলেন্দু বা পরিমলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বা বন্ধুত্ব হয়নি। বুদ্ধদেবের অবশ্য দুজন সহপাঠী বন্ধু হয়েছিলো। দুজনেই খুব ভালো ছাত্র এবং পরবর্তীকালে আই সি এস হয়ে অল্প বয়সেই পরলোকগত। এদের নাম সুকুমার বসু ও সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বুদ্ধি বা 'ইনটেলেকট' দ্বারা ওরা বুদ্ধদেবকে আকর্ষণ করেছিল কিন্তু আমি ছিলাম ওর একান্ত কাছের বন্ধু। ইস্কুলের বছরগুলি এবং ইন্টারমিডিয়েট কলেজের দু বছর পর্যন্ত আমরা সবচেয়ে কাছাকাছি ছিলাম কারণ, তখনো বন্ধু বৃত্তের পরিধি বেশী বিস্তৃত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বছরগুলির প্রায়ই তাই যদিও তখন আমরা একটা বৃহৎ সাহিত্যিক-সাহিত্যরসিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত হয়ে পড়েছি, তবু তার মধ্যে তখন পর্যন্ত বুদ্ধদেব ও আমিই ছিলাম সবচেয়ে কাছাকাছি।

বুদ্ধদেবের সঙ্গে পরিচয় হবার পর বছর সাত-আট আমি সবচেয়ে বেশী বই পড়েছি, সবচেয়ে বেশী লিখেছি। পড়ার ঝোঁক আমার আগে থেকেই ছিলো, তবে প্রধানত বাংলা সাহিত্য। তবে বুদ্ধদেবের মতো নয়, কারণ শুধু পড়া ও লেখা নিয়ে সাধারণত কোনো ছেলেই থাকতে পারে না। বুদ্ধদেবের কোনো খেলায় উৎসাহ ছিল না, ও সব সময় পড়া বা লেখা নিয়ে থাকতে পারলেই খুশি হতো। আমি বা আর পাঁচটা ছেলের পক্ষে তো আর সেটা সম্ভব নয়। তবু বিদেশী সাহিত্যের সত্যিকারের যেটুকু পড়াশুনো করেছি, তার অধিকাংশই বুদ্ধদেবের সঙ্গে। ওর সঙ্গে ওর বাড়িতে সেকস্‌পীয়রের রচনাবলী থেকে চতুর্দশপদীগুলি এবং ভিনাস অ্যাণ্ড অ্যাডনিস্ প্রভৃতি কবিতা যা বুদ্ধদেব আগে থেকেই অনেকটা পড়েছিলো, দুজনে মিলে পড়েছি। তাছাড়া আমি ইন্টারমিডিয়েট কলেজে প্রবেশ করার পর বইয়ের আর অভাব ছিল না। জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের লাইব্রেরিয়ান আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ছাত্রেরা পাঠ্য বই ছাড়া খুব কম বই-ই লাইব্রেরি থেকে নিতো। আমার সাহিত্য পাঠের আগ্রহ দেখে তিনি

আলমারির চাবিগুলো কোথায় থাকে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কলেজের সংগ্রহও খুব ভালো ছিলো। আমি যখন তখন আলমারি খুলে ছখানি আটখানি বই নিয়ে যেতাম, শুধু বলে যেতাম 'আমি আটখানা বই নিলাম স্যার।' ওখান থেকে নিয়ে অনেক বই পড়েছি, বিশেষত Garnett দম্পতির অনূদিত Turgenev Chekhov প্রমুখ লেখকদের সম্পূর্ণ রচনাবলীর অনুবাদ প্রভৃতি। সবই আমরা দুজনে মিলে পড়েছি। ইউরোপীয় সাহিত্যের আরো অনেক সুখ্যাত রচনা এইভাবে পড়ার সুযোগ পেয়েছি। আরো যেসব পড়েছি, তার মধ্যে অজস্র কবিতা, তো ছিলোই, তা ছাড়া মোপাসাঁর গল্প উপন্যাস ও অস্কার ওয়াইল্ডের রচনাবলী বিশেষ করে The Picture of Dorian Gray পড়ে আমরা অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলাম। এটা উল্লেখ করছি এই জন্য যে, কল্লোলে লিখতে আরম্ভ করার পর মাঝে মাঝে কখনো আমি, কখনো বুদ্ধদেব যখন কলকাতা আসতাম, তখন সেই সাময়িক বিচ্ছেদ পূরণ করার জন্য বুদ্ধদেব সপ্তাহে খান দুই করে চিঠি লিখতো। চিঠিগুলি সবই ইংরেজীতে লেখা সুন্দর হলদেটে বা নীলচে খামে অনুরূপ চিঠির কাগজে দীর্ঘ চিঠি তাতে সর্বদাই সম্বোধন থাকতো Prince Charming অথবা Mon Chor এই দীর্ঘ ইংরেজী চিঠিগুলির আমি যোগ্য উত্তর দিতে পারতাম না। বুদ্ধদেব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখতো—এ কদিন কি লিখলো কার সঙ্গে মিশলো, কারুর সঙ্গে নতুন পরিচয় হলো কি না, কোন বই পড়তে শুরু করেছে, কে বোকার মতো কথা বলেছে কোন্ সিনেমা দেখে এসেছে ইত্যাদি। আমি লেখার অতো বিষয় কোনোকালে খুঁজে পেতাম না। আমার চিঠি হতো বড জোর দেড় পৃষ্ঠা বা দু পৃষ্ঠা। তখন আড়াই তোলার চিঠি এক আনায় যেতো, বুদ্ধদেব পুরু কাগজে লেখা বারো চোদ্দ ষোলো পৃষ্ঠার চিঠিতে এই ওজনের সদ্ব্যবহার করতো এবং প্রায় চিঠিতেই অনুযোগ করতো, আমি ওর মতো বড চিঠি লিখি না বলে। আরও অনেক বই পড়বার সুযোগ তখন হয়েছে বুদ্ধদার কল্যাণে বুদ্ধ আমেরিকা থেকে অজস্র বই পাঠাতেন। ছোট ছোট, প্রায় মিনি পত্রিকার আকারে কাগজের। মলাট দেওয়া গোর্কি আন্দ্রীভ্ প্রমুখ লেখকদের রচনা। তাছাড়া বাঁধানো কিন্তু পকেট বইয়ের আকারে ইউরোপের যাবতীয় ভাষার কবিতার অনুবাদের সিরিজ।

অবশ্য, বিদেশী সাহিত্যে আমার পড়াশুনো বৎসামান্য। এত কম যে বিদগ্ধ বন্ধু মণ্ডলীতে বিদেশী সাহিত্যের কথা উঠলে আমি তাবড় গোছের ভাব করে মুখ বুজে থাকি। অল্প যেটুকু পড়েছি তা বাল্যে ও কৈশোরে বুদ্ধদেবের নিত্য-সাহচর্যে সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু পড়ার চেয়েও বড় কথা কবিতা লেখা। আমি আগেই বলেছি আমার কবিতা লেখার ক্ষমতায় আমার কোনো আস্থা ছিলো না। কি করে হবে? আমার বাড়িতে বা আশে পাশের বড় ছোট কোনো ব্যক্তির কথা মনে করতে পারি না. কবিতা লেখা বা সাহিত্যচর্চা সম্বন্ধে যার কিছুমাত্র ঔৎসুক্য বা অনুরাগ ছিলো। আমি কবিতা লিখি একথা যদি কখনো কারুর কাছে প্রকাশ করেছি, তবে সেটা হাসি তামাশার বিষয় বলেই গণ্য হতে দেখেছি। বুদ্ধদেবের সঙ্গে আলাপ হবার পর বুদ্ধদেব যখন আমার লেখার প্রশংসা করলো, লেখার জন্য আমাকে রোজ তাগিদ দিতে থাকলো, তখন থেকেই বলতে গেলে আমি কবিতা লেখার মতো আত্মপ্রত্যয় খুঁজে পেলাম। কৈশোর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করা পর্যন্ত যে কয়েক বছর আমি বুদ্ধদেবের ঘনিষ্ঠতম সংস্পর্শে ছিলাম, সে কবছর আমি ভালো মন্দ অজস্র লিখেছি। তার অনেক হারিয়ে গেছে, এখনো খাতায় যা পড়ে আছে তার পরিমাণও কম নয়।

এর পর তিরিশ দশকের গোড়ার দিকে আমি ও বুদ্ধদেব দুজনেই কলকাতায় চলে আসি। আমি থাকতাম উত্তর কলকাতায়, বুদ্ধদেব দক্ষিণ কলকাতায়। কিন্তু দৈব পুনরায় আমাদের মিলিত করলো ২০২ নম্বরে। বুদ্ধদেব এসেছিলো ১৯৩৭-এ। '৩৮ সালে উপরতলাটা খালি হওয়া মাত্র বুদ্ধদেবই আমাকে টেনে নিয়ে এলো। তারপর 'কবিতা' পত্রিকা বেরুলো। আমি তখন টীসেস কমিটি বা টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ডে চাকরি নিয়েছি। বুদ্ধদাই জোর করে আমাকে অধ্যাপনা ছাড়িয়ে ডেকে নিয়ে গেছেন। দশটা পাঁচটা আপিস করি। কবিতা লেখা খুব কমই হয়। সাহেবী আপিসের পরিবেশ সাহিত্যচর্চার অনুকূল নয়। তারপর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে কবিতা লিখতে বসতে ইচ্ছা করে না। দোতলায় নেমে আড্ডা দিয়েই বেশী সুখ পাই। একদিন সকালবেলা বুদ্ধদেব উপরে এসে বললে 'টুনু এখুনি একটা কবিতা দাও।' আমি বললাম, কবিতা তো নেই একটা লিখতে আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু মনের মতো হচ্ছিলো না বলে ফেলে রেখেছি। ও বললে 'দেখি তোমার কবিতা খাতা।' খাতা দেখে বললে, 'তোমার প্যাড আনো। লিখিত অংশটুকু নকল করে নিয়ে বললে, কী নাম দেব বলো। আমি বললাম, 'ওটা তো আসলে একটা fragment। নাম দাও 'একটি কবিতার টুকরো'। সেই নামেই কবিতা ছাপা হলো।

কিছুদিন পরে আমার জন্মদিনে একখানি বড় খাম হাতে নিয়ে সকালবেলা বুদ্ধদেব এলো। খাম খুলে দেখি আমাকে সম্বোধন করে দু'পৃষ্ঠাব্যাপী একটি কবিতা। ছোটবেলায় আমার ঘুড়ি ওড়াবার নেশা ছিলো। পৌষ-সংক্রান্তিতে

হতো ঘুড়ির মহোৎসব। বুদ্ধদেব ঘুড়ি ওড়ানো দেখতে দেখতে গল্প করতো। আমার সেই ঘুড়ি ওড়ানো নিয়ে কবিতাটির আরম্ভ, এবং আমার প্রতি অনুযোগ ও ভৎর্সনা, কেন আমি কবিতা লিখি না, বাজে কাজে সময় নষ্ট করি। কবিতাটি আমারই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কোনদিন ছাপা হয় নি। পরে কোনদিন হয়তো প্রকাশিত হবে।

কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের একদা নামকরণ করা হয়েছিলো অতি আধুনিক—বুদ্ধদেব সেই অতি আধুনিক, যে কবিতা পত্রিকার দ্বারা এবং ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণার বিস্তারে চিরদিনই নিজে অতিশয় আধুনিক থেকে আধুনিক কবি সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিল। সেটা সম্ভব হয়েছিলো, কারণ বুদ্ধদেব নিজের যৌবনকে, এমন কি অনেক পরিমাণে কৈশোরকেও সম্পূর্ণ হারায় নি। তা না হলে কি ষাট বছর বয়স অতিক্রম করেও কেউ অমন প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারে? সম্প্রতি ওর স্ত্রীর অসুস্থতার পর ওর হাসি স্তিমিত হয়ে গিয়েছিলো, ওকে বিষণ্ণ মনে হতো। বোধ হয় এই আঘাতে বার্ধক্য ওর দেহ মনের দ্বারপ্রান্তে উকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছিলো। তাই বুদ্ধদেব বয়সে আমাদের সকলের চেয়ে ছোট হয়েও সকলের আগেই চলে গেল। অতি আধুনিক—বুদ্ধদেব বুড়ো হবে সেও কি সম্ভব?

শীতের কাছে প্রার্থনা

সন্তোষ কুমার ঘোষ

[ক]

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস নিয়ে একটি রচনার ফরমাশ— চুল ছিঁড়ছি আর শাপ দিচ্ছি সম্পাদক দু-জনকে, কী মুশকিলেই ওঁরা ফেলেছেন। কাবুলিদের হাত-মানানো তাগাদায় বিপন্ন আমি যে সটকে পড়লুম শান্তিনিকেতনে, তার মানে এই নয় যে, লেখাটা আমি লিখতে চাইনে, ভীষণ চাই. কিন্তু কাজে-আওয়াজে ব্যতি-ব্যস্ত কলকাতায় কিছুতেই কলমটাকে কাজে উপগত করতে পারছিলুম না, তাই কাটলুম, দূরে গিয়ে মন্দবহ একটি দিনে, যাকে বলে পারস্পেকটিভ সে-টা যদি ধার পাই। আর দেখুন, পেলামও, আমার চালশের চশমা দিব্যি ঝকঝকে দেখতে দেখতে ; বস্তুত এর দরকার ছিল . বুদ্ধদেব বসুর বিষয়ে লিখতে আমার হঠাৎ-গজানো প্রৌঢ়োমি থেকে ক্লীন কয়েকটা বছর ক্ষৌরী না-করলে হ'তো না।

অতএব দেনা শোধ। (দেনা ? বুদ্ধদেব যাকে বলেছেন 'বিধাতার দেনা', সেই দেনা ?) দূর, তা কেন হবে, আমি হীনযান মহাযান কোনো-প্রকারের বৌদ্ধই কোনোকালে নই, তবু আকৈশোর তার লেখা পড়ছি, পাবলিক পাঠাগারে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর বই চেয়ে নিচ্ছি প'ড়েই কিংবা না-প'ড়েই, বুঝেই কিংবা মাথা-মুণ্ডু না-বুঝেই . কেননা নিতেই হবে, কেননা বুদ্ধদেব বসু তখন বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে চমকানো নাম, অনেকের কাছে সবচেয়ে চটানো নামও। অন্তত আমাদের মফস্বলের সেই লাইব্রেরীর কেরানির কাছে। তিনি মানা করতেন, 'এ-বই তোমরা পোড়ো না, বরং এইটে নাও –'বিপ্রদাস'। শরৎবাবু এই বইয়ে রবিবাবুর 'গোরা'র জবাব দিয়েছেন।' । রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র উভয়েই তখন জীবিত।)

নামটা কবে প্রথম শুনি মনে নেই। প্রাণপণে প্রভাত মুখুজ্যের গল্পের উপর দাগা বুলোই তখন, হাতে-লেখা পত্রিকা হাতে চালাচালি করি, বাংলা সাহিত্যে কবে 'কল্লোল' এল, গেল, যশঃপ্রার্থী, কিন্তু তখনও শুধু নিষ্ঠ পাঠক, মফস্বলের এই ছাত্র টের পায়নি। তার বন্ধু জগৎ দাশ পেয়েছিল। সেই তো এক দিন একটা গল্পের দিকে (কী নাম যেন ? বোধহয় "যাহা যাহায় তাঁহা তিপ্পান্ন") আঙুল দেখিয়ে

বলল এইটে পড়। লেখকের নাম দেখলুম বুদ্ধদেব বসু। 'সেকেলে নাম যে।' বন্ধু হেসে বলল 'সেকেলে সব নামই তো একালে আধুনিক হ'য়ে আসছে, জানিসনে? আজকালকার নায়কদের নাম দেখিসনি, অনিরুদ্ধ, জয়দ্রথ কিংবা পরাশর। বুদ্ধদেব বসু লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে তরুণ, আধুনিক।' আমার বন্ধুদের মধ্যে জগৎই ছিল প্রগাঢতম বৌদ্ধ, লিখে গেলে সে এত দিনে সারিপুত্ত কি মোগল্লান নির্ঘাত হ'তো. মৃত্যুর পর তার দন্ত অত্যন্ত যত্নে হ'তো রক্ষিত। আমিই বরং তৎকালে অচিন্ত্য-কুমারে, প্রেমেন্দ্রে কি প্রবোধকুমারে ছিলাম অধিকতর আসক্ত।

'হে বিজয়ী বীর', 'যবনিকা-পতন', 'যেদিন ফুটলো কমল', 'লালমেঘ' 'বাসর ঘর' ইত্যাদি গোগ্রাসে গেলা সেকালের সেই বইয়ের পর বই! যেন ঢেউয়ে ঢেউয়ে হাবুডুবু খেয়ে এই উঠলাম, সারা চোখেমুখে ফেনা, লবণাক্ত স্বাদ তখনই নেই, খানিক পরে, আরে, ফেনাও নেই! অথচ ছিলও, বাক্য-বিন্যাসে, কথ্য রীতির তীব্র কিন্তু প্রবহমান ব্যবহারে, তা-ছাড়া স্মৃতিতে। 'কালো হাওয়া', 'তিথিডোর', — এই সবের পাঠান্ত-আনন্দ লেগেই রইল। আর এই যে আমি সবে তৃতীয়বার শেষ করলুম 'পাতাল থেকে আলাপ', খানিকটা শুয়ে-শুয়ে, কিন্তু নায়কের মৃত্যু-মুহূর্তে উঠে বসতেই হ'লো, কয়েক মাস আগে পড়েছি 'রাত ভ'রে বৃষ্টি' 'গোলাপ কেন কালো'—কৃতজ্ঞ এই পাঠকের কাছে লেখকের প্রাপ্য কিছু কি নেই? সেই জন্যেই বলেছিলুম 'দেনা'। সেই দেনা শোধ করতে বসেছি।

[খ]

সেই নায়কেরও বয়স তবে ষাট হ'লো? ভাবাই যেত না, যদি-না সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ত. এই লেখকও প্রায় পঞ্চাশ ধরো-ধরো। সময় কাউকে রেয়াত করে না জানি. কিন্তু জব্দই বা করতে পারে কতটা! ষাট বছরটা কিসের হিশেব, কিসের প্রমাণ? সময় জব্দ করতে পারে বড়ো জোর শরীরকে, কারণ শরীর ডাল পালার মতো, মাথা পেতে ঝড় ঝাপটা সয়, কিন্তু শিল্পীর অস্তিত্বের সঞ্চয় তার শিকড়ে, অথবা শরীর শুধু সিন্দুকের ডালা, তারই পিঠে তেল-কালি ঝুল-ধুলো পড়ে, পড়ুক না. কী এসে যায়, ভিতরের সম্পদ যদি অব্যাহত থাকে! ভয় হ'তো, যদি দর্পিত একটি অস্বীকৃতি হঠাৎ অথর্ব হয়ে যেত, জরা জীর্ণ করত একটি গাঢ় অস্থিরতাকে, ন্যুব্জ হ'তো কঠিন ঋজু একটি ভঙ্গি। এমন তো নয়, বুদ্ধদেব উনষাট বছর অবধি যা-লিখেছিলেন, ষাটে-একষট্টিতে তা লিখবেন না, তা হ'লে তাঁর ষষ্টিপূর্তি উপলক্ষে না-হয় জোরদার শোকোৎসব করা যেত। কিন্তু আমার ধ্রুব ধারণা, এঁর ক্ষেত্রে মাইল-ফলক গতির যতি চিহ্ন হবে না। আর, বয়সটা

তো শুধুই সংস্কার, কিংবা একটা হিসাবের সুবিধা, মাঝে-মাঝে পাশ বই দেখার মতো; জমা কত, কত খরচ ; কোন্ ইনসুরেন্স কবে মেচিওর করল।

'কলকাতা' কাগজ যতই ঢাক পিটিয়ে তাঁর বয়সটাকে রটাক বুদ্ধদেব নিজেকে বলতে পারেন—তাঁর জমার ঘরে যথেষ্ট। যদি মনে পড়িয়ে দিই, এটা 'পূরবী'-র বয়স, যে-বয়সে এসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিজয়া''র দেখা পেয়েছিলেন তবে সে-টা খেলো কড়ির মতো শোনাবে। বরং বলা যাক "ষাট ষাট"।—এই ষাটেই বুদ্ধদেবের বিজয়া—দূর! এখনও তো তাঁর বৈজয়ন্তীর পালা চলছে। বলতে বাধা নেই, সমকালীন লেখকদের মধ্যে তিনি বিরাট একটি ব্যতিক্রম আঙুলে পুরনো ঘি-য়ের গন্ধ নন; নন টাটকা ফুলে ঢাকা পূজ্য একটি পট। তিনি অত্যন্ত জীবন্ত, সর্ব অর্থেই, কবিতায়, প্রবন্ধে, তাঁর নতুন-ভালবাসা নাটকে, প্রাচীন-শিখা কথা সাহিত্যের কাছে পুনরাগ মনে সর্বোপরি তাঁর সর্বত-লেখকসত্তায় ও ব্যক্তিত্বে, একটি সজীব-নবীন সাহিত্য-গোষ্ঠির কুলপতিত্বেও। ভাসাটিলিটি-রূপী বহু-বিবাহ বহু লেখকের পক্ষেই অবক্ষয়ী প্রাণপাত শ্রম, বুদ্ধদেব সৌভাগ্য ক্রমে এই দায়ভারে ক্লান্ত নন। এই রচনার বিষয় তাঁর উপন্যাস। 'সাড়া'য় যিনি নিষ্কলঙ্ক শূন্যে সঞ্চারী, অধুনা যদি তিনি পাতালে আলাপ-রত, মনে রাখা ভালো, এই অবরোহণ আসলে ক্রমিক, এবং অলীক স্বর্গ থেকে বিদায় স্বেচ্ছা-নির্বাচিত।

[গ]

এইমাত্র 'সাড়া' উপন্যাসটির পাতার পর পাতা তাড়াতাড়ি উলটে গেলাম, কখনও একটু-বা থেমে; কখনও শুধুই চোখ বুলিয়ে। সেই শেষ-কুড়ি বা শুরু-তিরিশ দশকের গন্ধ। আগেই বলেছি, তরুণ বুদ্ধদেব সম্পর্কে লিখতে গেলে আমার কিশোর হ'য়ে যাওয়া আবশ্যক ছিল। শুরুতেই এই বই যদি বেছে নিয়ে থাকি, তবে তার হেতু বইটি "তাঁর উপযুক্ত বলে নয়, প্রথম বলে" [উৎসর্গ দ্রষ্টব্য]।

বেশ মজা লাগল নতুন সংস্করণের ভূমিকা-প্রসাদে যখন জানলাম, এই রক্তাম্ল, পীত, অতিমাত্রায় পরিমিত গ্রন্থটিও নাকি কোনও কালে অশ্লীল ব'লে কথিত হ'তো! বিস্ময়ের কিছু নেই, সূতিকায় কোন্ শিশুই বা শ্লীল, অপিচ মনে রাখবেন, সে-কালে বাংলা কথা-সাহিত্যের সেই মধ্যযুগে পাঠক-রুচিও ছিল মধ্যযুগীয়। ইতিহাসে কি পড়িনি যে, মধ্যযুগের রীতিই ছিল ওই, লঘু পাপে গুরু দণ্ড, দোষীদের হাত-পা কেটে সেকালে সাজা দেওয়া হ'তো।

বেশ মজা লাগল, হঠাৎ এই অনুচ্ছেদটি প'ড়ে :

"ভদ্রলোকের মুখখানা দিব্যি গৌরবর্ণ, বড়ো-বড়ো চুল ঘাড়ের কাছে কোঁকড়ানো,

গায়ে নীল খদ্দরের পাঞ্জাবী, পায়ে সবুজ নাগরা, চোখে একটা প্যাশনেও আছে। প্রতিটি অঙ্গ লীলায়িত করিয়া দিয়া নিতান্ত অলসভাবে সে একটি সোফায় গা এলাইয়া দিয়াছে"।

উদ্ধৃতি যে 'সাড়া' উপন্যাস থেকে, সেটা ব'লে দেবার দরকার ছিল না। বাংলা গল্পাদি পড়া-টড়ার অভ্যাস যাঁদের আছে, তাঁরা এমনিতেই ধ'রে ফেলবেন. লাইনগুলোর বয়স প্রায় চল্লিশ হ'য়ে এল। ওই 'প্যাশনে' শব্দটিই ধরিয়ে দেবে। তখন বাবুয়ানার বর্ণনায় ওই উপচারটি ছিল অবশ্যম্ভাবী। আর ঘাড়ের কাছে ওই কোঁকড়ানো চুল! 'ভারতী'-যুগের সম্ভ্রান্ত-শৌখীন কোনো-কোনো লেখকের আলেখ্য আপনা থেকেই আবার আঁকা হ'য়ে যাবে। আর মনে পড়বে, বঙ্গজ ভদ্রতনয়ের মধ্যে এক কালে নাগরা (সবুজ, অবুঝ যাই হোক) লপেটা এই সব পরার খুব চল হয়েছিল বটে। আর ওই খদ্দরের (তা-ও নীল!) পাঞ্জাবী—এক কথায় অ্যাট্রোশাস্! বিশেষ একটি প্রভাবশালী দল বা গ্রামোদ্যোগী মহলের বাইরে একালে ক'জন স্বেচ্ছায় সুস্থ শরীরে খদ্দর পরেন জানিনে।

পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে এই রকম, যাকে বলে, আভ্যন্তর সাক্ষ্য, যে-সাক্ষীরা সত্য বই মিথ্যা বলে না। হুঁস করিয়ে দেয়, তখন জীবন, মন, এইসব কত জটিলতা-মুক্ত ছিল। সেটাও যখন একটা যুগ, তখন যন্ত্রণাও ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু 'যুগ-যন্ত্রণা' জাতীয় কদাকার কোনও বাক্যবন্ধ রচিত হয়নি। যার যার যন্ত্রণা, তার-তার, কোনও যুবক কিংবা যুবতীর, ক্রুশের মতো একক স্কন্ধে বাহিত, তীক্ষ্ণ তীর হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ, অথবা কোনও করুণ সোনালো গান, যন্ত্রণা মানে সাত শেয়ালের হুক্কাহুয়া কোরাস না। প্রেমে পতন, মূর্ছা, উত্থান বা মৃত্যু, সবই নির্ধারিত সরল পথে বাঁধা ছিল।

এগিয়ে যাই। যে "দীপোজ্জ্বল দোতালা বাড়ীর ড্রইং রুমের" মেঝেয় লাল ফুল-আঁকা কার্পেট, যে-বাড়ির মেয়ে ফুরফুর ইংরাজীতে কোনো কবির লেখাকে বলে 'ডেইন্‌টি ভর্স', যখন দেখি সে-বাড়িটি ভবানীপুরে, তখন চমক লাগে।

মনে পড়ে তখনও ভবানীপুরের দক্ষিণে মহানাগরিক ভূনির্মাণ শুরু হয়নি, পলিস্রোত রমেশ মিত্র রোড বা হাজরা রোড পর্যন্ত এগিয়ে ঠেকে আছে, নিউ আলিপুর যদি থাকে তো শুধু নলিনী সরকার মশাইয়ের মগজে। পুরনো আলিপুর আর পুরনো বালিগঞ্জ মধ্যবিত্ত কল্পনায় অনধিগম্য, চৌরঙ্গির পূর্বাঞ্চলও ফিরিঙ্গি কবলিত, সুতরাং আউট অব বাউণ্ডস্।

সেই হেতু ভবানীপুর, ভবানীপুরই সই। লিভিং রুম কথাটা তখনও এ-দেশে

আসেইনি, অপ্রতিহত প্রভাবে চলছে ড্রইং রুম, সেখানে আপ্যায়নে সততই চা, অন্য পানীয় দূরে থাক, কফিও না।

কিংবা ধরা যাক, নোয়াখালিতে ভাদ্র-অমাবস্যায় "শর" আসার সেই বর্ণনা :

"বঙ্গোপসাগর তাহার কন্যাটির এই দৈন্য সহিতে পারে না, প্রবল যৌবনের মতো সে জোয়ারের ঢেউ পাঠাইয়া দেয়, বজ্রের শব্দ ও বিদ্যুতের বেগ লইয়া তাহা উন্মত্ত আগ্রহে ছুটিয়া আসে, নিমেষে মরা নদী কূলে কূলে কালো হইয়া ফুলিয়া ওঠে, দূরের তটরেখার সমস্ত চিহ্ন প্রবল ঢেউগুলির ক্ষুধিত জিহ্বা চাটিয়া মুছিয়া নেয়। নদী তখন গর্জিয়া কুঁদিয়া, মাথা খুঁড়িয়া আছড়াইয়া পড়িয়া কী যে করিবে এবং না করিবে তাহা যেন ঠাহর করিয়া উঠিতে পারে না"।

এই পংক্তি কয়টি অনায়াসে হ'তে পারত পিতামহ রবীন্দ্রনাথের। অথবা

"ব্যোমকেশ গরম চায়ে গলা ভিজাইয়া লইয়া একটা আরাম-সূচক গলা খাঁকারি দিয়া বলিল, হ্যাঁ ছোটই তো!"

—পিতৃব্য শরৎচন্দ্রের হ'তে পারত। পরবর্তীকালে একমাত্র কথারীতির সেবক বুদ্ধদেবও যে প্রথমে অ-কথ্য রীতিরও সাধক ছিলেন, সেটাও কম মজার নয়। মনে রাখবেন, কাঁচা বয়সে প্রমথ চৌধুরীরও পাকা সাধুবেশ ছিল।

অতএব গুজবে কান দেবেন না। যাই রটুক, বিদ্রোহী নবীন-বীর অভ্যুত্থিত হ'য়েই স্থবিরের শাসন-নাশনের হুঙ্কার দেননি, অন্তত গদ্যে। (রবীন্দ্রনাথেরও গোড়াকার গদ্যরীতি, কী আশ্চর্য, বঙ্কিমের সঙ্গে যেন হুবহু মেলে।) বুদ্ধদেবের বয়স তখন কত আর, কুড়ি-বাইশের বেশি না, টীন-এজার নাম খণ্ডিয়েছেন সবে, কিন্তু তখনও ডাকসাইটে ভালো ছাত্র, তার প্রমাণ 'সাড়া' বইয়ের নানা ছত্রে, নায়কের মুখে প্রলাপের মতো শেক্সপীয়র (কিন্তু সে কপোত-বুক। নিমচাঁদ, আদৌ নয়), সাহিত্য-সাম্রাজ্যের অধীত অধীশ্বরেরা তার ধ্যানে অনুভবে সর্বক্ষণ উপস্থিত, তার সর্বস্বত্বের দখলদার।

সেই যুবকেরা কোথায় গেল যারা রাতভোর পায়চারি করে ছাতে, যাদের "শরীরে রাত্রির স্পর্শ", "চেতনায় বিশ্বের চুম্বন"? চিন্তা রুদ্ধ, সত্তা লুপ্ত, অন্তহীন মুহূর্ত, চিরন্তন জীবন,—শব্দের পর শব্দ, একটি নির্বস্তুক মরমী, মনোরম জগৎ, যে-জগতে হতাশ প্রেমিক গ্যাসের আলোয় প্রণয়িণীর অপার্থিব শাদা শাড়িটিকে ফেনার মতো ফুলে উঠতে ছাখে, আর অব্যর্থ ঝাঁপ দেয়? তাদের আর দেখি না, তারা কোনকালে ছিল কিনা জানি না, কিন্তু থাকলে বেশ হ'তো; নতুন ক'রে পড়ার পরও যদিও মনে হয়েছে অবিশ্বাস্য, তবু অলীক আতঙ্কে

ঘ্রাণশক্তি ছেয়ে গেছে, মনে হয়েছে ওই নায়কের মতো অসম্ভব আত্মহননের মধ্য দিয়ে আত্মাকে মুক্ত করা গেলে অস্তিত্ব আরও শুদ্ধ হ'তো।

শিথিলভাবে গ্রথিত ঘটনা-পরম্পরা, কখনও সন্দেহ হয়, হয়ত-বা পরিকল্পনাহীন, সেই কারণেই খাপছাড়া, মাঝে মাঝে টপ্‌কে চলা। চরিত্রগুলিও প্রায় অ-প্রকৃত, রক্ত আছে তো মাংস নেই, রস যদি থাকে তবে হাড় নেই—এই 'সাড়া'।

বউ মণিমালার কাছে যত ওস্তাদিই সে ফলাক, সাগর বস্তুত সুবোধ সরলমতি না-হ'লেও সরলগতি, পরিণামে নিহত।

নিহত ? সে-বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হ'তেই বা পারছি কোথায় ? 'সাড়া'র সাগরের মধ্যে বুদ্ধদেবের উত্তরকালীন প্রায় সকল নায়কই ভ্রূণরূপে প্রত্যক্ষ। তারা বহির্বিমুখ, ভয়ংকর শৈত্যে জর্জরিত, আপাতদৃষ্টিতে কূর্মবৎ আবৃত। দৃষ্টি স্পর্শ ঘ্রাণময় ধরিত্রীতে তারা শ্বাসপ্রশ্বাস অবশ্যই নিচ্ছে, কিন্তু যেটুকু ন্যূনতম প্রয়োজন তার বেশি না। একটি আঘাত চাই, ধরা যাক কোনো শব্দতরঙ্গ ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ইথারের বলয় মহাকাশ ব্যেপে বিস্তৃত হ'তে থাকল। একটি কেন্দ্রবিন্দুর চার পাশ ঘিরে অসংখ্য ঊর্ণাতন্তু, সে-ও এক চমৎকার পরমাশ্চর্য শিল্প, স্পর্শকাতর, কখনও কখনও ক্লান্তিকর তবু পরিশ্রমী পাঠক এক মায়াবী জগতের মোহে জড়িয়ে যান, পুরস্কৃত হন পরিণামে, সেই পুরস্কার ফিরিয়েও দেন লেখককে, স্নায়ুতন্ত্রী তখন নিঃশব্দে ঝনঝন বাজে। বস্তুত এই জাতীয় সব কাহিনীই নির্বস্তুক, 'বস্তু' বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি সেই অর্থে। অথবা বস্তু যদি-বা আছে তা অনিরীক্ষ্য তলের শীতল, কঠিন শৈলে, উপরে পুঞ্জপুঞ্জ ফেনা, আর ভাবনার ঘূর্ণি।

বুদ্ধদেব নিজে বলেছেন এ-টা তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস-চরিত্রের সামান্য লক্ষণ। এই চরিত্রেরা যদি-চ মাঝে মাঝে বাইরের দিকে চায়, তথাপি প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ভিতরে চোখ ঘুরিয়ে নেয়। হয়ত পিতার স্বভাব উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তেছে। বুদ্ধদেব কদাচিৎ রাজসিকতার ভঙ্গী করেন বটে, কখনও ইঙ্গিতে কখনও দিব্যি জমিয়ে যৌনসঙ্গমাদির ছবিও আঁকেন, (একটা গল্পে তো সাহস ক'রে 'পেশাপ' করাও লিখেছিলেন মনে পড়ছে) তবু আসলে তিনি জীবনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন দীর্ঘকাল, আমরা যাকে জীবন বলি তাকে, ফলে বাইরের রূঢ়, রুক্ষ, কাঁকরে-ধূলিতে কর্কশ বিশ্বের ছায়াপাত তাঁর শিল্পে কদাচিৎ ঘটে। তাঁর রচনার স্থায়ী, সম্বাদী সুরটি, যিনি যাই বলুন, রমণ নয়, মনন। যে ছুটতে পারেনি সে ডুব দিয়েছে।

বুদ্ধদেব বিচলিত হবেন না, এখানে তার সঙ্গী অন্য এক পূর্বসূরী স্বয়ং

রবীন্দ্রনাথ। তিনি তো ব'লেই দিয়েছিলেন, যা ঘটে তা সব সত্য নহে। স্থূল বস্তু বা বক্তব্য নিয়ে আস্ত আস্ত নাটকই লিখে ফেলেছিলেন কয়েকটি, বাঙালী পাঠক সেদিন সে-সব চেয়েও দেখেনি, আজ সবে চেখে দেখছে। বিষয়-আশয় যাই থাক, রবীন্দ্রনাথ কথাশিল্পে বিষয়ী ছিলেন না আদৌ, আমরা জানি, তাই কৃষি-ব্যবস্থাব উন্নতি, সমবায়-আন্দোলন, শ্রীনিকেতনে হাতে-কলমের বিদ্যায় হাতে-খড়িব আয়োজন সত্ত্বেও বলব, রবীন্দ্রনাথ বাইরেব জগৎকে তাঁর নিভৃত সাধনায় প্রত্যাখ্যানই করেছিলেন, তাঁর রচনার শ্রী-নিকতনে অন্তত ঘটনার ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, ঘাত-প্রতিঘাতে রুদ্ধশ্বাস কাহিনী-বিন্যাসেব কোনও স্থান ছিল না। অন্যান্যদেব প্লট ধার দিতেন বলে শোনা যায়, কিন্তু নিজে সে-সব জমি ব্যবহাব কবেছেন কদাচিৎ, ডুবতে যে রাজী আছে তার ও-সবেব দরকারও হয় না, সে তাকেই মূল্যবান জ্ঞান করে যে-অভিজ্ঞতা আন্তর, অন্য উপাদানের প্রতি একটা বিমুখতা নিয়েই ববীন্দ্রনাথ তাকাতেন বাইরেব দিকে, তাই তাঁর লেখায় খালি তারা, ফুল, পাখিবাই ভিড় ক'রে এসেছে বারে, বারে, চোখ ভ'বে দেখেছেন তাদেবই, নয়ত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন ভিতরে, সে-ও একটা অলৌকিক জগৎ, রোমাঞ্চিত, উল্লসিত, আহত, বেদনার্ত, কিংবা নিঃসঙ্গ, সেখানেও ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, জলোচ্ছ্বাস অহরহ ঘটে। বাইরের জগতের বেধ-বিস্তার-পরিধি প্রভৃতিব পাবমাপ আছে, মনের থৈ নেই।

জানালা থেকে দেখা জগৎ আর দুয়ার থেকে বেরিয়ে পড়লে যে-জগৎ, এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকবেই। দুনিয়ার দুই জাতেব কথাসাহিত্যে এই বিভাজন রেখায় চিহ্নিত হ'য়ে আছে।

ববীন্দ্রনাথেব সঙ্গে অন্তর্লীন মিল সম্পর্কে অবচেতনায় অবহিত ব'লেই বুদ্ধদেব বাববার চ'লে যেতে চেয়েও ফিরে এসেছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে, শান্তিনিকেতন কখনও তাঁব চোখে হ'য়ে ওঠে 'সব পেয়েছির দেশ', কখনও বা বাইশে শ্রাবণেব বিষন্ন সন্ধ্যাটিকে হাহাকারে ভ'রে তোলেন, যেমন 'তিথিডোর' এ। যেখানে কবির মৃত্যুদিনে 'সত্যেন চোখ তোলে স্বাতীর মুখে, চোখ নামায় মেঝেতে। বলে, "ববীন্দ্রনাথ'-- আর বলতে পারে না।"

সত্যেন পাবল না ব'লেই আমরা বলতে পারছি, উভয়ে এক নন, কিন্তু সগোত্র। অন্তর্মুখী যাঁরা তাঁরা সবাই যে ঋষিমশায় হ'য়ে বসবেন পূজায় রবীন্দ্রনাথের মতো, এমন কথা নেই, কেউ কেউ হয়ত '৯'কারের মতো ডিগবাজি খাবেন, কিন্তু ভঙ্গি থেকে মিলটা ধরা যাবে। 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে', যোগাযোগ' এই স্রোত মূল গঙ্গা নয়, অন্তঃসলিলা মাত্র, তবু বুদ্ধদেব বসলেন তারই ভাটিতে, যখন ধূর্জটি

প্রসাদও এ পথে আসেননি। মোহানায় বুদ্ধদেব পৌঁছাতে পারলেন কি না পারলেন সে সব তল্লাশ পরে নেব, আগে এই সাহসের তারিফ করি।

মাঝে মাঝে মনে হয়, বুদ্ধদেব একটু আগে এই পথ ধরেছিলেন, ইংরাজীতে Too দিয়ে যা বোঝানো হয়, সেই একটু। তখন তিনি একা, দীর্ঘকালই এখানে একা, একালের চালু ভাষায় যাকে বলে বিচ্ছিন্ন, আলিয়েনেটেড। 'কল্লোল' এর সঙ্গে তাঁর নাম উল্লিখিত হয়, সেটা নেহাতই একটা সমসাময়িকতা, অ্যাকসিডেন্ট এই আবহাওয়ায় তাঁর লেখক সত্তা জাত, কিন্তু ওই মেজাজ পোষণ নন, স্বেচ্ছায় অথবা অগত্যা স'রে এসেছিলেন নিজেই, তৈরী ক'রে নিলেন নিজস্ব একটি তারামণ্ডল, যেখানে তিনি সমান সদস্যপরিবৃত, স্বচ্ছন্দ, সহজ। এই পর্বে গল্প উপন্যাসের চেয়ে প্রবন্ধ আর কবিতাই যেন অধিক দেখি। আধুনিক বাংলা কাব্যসৃষ্টির মাতৃসদনে যিনি অক্লান্ত প্রসূতি, তিনিই আবার নবজাত অপত্যদের বেলায় কর্তব্যপরায়ণ ধাত্রী—এই অনলস অবেতন সেবার বটি উদাহরণ আছে জানি না। অধ্যাপনার ছোটো বড়ো ইন্টারল্যুড বাদ দিলে তিনি আমাদের সাহিত্যে বলা যায়, অনন্য হোলটাইমার। একটি ব্যক্তিত্ব কখনও কখনও সংস্থা হ'য়ে ওঠেন, বুদ্ধদেব তার দৃষ্টান্ত।

[ঘ]

নামে খ্যাতি আছে অথচ রচনার খাতির তেমন নয়, এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে বুদ্ধদেব আবার তার পাশে, অথবা তার আগের সারিতে পাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথকে। কথাবস্তুতে নিরাকারের উপাসক আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম। প্রথম, কিন্তু একই সঙ্গে উৎসাহী ও উদাসীন পাঠককুলের পক্ষপাতিত্বে প্রভাত মুখজ্যে শরৎ চাটুজ্যের কাছে পরাস্ত। এখানে প্রবীণকুলে আছেন বুদ্ধদেব। তিনিও, বলেছি, একটু তাড়াতাড়ি শুরু করেছিলেন। তাড়াতাড়ি কেন? না, তখনও উপযুক্ত আসর তৈরি হয়নি। তৈরি হয়তো হয়নি আজও, এখনও তকতাকই তালি বাজে বেশি, তবু অনুসারী পূজারী জনাকয়েক তো এসেছেন। আগে, বুদ্ধদেব যখন আসেন তখন কেউ ছিলেন না। ইতিহাসের পরিহাস, নতুনেরা যখন এলেন, আসছেন, তখন পূর্বগামী বুদ্ধদেবের সেকালের বংশগল্পই বিস্তৃত, এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ তালিকায়। এ কি কালধর্ম, এ কি শুধু অহংকৃত উত্তর পুরুষের পিছন-ফিরে তাকানোয় অপ্রবৃত্তি, অশ্রদ্ধা, উপেক্ষা? একটি বা দু'টি জেনারেশন, গ্যাপ, প্রজন্মের পার্থক্য ইতিমধ্যে কি ঘ'টে গেল?

অনেকটাই তাই, তবে সবটা নয়। খতিয়ে দেখি, অন্য হেতু ছিল কি না।

বুদ্ধদেবের লেখায় মাটির গন্ধ নেই এটা এককালে ছিল একটা মামুলি ফরিয়াদ, আসলে বুজরুকি। মাটির গন্ধই সেরা গন্ধ একথা কোন্ শিল্পতত্ত্ব কোন্ নন্দনশাস্ত্র কবে বলেছে। ফুলের গন্ধও গন্ধই, আর রৌদ্রের যোগগন্ধ ডানা থেকে চিল নিরন্তর মুছে ফেলে তার কথা নাই তুললাম।

বুদ্ধদেবের গল্প-উপন্যাসের চরিত্র—'এদের তো চিনি না, বা কখনও দেখিনি', এই নালিশও খারিজ করছি। আমাদের সংকীর্ণ শম্বুক জীবনে ক'জনকেই-বা আমরা চিনি। লেখকেরা তাই প্রায়শ এমন নানা চরিত্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন যারা নেই, কিন্তু থাকতে পারত, যাদের মতো ক'রে কেউ হয়তো ভাবে না, কিন্তু ভাবতে পারত। তবে কি গল্পে চাই ঠাসবুনানি ? সেদিকেও বহুদূর অবধি বহুকাল এগিয়ে সৎসাহিত্য জেনে গেছে ও-রাস্তায় হাঁটার মানে হয় না। ঘটনাই যদি আসল সাব্যস্ত হয় তবে উচ্চাভিলাষী লেখায় ইস্তফা দেওয়াই ভালো, কারণ অঘটন-ঘটনপটীয়ান গোয়েন্দা-গাল্পিকদের সঙ্গে আমরা পাল্লা দিতে পারব কেন ? আর, সাহিত্যের মূল শর্ত কদাচ বহিরঙ্গজীবনের যথাযথ বর্ণনাও হ'তে পারে না, কারণ চাষের জমি, খনি কি কলকারখানার আগমার্কা বৃত্তান্ত আমাদের চেয়ে ভালো দিতে পারবেন কোনো সম্পন্ন খামারের মালিক, লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার প্রভৃতি। সে-সব রচনা বড়ো জোর সাংবাদিকতার টঙ অবধি উঠতে পারবে, তার উপরে না। তার চেয়ে উচ্চস্তরের সত্যে পৌঁছে দিতে পারে ব'লেই সাহিত্যকে বলি সাহিত্য। খনি জমি ইত্যাদি পটভূমি মাত্র, বসবার ঘরে আবিষ্ট নট নড়ন-চড়ন কোনো চরিত্রের ভাবনাও হ'তে পারে মহৎ শিল্পমূল্যে অন্বিত।

বুদ্ধদেবের গোড়াকার কিছু-কিছু গল্পে উপন্যাসে বিদেশী বইয়ের গন্ধ, স্বীকরণের শ্রমটুকুও সর্বদা স্বীকৃত হয়নি, এই আপত্তিও অনর্থক। জিজ্ঞাস্য, এ-গন্ধ আমাদের প্রধান কোন্ লেখকের রচনায় নেই ? অতএব এই হেতুই বুদ্ধদেব প্রাপ্য সমাদর থেকে বঞ্চিত হননি। অন্য হেতুও নিশ্চয় আছে। তাই হাতড়ে খুঁজছি, যে-বুদ্ধদেব বহতা কালের জলে নৌকো বেয়ে এদিকে এতদূর এসেছেন, অতীত থেকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বর্তমানের দিকে, বর্তমান থেকে আবার সেই হাত প্রসারিত ভবিষ্যতে, সেই, সময়ের সঙ্গে সন্ধিকামী, বুদ্ধদেবের উপন্যাসে নির্বস্তুকতা ছাড়া আর কোনো ঘাট ছিল কিনা। চলতি কথায় যাকে বলি মনন, তার মানে তো এই যে গভীর থেকে গভীর স্তরে খুঁড়ে-যাওয়া, যদি খনিতল থেকে কোনো প্রতীতির, কোনো অপরূপ উপলব্ধির উজ্জ্বলন্ত ধাতুপিণ্ড উঠে আসে। তা কি উঠে এসেছে, না কি আসেনি, তুলে আনা ইষ্টও ছিল না ব'লে অত কথা, কথার পর কথা, উপরিতলে বুদ্বুদের মতো বুড়বুড়ি কেটে মিলিয়ে গেল ! ঘটনা উপলক্ষ

হোক ক্ষতি নেই, প্রয়াসী লেখকের পার্থিব বা অলৌকিক কোনো-না-কোনো লক্ষ্য থাকে। ভূলোক থেকে বুদ্ধদেব উড্ডীন হয়েছিলেন স্বেচ্ছায়, অথচ দ্যুলোকে উত্তীর্ণ হননি, সেই কারণেই হয়তো দ্যুলোক ভূলোক এই দুই ভুবনের মাঝখানে দুলছেন, ঝাপটাচ্ছেন অস্থির অনিশ্চিত, অশান্ত ডানা। সন্দেহ হয়, একটি স্থিতি তিনি কোথাও পান না—আমরা কে-ই বা পাই—আজও রমনা তাঁকে পিছন থেকে টানে, পাশ্চাত্য সামনা থেকে দেয় হাতছানি, মাঝখানে আছে কলকাতা, একদা তাঁর চোখ-ধাঁধানো কলকাতা—বলা শক্ত রক্ষিত কে কার। এই প্রশ্নের উত্তর আমরা অনেকেই দিতে পারিনে, গর্ভফুল পড়েনি অথচ বিভূমিতে উৎক্ষিপ্ত আমাদের গলায় আর্ত বাচ্চাব চিৎকাব।

কিন্তু বুদ্ধদেবও ফিরে আসছেন, নেমে আসছেন নীচের নির্ভরযোগ্য মাটিতে, অথবা সন্তরণ—ক্লান্ত, ধীরে ধীরে চাইছেন ডাঙার দিকে। অবরোহণ আগেই আভাসিত ছিল, ধরা যাক 'কালো হাওয়া'য় অথবা 'তিথিডোর'-এ। বৃহৎ উপন্যাস কখনও কখনও আপনকালের দলিল হয়, তবেই সে বৃহত্ত্ব ছাড়িয়ে মহত্ত্বের মর্যাদা পায়, 'তিথিডোর তিরিশের শেষ আর চল্লিশের শুরুর কলকাতার পরিশীলিত একটি বিশেষ সমাজ-মানসের দলিল, যে-দলিল উই আর ইঁদুরের ব্যবহারে আজও জীর্ণ হয়নি। ইতিমধ্যে আমরা চ'লে এসেছি, 'পাতাল থেকে আলাপ' 'রাত ভ'রে বৃষ্টি' 'গোলাপ কেন কালো' এই নবতম পর্বে, যা নবতর উন্মোচনের অপেক্ষা রাখে। আরে কী আশ্চর্য, কাহিনীর আঁটো-সাটো বাঁধুনিও এগুলোতে পাচ্ছি, 'গোলাপ কেন কালো' তো ঘটনার বিন্যাসেও অতি পরিপাটি, আর 'পাতাল থেকে আলাপ'-এ নায়ককে তো প্রায় সনাক্তই করা যায়। একই সঙ্গেই আশা আর স্বস্তির কথা এই পর্বের উপন্যাসেও সেই আশ্চর্য কারুকৃতি, সেই প্রবাহ আর ভাষা এবং ভঙ্গি, যা তাঁরই নির্মাণ।

অতএব পালাবদল ঘটছে, সমকালের ছোপে তা কতটা রঙীন সেটা আদৌ বিচার্য নয়, বিচার্য অতিরিক্ত কী পেলাম। আঙ্গিকের চাতুর্য? ঠিক। সময়কে এই চাতুরী অলৌকিক সোনার জলে গুলিয়ে মিশিয়ে দেয়, টেরও পাই না কোন্ অনুচ্ছেদে কোন্‌কালে আছি। তবু সব ছাপিয়ে একটি অপেক্ষা থাকে, যেহেতু বুদ্ধদেব এখনও অনিঃশেষ। কথাকে শিল্প করেছেন যিনি, তিনি কথার মতো কথাকে শিল্পে আনুন না, এই প্রার্থনা। যদিও অনুমান করি, সাহিত্যকে কিছু বলতেই হবে এ-তত্ত্বে বুদ্ধদেব বিশ্বাস করেন না, লেখা তাঁর মতে হয়তো অনুকম্পিত, তবু প্রতীক্ষা করছি। কবে সব পরীক্ষার শেষে বুদ্ধদেবও তাঁর জানা কিছু-না-কিছু জানিয়ে দেবেন, বলবেন—'আমার কিছু কথা আছে।' সে-কথা পাঁচসালা যোজনামাঝে ভীম-

ঘোষণা নাই-বা হ'লো, হোক-না তা আমাদের দৈনন্দিন অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত, কিন্তু একটি তাৎপর্যে যেন হয় বিবৃত। এই চল্লিশ বছর ধরে—তাঁর লেখালেখির বয়স মোটামুটি তা-ই—কোনো-না-কোনো বিশ্বাসকে তো তিনি বাঁচিয়ে রেখেছেন! বুদ্ধদেব যদি অবশেষে মাত্র এই আপাততুচ্ছ কথাটাও উচ্চারণ করেন 'সে আমার প্রেম', আমরা সম্মত আছি।

ছিলে না বনের মৃগ

নরেশ গুহ

'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রথম যখন বেরোয়, ১৯৫৩ সালে, বুদ্ধদেব বসু সেই গ্রন্থের জন্য তখন একটি কবিতা নির্বাচন করেছিলেন যার নাম 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি'। কবিতাটি '২২শে শ্রাবণ' নামে একপয়সায় একটি সিরিজের এক পুস্তিকা থেকে নেওয়া, যেটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে কবিতাভবন থেকে ১৯৪২ সালে বেরিয়েছিলো। কবিতাটি রীতিমতো ভালো। কিন্তু 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র পরবর্তী সংস্করণ থেকে নিঃশব্দে কবিতাটি বাদ পড়েছে। অবশ্য একথা ঠিক যে পরের সংস্করণগুলিতে এই একটি কবিতাই শুধু নয়, ক্রমান্বয়ে বাদ পড়েছে আরো অনেক কবিতা, এবং যোগ হ'য়েছে অন্য নতুন রচনা। আপাতদৃষ্টিতে এর মধ্যে কোনো রহস্য না-থাকাই সম্ভব। কখনোই একথা বলা চলবে না যে ১৯৪২ সালের পর থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি বুদ্ধদেব বসুর ভক্তিভালোবাসার প্রগাঢ়তা কিছুমাত্র হ্রাস পেয়েছিলো, কেননা গদ্যে রবীন্দ্রনাথবিষয়ক শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি সবই এর পরে লেখা। তাছাড়া এই সময়ের পরে রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে তিনি যে কবিতা লেখেননি তাও নয়। 'রবীন্দ্রনাথ' নামে ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে লেখা একটি কবিতা এক্ষুণি মনে পড়ছে।

আসলে 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' বর্জন ক'রে বুদ্ধদেব নিজেই উপরোক্ত 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতাটি 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-র তৃতীয় সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এর থেকে অনুমান করা চলে যে স্থানাভাবের দরুণই একই বিষয়ের দুটি কবিতা নেওয়া হয়তো সম্ভব ছিলো না। সম্পাদক হিসেবে কবি স্বয়ং তাই সেই কবিতাটিকেই ত্যাগ করেছিলেন যেটি তাঁর মতে কম ভালো।

কমভালো কি সত্যি? এবং শুধুই কি সেই কারণে? নাকি ১৯৪২ সালের রচনাটিতে এমন কিছু ছিলো, এমন কোনো চিন্তা কিংবা মনোভাবের প্রকাশ, যা পঁচিশ বছর পরেকার কবি বুদ্ধদেব আর মানতে পারতেন না? কবিতা দুটি আলোচনা করে এ বিষয়ে দুকথা নিবেদন করতে চাই।

তোমারে স্মরণ করি আজ এই দারুণ দুর্দিনে
হে বন্ধু, হে প্রিয়তম। সভ্যতার শ্মশান-শয্যায়
সংক্রামিত মহামারী মানুষের মর্মে ও মজ্জায়;
প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই কবিতা যখন লেখা হয়েছিলো তার মাত্র একবছর আগে মৃত্যু হয়েছে রবীন্দ্রনাথের। চারদিকে মহাযুদ্ধের ঘনঘটা। পরাধীন ভারতবর্ষে নাগরিক—বিশেষত লেখকদের সেই যুদ্ধের সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিলো না বটে, কিন্তু ইয়োরোপে ফ্যাসিজমের অভ্যুত্থানে আমাদের নিস্তরঙ্গ ডোবার জলেও তরঙ্গ না জেগে পারেনি। ফ্যাসিবাদ বিরোধী সেই সব উন্মাদনাকারী দিনগুলোর কথা এতকাল পরে অনেকে হয়তো ভুলেই গেছেন। 'আধুনিক বাংলা কবিতা'-র প্রথম সংস্করণের যৌথ-সম্পাদক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'তরী থেকে তীর' নামক স্মৃতিচারণগ্রন্থে আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন : 'চীন, অ্যাবিসিনিয়া, স্পেন, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশকে নিয়ে ফ্যাশিজমের কদর্য কুকীর্তি আর তার পিছনে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ সমর্থন তখন আমাদের দেশের সর্ব্বস্তরে নতুন চেতনা উদ্রিক্ত করছিল, 'অভিজাত' পত্রিকা বলে বর্ণিত 'পরিচয়' ফ্যাশিষ্ট বিরোধী প্রচারে অগ্রণী ভূমিকায় নেমেছিল।' জগৎজুড়ে ফ্যাসিজম্‌কে রোধ করার লড়াইয়ে ভারতবর্ষকে (তাই) অনিবার্যভাবে জড়িয়ে পড়তে হল, আর ঐতিহাসিক এই বিবর্তনের ছায়া পড়ল আমাদের রচনারীতিতে, আমাদের সাহিত্যে, আমাদের জীবনে।' ছায়া, সত্যিই পড়েছিল, কেউই প্রায় নিরাসক্ত এবং উদাসীন থাকতে পারেন নি। আধুনিক এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কারো পক্ষেই জড়িয়ে না পড়ে উপায় ছিল না। কোনো না কোনোভাবে প্রতিবোধে উদ্যত হয়ে উঠেছিলেন প্রত্যেকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রগতি লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। মোহিতলাল মজুমদার এবং বনফুল ছাড়া, আবার 'তরী থেকে তীর' উল্লেখ করি, 'অপর সকলে যে একে সর্বথা স্বাগত জানিয়েছিলেন তা নয়, কিন্তু পূর্ণ প্রত্যাখ্যান কখনো করেননি, মাঝে মাঝে সখাবন্ধনে নিজেদের বাঁধতেও কুণ্ঠিত হননি।…কবি বিষ্ণু দে-কে বন্ধু ও সহায়ক-রূপে পাওয়া গিয়েছিল—এবং কতকটা সেইজন্যেই বিনাক্লেশে বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, একটু পরে সমর সেন, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিরও আনুকূল্য মিলেছিল। বুদ্ধদেব বসু যে কখনো প্রগতি লেখক সংঘের কর্মে-যুক্ত হয়েছিলেন একথা অনেকের কাছে আশ্চর্য মনে হবে, কেননা আশৈশব এক 'পলাতক' কবি হিসাবেই তাঁকে অনেকেই চিহ্নিত করে ফেলেছেন অনেকদিন আগে। তাঁদের মনে করিয়ে দিতে হয় যে ১৯৩৮ সালে কলকাতার আশুতোষ হলে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের যখন সম্মেলন হয়, তার সভাপতি মণ্ডলীতে মুলক্‌রাজ আনন্দ এবং পণ্ডিত সুদর্শন ছাড়া, বাঙালী কবিদের মধ্যে ছিলেন সুধীন্দ্র নাথ দত্ত এবং বুদ্ধদেব বসু।

প্রগতি উপলক্ষে এই মিলনোৎসবের একটি প্রত্যক্ষ ফল 'আধুনিক বাংলা

কবিতা' প্রকাশের পরিকল্পনা। লেখক সম্মেলন শেষ হওয়ার আগেই এটি স্থির হয়। সংকলনের প্রকাশক ছিলেন 'কবিতা ভবন,' সম্পাদক ছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। আর 'কবিতা' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল : 'আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম ও প্রামাণ্য সংকলনগ্রন্থ। এই গ্রন্থে অন্তর্গত কবির সংখ্যা ৩০, কবিতার সংখ্যা শতাধিক, তাছাড়া দুটি মূল্যবান ভূমিকা সম্বলিত। শিক্ষিত গৃহ ও পাব্লিক লাইব্রেরির লোভনীয় সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু ক'রে বাংলার তরুণতম কবিকে এখানে এক সঙ্গে পাবেন।'

মূল্যবান ভূমিকাদ্বয়ের একটির লেখক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বিজ্ঞাপনটি লিখেছিলেন, খুব সম্ভব, বুদ্ধদেব বসু।

বুদ্ধদেব বসু কদাপি মার্কসপন্থী হয়েছিলেন ব'লে জানি না, কিন্তু প্রগতিলেখক সংঘের সঙ্গে মোটামুটি ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত ছিলেন, অন্তত প্রথম দিকে। এটা শুধু সামাজিকতা কিংবা বন্ধুত্বের খাতিরে ব'লে মনে হয় না; তখনকার রচিত কবিতাবলীতেও এই তৎকালীন মানসিক পরিমণ্ডলের অনিবার্য ছাপ পড়েছিল। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটিই ধরা যাক। শব্দচয়নে রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি খুব অস্পষ্ট না, কিন্তু ভাবনাচিন্তার দিক থেকে বেশ প্রগতিশীল, যদিও মূল চিত্রকল্পটি এসেছে, ঈষৎ পরিবর্তিতভাবে, রামায়ণ, হয়তো বা রবীন্দ্রনাথ থেকে। জীবনের সোনার হরিণ উন্মত্ত জন্তুর মুখে, দেশে-দেশে সমুদ্রের তীরে তীরে থরোথরো কাঁপছে, লুব্ধতার লালা ঝরছে এমন কি ভারতের স্নিগ্ধ উপকূল। উন্মত্ত জন্তুটি অবশ্যই ফ্যাশিজম। চতুর্দিকে এত দুঃখ, এত দুঃসহ ঘৃণা, এত নরক—কবি যে এখনো সহ্য করতে পারছেন তা,—কবিতাটি থেকে জানতে পারি—শুধু রবীন্দ্রনাথের অক্ষয়-মন্ত্র তাঁর রক্তে লিপ্ত হ'য়েছে বলে, গূঢ় মর্মমূলে বিদ্ধ হ'য়েছে ব'লে। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে এত কবিতার তাই অন্তিম ঘোষণা :

অন্তরে লভেছি তব বাণী
তাই তো মানি না ভয়, জীবনেরই জয় হবে, জানি।

এই উচ্চারণ সম্পূর্ণই প্রগতিবাদী ব্যাকরণ সম্মত। কবিকে সরাসরি 'জীবনের জয় হবে, বলে স্বাস্থ্যকর ঘোষণা করতে হবে এই ছিলো তখনকার সর্বাধুনিক নান্দনিক মনোভাব। কবির কাজ হ'ল মানবজীবন এবং মানব সমাজের প্রগতিতে ঘোরতর আস্থার বাণী ঘনঘন অন্যদের মনে করিয়ে দেওয়া, যাতে তারা হতাশায় ভেঙে না পড়েন অথবা উদাসীন হ'য়ে কূর্ম-বৃত্তি অবলম্বন না করেন। রূপদক্ষ কারিগরদের প্রশংসাযোগ্য একমাত্র করণীয় হ'লো উদার স্বাধীন নিঃশঙ্কভাবী সমাজ গড়ার কাজে আশা ভরসা জুগিয়ে যাওয়া। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি পড়লে

সন্দেহ থাকে না যে এই কবিতাটির পিছনেও এই একই মনোভাব মোটামুটি কাজ করছে। প্রগতিশীলতার এটা একটা চমৎকার রোমান্টিক প্রকরণ। শেলীর মতো কবিকে অনায়াসে এই ছকে ফেলে দেওয়া যায়, যদিও কীট্স্-কে নিয়ে মুশকিল আর রবীন্দ্রনাথ এতোই বৃহৎ-যে তাঁর মধ্যেও এই ধরণের বাণী আবিষ্কার অসাধ্য হবে না, পড়তে হবে।

যে কোনো কবিই তাঁর সমসাময়িক চিত্তবৃত্তির অনেকটা পরিমাণে শিকার হ'তে বাধ্য। বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রেও তাই হ'য়েছিল, '২২শে শ্রাবণ' পুস্তিকাটি এবং অন্যান্য আরো কিছু কবিতা তার নিদর্শন। বুদ্ধদেব বসুর পক্ষে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে তিনি বেশিদিন এই প্রগতির শিবিরে আটকা থাকেন নি, তা থেকে অপর কোনো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে তিনি পা বাড়িয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে প্রায় সর্বস্ব পণ ক'রে কী পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়েছিলো তা কখনো তাঁর যথাযথ জীবনী লেখা হলে জানা যাবে। মজার কথা এই যে প্রগতির পক্ষ থেকে '২২শে শ্রাবণে' তিনি যে রবীন্দ্রনাথের জয়ধ্বনি করেছিলেন, প্রগতির শিবির ছাড়ার পরে তাঁকে সেই রবীন্দ্রনাথেরই অনুকারী বলে ধিক্কার দিয়েছিলেন তাঁর সুহৃদবর্গ।

'রূপান্তরে' যার সূচনা হয়েছিলো, ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত 'যে আঁধার আলোর অধিকে' এসে তাঁর একটা সুপরিণত রূপ দেখা গেলো—আমাদের আলোচ্য 'রবীন্দ্রনাথ' নামে অন্য কবিতাটি যে বই থেকে নেওয়া। কবি এবং কবিতার প্রতি প্রত্যাশার চেহারা ততদিনে একেবারেই ভিন্ন হ'য়ে গেছে। প্রকৃতির সুরে সুর মিলিয়ে কবি হন কবি, আর সভ্যতার অবক্ষয়কে রোধ করতে পারে কবিতা এ-ধরণের আপ্তবাক্যে ততদিনে আর তিনি আস্থা রাখছেন না। কবিতা যেখান থেকে যাত্রা করে সেটা প্রকৃতি হ'তে পারে, কিন্তু যেখানে পৌঁছয় সেটা প্রকৃতি থেকে বহুদূরে। শুধু যে বোদলেয়ারের মধ্যে এই ভাবনার সমর্থন পেয়েছিলো তা নয়, রবীন্দ্রনাথকেও সেই চোখেই দেখছেন তখন বুদ্ধদেব। রবীন্দ্রনাথের যে-প্রতিকৃতি লোকপ্রসিদ্ধি লাভ করেছে—যে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা অর্জন করতে পেরেছিলেন বলেই হ'তে পেরেছিলেন মহাকবি,—১৯৫৫ সালে লেখা 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় সে-ধারণা বুদ্ধদেব সম্পূর্ণ খারিজ করে দেন। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে এ-কবিতা আমাদের বলে—সব মৌলিক বিষয়েই আর দশজন মানুষের মতোই মানুষ ছিলেন তিনি, ছিলেন না প্রকৃতির দুলাল। এমন কি বাল্যকালেও সতর্ক দৃষ্টির পাহারা এড়িয়ে নিজেকে সমর্পণ করতে পারেননি প্রকৃতির কোলে :

ছিলে না বনের মৃগ, ঘাস, ফুল, মেঘের গহ্বরে রঙিন আলোর খেলা।
এমন কি বালক ছিলে না। তীক্ষ্ণ চোখ ঘিরেছিলো সারাদিন।

অর্থাৎ তিনিও ছিলেন আর দশজন মানুষের মতো প্রকৃতির স্বর্গ থেকে আশৈশব বিচ্যুত, যে-অবস্থা থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় অনলস পরিশ্রমে অন্য কিছু গ'ড়ে তোলা যা নয় প্রকৃতির হাত থেকে প্রেরিত কোনো উপহার। মহাকবি হ'তে হ'লে অবশ্য তাই নয় শুধু, আরো বেশি কিছু ক্ষমতা আবশ্যক : উপার্জিত ফল থেকে পরিশ্রমী উপার্জনের সমস্ত চিহ্নকে লোপ করতে পারার সিদ্ধিও সেই সঙ্গে অর্জন করা চাই, যা অসামান্যভাবে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মনেই হয়না কবিতার জন্য তাঁকে কোনো চেষ্টা করতে হয়েছে কখনো, যেন অখণ্ড অবসরের সরোবরে পদ্মের মতো আপনিই এক-একটি কবিতা ফুটে উঠেছিলো তাঁর জীবনে :

ছিলে প্রতিযোগিতার
পরপারে, বিশ্রামে শুভ্রতাময়, যেন তুমি কখনো করোনি চেষ্টা,

যা থেকে অসতর্ক মুহূর্তে আমাদের মনে হতে পারে জলের মধ্যে জল হ'য়ে মিশে গিয়েছিলেন তিনি, ঘড়ায় তুলে ঘরে আনার মতো শিল্পিত প্রয়াস যেন করতে হয়নি তাঁকে। 'যে আঁধার আলোর অধিকে'-র কবির তাই মনে হয়, মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ বিষয়ে আশার বাণী রবীন্দ্রনাথ শুনিয়েছেন কি শোনাননি সেটাই তাঁর বড়ো পরিচয় নয়। কবি রবীন্দ্রনাথ নিরিবিলিতে আরো অন্য কথা বলেছেন তাঁর কবিতায় যার অনুরণন কখনো থামবে না। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন থেকে একালের কবি কবিতার স্বরূপ বিষয়ে আরো গূঢ় গভীর কোনো সংকেত পান, অমূল্য যার অভিঘাত :

যা পেয়েছি দু-দণ্ড তোমার কাছে, নিঃশব্দে, কেবল
সন্ধ্যার নিবিড়তায় ব'সে থেকে, আজ তাকে নিঘুম যামিনী
জেলে দেয় কূট গ্রন্থে, ভাবনার পাণ্ডুর অনলে,
বাক্, অর্থ, সম্পর্কের হিংসুক দাঙ্গা শেষ হ'লে।

মানুষ কোনো এক যুগে হয়তো প্রকৃতির অঙ্গমাত্র ছিল। সেই অলৌকিক সুষমার দিন বহুকাল বিগত হয়েছে। মানুষকে এখনো সত্যিকারের অর্থে বাঁচতে হলে, 'যথেষ্ট কবি, হ'তে হ'লে, অবলম্বন করতে হয় ভিন্ন পথ, শিল্প ক'রে তুলতে তাকে যা শিল্প নয়,— রবীন্দ্রনাথ যা করেছিলেন। কবিতা বিষয়ে এ ধরণের কবিতা লেখার পরে বুদ্ধদেব বসু তাই 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটিকে আর স্বীকার করতে পারছিলেন না। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র পরবর্তী সংস্করণে কবিতাটি বাদ পড়ার এটাই বোধ করি প্রধান কারণ।

বলাবাহুল্য, একে কেউ বলবেন 'পলায়ন,' জীবন থেকে, কেউ বলবেন 'কলা-কৈবল্যবাদ' কিংবা আর কিছু। কিন্তু কবিতা তো তর্কের আসর নয়, হ'য়ে উঠতে

পারলে তা যা বলে তাই ঘটায় আমাদের মনে। জীবনের শেষ কুড়ি বছরে বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় কবি এবং কবিতা বিষয়ের ধারণাতে এই ধরণের একটি গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিয়েছিলো যা সাধারণ বাঙালি মানসতার পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন। প্রধানত এই জন্যই, বুদ্ধদেব বসু যে মূলত কবি, নিছক নাটক-উপন্যাস, এমন কি অপহরণযোগ্য চিন্তা সমন্বিত প্রবন্ধাবলীর লেখকমাত্র নন, এ-কথা ভেবে অনেকেই আজ পর্যন্ত নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আগে-পরে রচিত কবিতা দুটি ভালো করে পড়ে দেখলেও এই অস্বস্তির কারণ স্পষ্ট হবে মনে হয়।

বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ

অরুণকুমার সরকার

ভাবতে অবাক লাগে যে বুদ্ধদেব বসুও ষাট বছরে পা দিচ্ছেন।* ভাবতে অবাক লাগে এই জন্যে যে আজ পর্যন্ত তাঁর রচনায় বার্ধক্যের ক্ষীণতম ছায়াটুকুও অনুপস্থিত,—না তাঁর কবিতায়, না তাঁর প্রবন্ধে। জীবন ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ যে-কোনো উদ্ভিন্ন যুবকের মতোই প্রগাঢ় এবং আত্যন্তিক। অথচ এই তো আশীর্বাণী বিতরণের সময়, সাবধানী হিতোপদেশ মুখর হবার অবকাশ, অথবা শিরোপা মাথায় দিয়ে সম্রাট হ'য়ে বসার। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু চিরকাল যুবকদের সঙ্গে-সঙ্গেই রইলেন, কিছু গম্ভীর দূরত্ব বজায় রেখে নয়, প্রায় তাদের কাঁধে হাত রেখে, পাশে-পাশে। এর ফল তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে বৈকি। অকালবৃদ্ধেরা তাঁর মানসিক বয়োপ্রাপ্তিতে সন্দেহ ক'রে যতটা দূরে সরে গেছেন, তরুণেরা ঠিক ততটাই তাঁর কাছে এগিয়ে এসেছে। আশ্চর্যের কিছু নয় যে বিশ বছর আগে তদানীন্তন তরুণদের মনেও বুদ্ধদেব একই আকর্ষণী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

তাহ'লে কি এ-কথাই মেনে নেব যে বুদ্ধদেব বসুর কোনোই পরিবর্তন হচ্ছে না বা হয়নি, একই কেন্দ্রবিন্দুতে অবিরত ঘুরপাক খাচ্ছেন তিনি? না, ঠিক তার উল্টোটাই বরং সত্য। অতুলনীয় এক সজীব, চলমান, গ্রাহী মনের অধিকারী ব'লেই বুদ্ধদেব বসুর পক্ষে সম্ভব হয়েছে, কোনো কৃত্রিমতার আশ্রয় না-নিয়েও, তারুণ্য বজায় রাখা। কোনো মতামতকেই তিনি আঁকড়ে ধ'রে থাকেননি, চূড়ান্ত ব'লে স্বীকার করেননি কোনো ভাবাদর্শকে। স্বদেশে-বিদেশে সাহিত্য এবং চিন্তাক্ষেত্রে গত তিরিশ বছরে যত তরঙ্গ উঠেছে সবকটাই তাঁর মনের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, সমুদ্রস্নানের আনন্দ পুরোপুরিই তিনি উপভোগ করেছেন, যদিও কোনো সময়েই নিজেকে ভেসে যেতে দেননি। ভেসে যাওয়ার প্রয়োজনও হয়নি। প্রাথমিক মানবিক মূল্যবোধগুলিতে বরাবরই তাঁর হৃদয়-মন বাঁধা রয়েছে, তদুপরি রয়েছে তাঁর অতন্দ্র শিল্পীসত্তা। তাই কোনো ছাপমারা মতবাদের ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় না-নিলেও জগদ্‌ব্যাপারে বুদ্ধদেবের দৃষ্টিভঙ্গি যে খুবই পরিচ্ছন্ন, তৎপর এবং নিজস্ব তা একজন অলস পাঠকেরও নজর এড়ায় না। ফলত, তাঁর যে-কোনো রচনায় একটি সংস্কারমুক্ত, মানবতাবোধে প্রাজ্ঞ, নিটোল, সজীব, আধুনিক মনের পরিচয় পাই আমরা। কোথায় এর উৎস?

বুঝতে কষ্ট হয় না যে বুদ্ধদেবের যাবতীয় জ্ঞান, এমন কি সংসারবুদ্ধি, সাহিত্য থেকেই উপার্জিত, দর্শন-বিজ্ঞান-সমাজতত্ত্বের মোটা মোটা কেতাব থেকে নয়, পৃথিবী জোড়া। গল্প-উপন্যাস-কাব্যের অফুরন্ত রসভাণ্ডার থেকে। সাহিত্য থেকে সংগৃহীত ব'লেই আমার মনে হয়, তাঁর ধারণাগুলো এমন পার্থিব, মানবিক, সরস এবং প্রাণময়। এবং ব্যক্তিগত।

এক হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর সব প্রবন্ধই ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। কিন্তু এই আপাত-দুর্বলতাই তাঁর শক্তির উৎস, তার রচনার প্রধানতম আকর্ষণ। এক হাতে তথ্যের গুরুভার তথা বিভিন্ন মতবাদের ঝুলি এবং অন্য হাতে যুক্তির লণ্ঠন তথা বিশ্লেষণের দাঁড়িপাল্লা ঝুলিয়ে গ্রহণ-বর্জনের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে একটা গ্রাহ্য পরিণতির দিকে পৌঁছনোই যে-কোনো প্রাবন্ধিকের লক্ষ্য। বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। পাহাড়ে ওঠার সময়ও তিনি পোশাক পাল্টাতে রাজি নন। চিন্তার রাজ্যে তাঁর পথ-চলা এমনই অনায়াস যে মনে হয় তিনি ঢিলে পাঞ্জাবি গায়ে নিজের আনন্দে শিস দিতে-দিতে চলেছেন।

প্রতারক এই চলনভঙ্গি। কেননা, একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, প্রাবন্ধিকের কাছে যা কিছু কাম্য,—প্রাসাঙ্গক খবরাখবর, বিশ্লেষণ, মনন এবং সংশ্লেষণ, সবই তার রচনায় উপস্থিত। কিন্তু ছদ্মবেশে, নিখুঁত মুখোশ এঁটে। মনে করুন তাঁর সেই বিখ্যাত প্রবন্ধ দু-টি : "নোয়াখালি" এবং "এক গ্রীষ্মে দুই কবি"। শেষোক্ত রচনাটি শার্ল বোদলেয়ার ও ফিয়ডর ডস্টয়েভস্কিকে নিয়ে একটি তুলনামূলক আলোচনা। বিষয়বস্তুটা নিঃসন্দেহেই দুরূহ এবং গুরুগম্ভীর। তথাপি বুদ্ধদেবের রচনা শুরু হয়েছে আমাদের এই কলকাতা শহরের নিষ্ঠুর গ্রীষ্মের এমন একটি করুণমধুর এবং নেহাৎ ব্যক্তিগত বর্ণনা দিয়ে যা কিনা অনায়াসেই কোনো ছোটো গল্পের উপক্রমণিকা হ'তে পারত। কিন্তু অনতিবিলম্বেই চুপিসারে লেখকের সঙ্গে-সঙ্গে কখন যে আমরা তামাম ইউরোপীয় সাহিত্যের আবহাওয়ায় দু-দু-জন দিক্‌পাল সাহিত্যিকের অন্দরমহলে উপনীত হয়েছি, নিজেরাই ঠাহর করতে পারি না। রচনার শেষ অক্ষরটি থেকে চোখ তুলেই অনুভব করি এক রহস্যময় উপন্যাসের জগৎ থেকে ঘুরে আসা গেল, পরক্ষণেই বুঝতে পারি বোদলেয়ার এবং ডস্টয়েভস্কি সম্বন্ধে অনেক নির্ভুল তথ্যও আমাদের শেখা হ'য়ে গিয়েছে। আর ঠিক তখনই তারিফ করি প্রাথমিক ভূমিকাটুকুর যাথার্থকে, যেটাকে ছোটোগল্পের ভূমিকা বলে মনে হয়েছিল। নিদারুণ গ্রীষ্মের দহনজ্বালায় শারীরিক মানসিক যন্ত্রণা ও ক্লেশের মধ্যেই তো বোদলেয়ার ডস্টয়েভস্কির স্ফূর্তি।

এমনিতর আর একটি রচনা "নোয়াখালি"। প্রবন্ধটিতে গান্ধীজীর বাণী ও

ব্যক্তিত্ব নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে, এতই নিপুণভাবে যে গান্ধী-দর্শনের অনেক গ্রন্থেই হয়তো তা পাওয়া যাবে না। অথচ সমস্ত রচনাটি জুড়ে, আক্ষরিক অর্থেই সমস্ত রচনাটি জুড়ে, লেখকের শৈশবস্মৃতিমন্থন আর অপরূপ নিসর্গবর্ণনা। বুদ্ধদেব জানেন আলোচ্য বস্তুকে যথোচিত পটভূমিতে স্থাপন করতে পারলে ছবির মতোই তা প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে। প্রত্যক্ষ এবং তর্কাতীত। প্রাবন্ধিকদের মধ্যে, আমার মনে হয়, একমাত্র বুদ্ধদেবেরই আছে এই আবহসৃষ্টির ক্ষমতা, যা ছিল রবীন্দ্রনাথের।

বুদ্ধদেব বসুর গদ্য রচনার একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল রবীন্দ্রচর্চার ফসলে পরিব্যাপ্ত। এই বিচিত্র নয়নাভিরাম উদ্যানে মালি ও মালাকে পৃথক ক'রে দেখা শক্ত, এখানে রবীন্দ্রনাথকে যতটা পাচ্ছি, বুদ্ধদেবকেও ততটা। লক্ষ্য করবার বিষয় রবীন্দ্রনাথের মতামত নিয়ে বুদ্ধদেব অল্পই মাথা ঘামিয়েছেন। একজন কারিগর সমধর্মী অন্য কারিগরের শিল্পকর্মকে যে-ভাবে দেখে থাকে, একান্ত কাছ থেকে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, কারখানার উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে, বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র-দর্শন অনেকটাই সে-রকম। নামকরণে বা জাতি-বর্ণ-নির্ণয়ে তাঁর আগ্রহ নেই, রূপ-রস-গন্ধ-ছন্দ নিয়ে যে-ফুলটি ফুটে উঠেছে, তাঁর দৃষ্টি সেই সমগ্রতায় একাগ্র।

এ-দৃষ্টি কবির। ফলত, সমগ্র রবীন্দ্র রচনাবলিকে বুদ্ধদেব একটি অখণ্ড কবিতা হিসেবে পাঠ করেছেন। এবং কাব্যবিচারে যে-পদ্ধতি অনুসৃত হ'য়ে থাকে অথবা হওয়া উচিত, সেই পথেই আবিষ্কার করেছেন রবীন্দ্র-রূপকর্মের রহস্য। হাজারদুয়ারি রবীন্দ্র-সাহিত্যে নানা দিক থেকে প্রবেশ করা সম্ভব। এতাবৎ বিশেষ কোনো-একটি দিকের অংশবিশেষ নিয়ে আলোচনা করাই প্রবন্ধকাররা নিরাপদ বলে মনে ক'রে এসেছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব বিশ্বাস করেন, একটিমাত্র দিক আছে, একটিমাত্রই, যে-দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণভাবে দেখা যায়। সে-দিকটি রূপকর্মের দিক, নিছক শিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ক্রমপরিণতির দিক। বুদ্ধদেবের রবীন্দ্রবিচার এইদিক থেকেই।

তাই অপরাপর সমালোচক যখন রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মচিন্তার ফলশ্রুতি নিয়ে গলদঘর্ম, বুদ্ধদেব তখন চুপি-চুপি আমাদের অন্যদিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেন 'গল্পগুচ্ছ'-এ মিতভাষণের কী অপূর্ব দৃষ্টান্ত রয়েছে, তুলে ধরেন চিত্রময়ী এক বর্ণনা অথবা অনায়াসেই শিশুর মতো লাফিয়ে উঠতে পারেন : ছাখো, ছাখো কি অবাক-করা 'সহজ-পাঠ'-এর এই মিল—'ছোটো খোকা বলে অ-আ/শেখেনি সে কথা কওয়া।'

স্বভাবতই, উপমা-অনুপ্রাস, বিশেষণ-অলংকরণ, ছবি-ভাবর্চার এবং বর্ণনা-শিল্পের বিভিন্ন দিক থেকেই বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের গদ্য, ছোটোগল্প এবং উপন্যাসের

আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভা বিকাশের দেশ-কাল সম্বন্ধে সর্বদাই অবহিত রয়েছেন অথচ তার উপর অনাবশ্যক গুরুত্ব না-দিয়ে কবিতা খুঁজে বেড়াচ্ছেন সবত্র। এবং পাচ্ছেনও; পাচ্ছেন দুরূহতম স্থানেও। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের গদ্য সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের একটি মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য :

> আরো আশ্চর্য এই যে তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) এই কিন্নরকণ্ঠ আমরা সেখানেও শুনতে পাই যেখানে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক; বরং সেখানেই যেন নির্ভুলভাবে শুনতে পাই, তাঁর ছন্দ ও শব্দতত্ত্বের আলোচনা শুধু আমাদের বুদ্ধির কাছে বার্তা পাঠায় না, আমাদের সমগ্র সত্তাকে পুলকিত ক'রে তোলে। হয়ত কোনো মীমাংসার তীরে তিনি উত্তীর্ণ করেন না আমাদের, কোনো তৈরি সত্য কখনোই হাতে তুলে দেন না; কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে একটি বেগ সঞ্চার করেন, যার ফলে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে আমাদের নিজেদের ভ্রষ্ট স্মৃতি, স্বপ্নের ভগ্নাংশ, চিন্তার রশ্মি, হ'তো ইন্দ্রিয়ের কোনো নূতন শিহরণ। ('প্রবন্ধ-সংকলন' : ৩২-৩৩ পৃঃ)

পরিবর্জন তো নয়ই, বরং ঈষৎ পরিবর্ধন করে উদ্ধৃত কথাগুলিই বুদ্ধদেবের প্রবন্ধ সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বুদ্ধদেবের প্রবন্ধও ইঙ্গিত-ধর্মী, তাঁর রচনাও মূলত কবিতার সম্প্রসারণ, শব্দের সুচারু বয়ন। কিন্তু তুলনায়, দ্বিধা না-ক'রেই বলব, বুদ্ধদেবের গদ্য, বিশেষত তাঁর সম্প্রতিকালের গদ্য, ঢের বেশি সংযত, ঘনসংবদ্ধ এবং নির্মমভাবেই আত্মসচেতন। তাছাড়া এটা-ও লক্ষণীয় যে রচনার ন্যায়শাস্ত্রকে বুদ্ধদেব কোনো অবস্থাতেই অস্বীকার করেন না এবং প্রচ্ছন্নভাবে হ'লেও, তথ্যের পারম্পর্যকে যথোপযুক্ত মূল্য দিয়ে থাকেন।

রবীন্দ্র-সাহিত্য বিশ্লেষণে প্রযুক্ত সেই একই পদ্ধতিতে বুদ্ধদেব সমকালীন কবিতারও বিচার করেছেন। বিচার না-ব'লে উপভোগ বলাই হয়তো সংগত। কেননা, প্রচলিত অর্থে যাকে বিচার বলে, সে-রকম কিছু ঘর্মাক্তকলেবর রচনা বুদ্ধদেবের একেবারেই নয়। ফলত তাঁর রচনা সাহিত্যপাঠজনিত আনন্দেরই প্রকাশ। আর তাঁর কৃতিত্ব এইখানে যে নিজের আনন্দকে তিনি পাঠকের মনেও সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। পেরেছেন তাঁর অপরূপ বাগ্‌বিন্যাস-প্রণালীর জন্যেও বটে, আবার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিটুকুর জন্যেও। তাই জীবনানন্দের গভীরতা, সুধীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞা কি অমিয় চক্রবর্তীর বৈরাগ্যকে ব্যাখ্যা করার জন্যে বুদ্ধদেব ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন না, তাঁদের ব্যবহৃত শব্দ, মিল বা ভাবচ্ছবি থেকে হঠাৎ-হঠাৎ এমন অনেক হীরকখণ্ড আবিষ্কার করেন যা পাঠকের চোখেও মায়াবী আলোর ছোঁয়া লাগায়।

যে কোন অভিজ্ঞতাকে পছন্দসই একটা তাত্ত্বিক ছকের মধ্যে ফেলতে না-পারলে বুদ্ধিজীবীরা অস্বস্তি বোধ করেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের কাছে অভিজ্ঞতাটাই মূল্যবান এবং শুধুমাত্র সেই অভিজ্ঞতাটুকুই যা তিনি পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্তিতায় অনুভব করতে পারেন অর্থাৎ তত্ত্বের যে-টুকু অংশ মানুষের জীবনে ফলিত এবং প্রকট, তাঁর উৎসাহ সেখানেই সীমাবদ্ধ। বিমূর্ত তত্ত্বকথায় তাঁর কোনো আসক্তি আছে ব'লে মনে হয় না। তাই বুদ্ধদেবের প্রবন্ধে কোনো সুদূর দার্শনিক তাঁর কূটজিজ্ঞাসার জালে নিজেকে ক্রমাগত ঢেকে রাখার চেষ্টা করেন না, সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ একজন মানুষ সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো নিয়ে সশরীরে হাজির হয়।

তত্রাচ যাঁরা কোনো শিল্পীর ক্রিয়াকর্মকে নির্দিষ্ট সংজ্ঞার মধ্যে ফেলতে না পারলে চিত্তে সুখ পান না, তাঁরা অবশ্যই বুদ্ধদেব সম্বন্ধে দু-টি বিশেষণ প্রয়োগ করতে উৎসুক হবেন : এক, তিনি রোমান্টিক ; দুই, তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। এ-ক্ষেত্রে দু-টি বিশেষণই যে যথোপযুক্ত বুদ্ধদেবের প্রবন্ধাবলিতে তার ভূরি-ভূরি সমর্থন পাওয়া যাবে। নিজের স্বীকৃতি অনুযায়ী তিনি দুর্মরভাবেই রোমান্টিক। আর তারই নাম রোমান্টিকতা, বুদ্ধদেব লিখছেন,

> যা ব্যক্তি-মানুষকে মুক্তি দান করে স্বীকার করে নেয়—শুধু ইস্ত্রি-করা এটিকেট-মানা সামাজিক জীবটিকে নয়, নির্ভয়ে মানুষের অবিকল ও সমগ্র ব্যক্তিত্বকে ; তার মধ্যে যা-কিছু অযৌক্তিক বা যুক্তির অতীত, অনিশ্চিত, অবৈধ, অন্ধকার ও রহস্যময়, যা-কিছু গোপন, পাপোন্মুখ ও অকথ্য, যা-কিছু গোপন, ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয়—সেই বিশাল ও স্বতো-বিরোধময় বিস্ময়ের সামনে, সন্দেহ নেই, মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তির নামই রোমান্টিকতা।
>
> ('প্রবন্ধ-সংকলন' : ২১৪-২১৫ পৃঃ)

বুদ্ধদেব বসুর সুঠাম, কাব্যরসাপ্লুত, সাবলীল গদ্যের অন্যতম উদাহরণ হিসেবেই নয়, রোমান্টিকতার এই সংজ্ঞা, বলা বাহুল্য আধুনিক সাহিত্যেরও সংজ্ঞা। দোষে-গুণে গোটা মানুষটাকে পাওয়াই যার অভিলাষ কোনো খণ্ডসত্যকেই তিনি মেনে নিতে পারেন না। বুদ্ধদেবের জীবনবীক্ষার মূলসূত্র এখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে। এখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর সাম্প্রতিক নাটক-উপন্যাসের নিহিতার্থ।

যিনি বিশ্বাস করেন 'মানুষের পক্ষে ভালো হওয়া সম্ভব শুধু একলা হ'লে, শিল্পী হিসেবে তিনি সত্য কথাই বলেন। তবুও, যাঁরা বুদ্ধদেবের সঙ্গে একমত হবেন না, সব মানুষ এক মতাবলম্বী হ'লে পৃথিবী তো বসবাসের অযোগ্য হ'য়ে উঠত, তাঁরাও যদি শিল্পকর্ম মনে করে তাঁর প্রবন্ধাবলির পাতা ওল্টান, দেখতে পাবেন কেমন ক'রে একটি কূলপ্লাবী নদী ধীরে-ধীরে পরিণত হয়েছে হ্রদে।

দেখতে পাবেন বুদ্ধদেব বসুর মৌল মেজাজ—তাঁর তারুণ্য, তাঁর ঔৎসুক্য, উৎসাহ, কৌতূহল, আনন্দবোধ,—এক কথায় তাঁর চিন্তার উদ্যম যথাপূর্ব র'য়ে গেছে।

---

*রচনাটি বুদ্ধদেব বসুর জীবিতকালে তাঁর ষাট বছর স্পর্শ করার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে লিখিত, শ্রদ্ধেয় কবি অরুণকুমার সরকারের লেখার সূচনা থেকেই তার আভাস আমরা পাই।

ছন্দের বারান্দা

শঙ্খ ঘোষ

আর আমি আজ বন্দী হয়েছি ছন্দোবন্ধনে : দ্রৌপদীর শাড়ি

'আপনার পদ্যের বিরুদ্ধে আমার একটা ছোট নালিশ এই যে তাতে গদ্যের প্রভাব অল্প' এ-কথা যখন বুদ্ধদেবকে লেখেন সুধীন্দ্রনাথ, 'ছোট' শব্দটি হয়তো তিনি সৌজন্যবশেই ব্যবহার করেছিলেন। আধুনিক ছন্দের কাঠামোয় যাঁরা চেয়েছিলেন গদ্যপদ্যের বিরোধভঞ্জন, তাঁদের পক্ষে এ-নালিশকে নিতান্ত তুচ্ছ গণ্য করা স্বাভাবিক ছিলো না। রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিতার ছন্দচর্চায় জরুরি সেই সেতুটিকে একেবারেই কি গ্রাহ্য করেননি বুদ্ধদেব বসু? মনে রাখা চাই যে সুধীন্দ্রনাথের আপত্তি উঠেছিলো কবিতার শব্দ বিষয়ে 'গদ্যপদ্যের প্রভেদ ঘোচাতে চাই ভাষার দিক থেকে—উভয় প্রকরণে শব্দ ও বাক্যবন্ধ একরকম রেখে' এই ছিলো তাঁর ঘোষণা এবং স্পষ্টতই তিনি জানিয়ে দেন যে ছন্দোলিপিতে শৈথিল্য তাঁর একেবারেই অনভিপ্রেত। তাহলে ছন্দোলিপির পূর্ণ প্রথানুসরণই কি অভিপ্রেত? তার দ্বারাই পাওয়া যাবে মুক্তির পথ? তাহলে কি 'দময়ন্তী'র শব্দবিষয়ক ইস্তাহারের পরেই সংগত হ'তো এই অভিযোগের প্রত্যাহার? কিন্তু 'দময়ন্তী'তেই গদ্যের রীতি নিখুঁত ব'লে সুধীন্দ্রনাথ অন্তত ভাবেননি।১

তার একটা কারণ এই হ'তে পারে যে বাক্‌ছন্দ বিষয়ে ছ-টি অনুশাসন স্থির ক'রে নিলেও ও-বইতে সে-বিধির সম্পূর্ণ অনুসরণ দেখা দেয়নি, হয়তো তার প্রয়োজনও ঘটেনি সর্বত্র। যে-দু-চারটি ব্যতিক্রমের উদাহরণ বুদ্ধদেব নিজেই উল্লেখ করেন তার বাইরেও দেখি প্রায়ই ঘটছে এই ধরণের বিচ্যুতি : 'অদৃষ্টের দোষে/বিশ্বে নিন্দে, আপনারে অক্ষম ধিক্কারে/ক্ষত করে', 'সহস্র চৈত্রের রাত্রি চৈত্ররথবনে/কাটায়েছি', 'আকর্ষিবে উচ্ছল অশ্রুর বেগ দুজনের চোখে' অতীতের ফুঁ দিয়ে নিবায়ে দেবে সব' অথবা 'তব নগ্ন কৌমার্যেরে ত্বরিতে'র করিতে'র মতো অনেক প্রয়োগ।২ বাক্‌রীতিকে যদি মূলত ক্রিয়াপদের দিক থেকে বিচার করি তাহ'লে মানতে হয় যে 'দময়ন্তী'র পরবর্তী কাব্যচর্চাতেই বরং এ-পথে আরো সিদ্ধার্থ হ'তে পারছেন কবি, ক্রমশ সরিয়ে দিতে পারছেন বাংলা কবিতার এই ভাষাগত কৃত্রিমতা।

'লক্ষ করবার বিষয়, বাক্‌ছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দের মিলন' সাধনায় ছ-টি প্রতিজ্ঞার অন্তর্বর্তী পাঁচটিই যাচাই করতে চাইছে শব্দপ্রকৃতি, কেবল প্রথম সূত্রে অন্বিষ্ট হ'লো 'বাক্যবিন্যাসের মৌখিক রীতি'। এই রীতি নিয়ে ঠিক কী ভাবছিলেন বুদ্ধদেব তা হয়তো আমরা খানিকটা অনুমান ক'রে নিতে পারি, কিন্তু তখন প্রশ্ন জাগে মনে, রবীন্দ্রনাথ থেকে কতোটা নতুন ক'রে ভাঙতে হয়েছিলো এই বিন্যাস ? পদ্যকে দিয়েও যে গদ্যকবিতার কাজ করিয়ে নেওয়া যায় রবীন্দ্রনাথই তা বহুবার করেছেন, একথা তো বুদ্ধদেবই আমাদের মনে করিয়ে দেন। এবং তার সিদ্ধান্তেও আমাদের কান পুরো সায় দেয় যে "দেবতার গ্রাস"-এর আবৃত্তি এমনভাবে হওয়া সম্ভব যাতে প্রায় মুখের কথা শুনছি ব'লেই মনে হয়'। "দেবতার গ্রাস" এ-ব্যাপারে কোনো একক উদাহরণও নয়। শব্দের বিন্যাসে তাহলে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কতোদূর পরিণতি ঘটলো কবিতায় ? 'কাব্যিক শব্দ ও সাধু ক্রিয়াপদগুলিকে যদি পয়ার থেকে নির্ব্বাসিত করা হয়, 'তাহলে সঙ্গে-সঙ্গেই মৌখিক ভাষার ঠিক ততোটাই অনুরূপ হ'তে পাবে, কবিতার পক্ষে যতোটা হওয়া সম্ভব' : এই কি হবে আমাদের শেষ কথা ? কবিতার পক্ষে কতোটা সম্ভব তা কী-হিসেবে স্থির হবে ? ছন্দের মধ্যেই চাই কথ্যভাষার সতেজ প্রাণশক্তির পরিচয়, কিন্তু বুদ্ধদেব যে তাকে চান ছন্দোবন্ধনের মাধুর্যের'ই সঙ্গে মেলাতে, ছন্দোমাধুর্যের সেই ধারণা কি কোথাও সংঘর্ষ তৈরি করছে না বাকস্পন্দের বিকাশে ?৩

গদ্যের বাক্যবন্ধ নয়, আধুনিক ছন্দের অন্বিষ্ট ছিলো সমর্থ বাক্‌স্পন্দের ব্যবহার। সংগত বাক্যবন্ধ থেকে সেই স্পন্দ রচিত হয় একথা সত্যি, তাহ'লেও স্পন্দকে বিচার করতে হবে তার নিজস্ব মূল্যে। সেই স্পন্দের সঞ্চার আনেন নানা কবি নানা ভঙ্গিতে, কখনো-বা ছন্দদেহ অটুট রেখে তারই মধ্যে বিপরীত বলয়ে আসে গদ্যের লড়াই, কখনো ছন্দকে তার পুরোনো অভ্যাস থেকে ঈষৎ খুলে দেওয়া আপাত-বিশৃঙ্খল গদ্যসমাজের দিকে, আর কখনো হয়তো অধৈর্য প্রত্যাখ্যানে সরাসরি গদ্যধরনেই নেমে আসা। এর কোনটি হতে পেরেছিলো বুদ্ধদেব বসুর সন্ধান ?

আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলায় তিনি সহজে প্রস্তুত নন। কবিতার প্রাথমিক বিদ্রোহে অমিল মুক্তক লিখছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথেরও কয়েক বছর আগে, বিষ্ণু দে-র মতোই, কিন্তু ছন্দ-সুষমার গাণিতিক অভ্যাস বহুদিন পর্যন্ত তাঁকে মান্যই করতে দেখি। বাংলা ছন্দের পর্ববিন্যাস যে প্রায় নিষ্ঠুররূপে নিয়মিত, এমনকি অক্ষরবৃত্তের প্রথম আটমাত্রায় ২-৩-৩ বা ৩-২-৩ বিন্যাসও যে একেবারে অচল, সুধীন্দ্রনাথের মতো বুদ্ধদেবও একথা শ্রুতিধার্য রাখেন অনেককাল। 'কিন্তু এই দুর্গ আজো

টিঁকে আছে, না-ব'লে, অনবরত', 'অবশেষে, যখন মরীচিকার পর্দা ছিঁড়ে, দেখা দেয় প্রথম খেজুর, 'ছিঁড়ে নেয় বাড়ন্ত জাগরণের সবক'টি কম্পমান পাতা', 'নিরঞ্জন গণিত, আবহমান নিরুক্তের অমোঘ বিধান' : এ-সব মুক্ত প্রয়োগ দেখা দিলো কেবল 'যে-আঁধার আলোর অধিক' বইতে, কিন্তু তখন তিনি আর এ-পথে একা নন, অনেকের একজন মাত্র।৪ অথচ পরবর্তী সময়ের বাঁকিয়ে-ধরা এই ভঙ্গি তাঁর প্রথম পঁচিশ বছরের রচনায় কতোই দুর্লভ। এমন নয় যে অক্ষরবৃত্তের অনুরূপ ব্যবহারের সঙ্গে-সঙ্গেই গদ্যপদ্যের বিরোধ মিটে যায় অথবা তাকেই বলা চলে পরম সিদ্ধি। আসলে গদ্য বাক্‌বন্ধ ছন্দের ভিতরে যে-ধরণের অবিরল বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে, এ হ'লো তারই এক ছোটো ইঙ্গিত মাত্র। কিন্তু এই বিপর্যয় এক সময়ে বুদ্ধদেব বসুকে এতোটাই অন্যমনস্ক ক'রে দিচ্ছিলো যে 'স্ফুলিঙ্গ'-এর 'অপরাজিতা ফুটিল' বা 'যেন পেয়েছে লিপিকা' লাইন দু-টিকেও তিনি ভাবছিলেন তিন মাত্রার ব্যতিক্রম, একটু ফাটল-ধরানো এই অক্ষরবৃত্তকে নাম দিচ্ছিলেন মিশ্রছন্দ।৫ আবার এই পিছুটানের জন্যই ত্রিশ বছর আগে বিষ্ণু দে-র 'জানি সে স্ত্রীপ্রজ্ঞা মাত্র জানি সে যে সাধারণই মেয়ে' অথবা 'সংস্কৃত কবিতার নাগরীনাগর' ব্যবহারে তাঁর মন আপত্তি ক'রে উঠেছিলো, উচ্চারণভঙ্গিতে শব্দ যে কখনো-কখনো টান খেয়ে যায় তা মানতে যেন পুরো প্রস্তুত ছিলেন না তখন।৬ সাম্প্রতিক কবিদের ছন্দোগত যথেচ্ছাচার বুদ্ধদেব যে প্রসন্ন চোখে দেখবেন না, তা এখন স্বাভাবিক ব'লেই বোঝা যায়, তাঁর নিজের পুরোণো রচনা সেই ভঙ্গিলতার বিরুদ্ধেই যেন তর্জনী তুলে আছে।

এমনকি 'পদাতিক' কবির শব্দ-সংশ্লেষ লক্ষ্য ক'রে যতো উত্তেজনা বোধ করেছিলেন 'কালের পুতুল'-এর লেখক (১৯৪০), 'দেখা দিলো কলকাতার আরো এক কাল' সত্ত্বেও বলা যায় না যে এর প্রয়োগও তাঁর রচনায় অবাধ হ'তে পারলো। বরং তার অভাবই কখনো-কখনো আমাদের বিচলিত ক'রে যায়। যে-'বিদেশিনী'কে দেখে সুধীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিলো 'আমি যাকে গদ্যগুণ বলি তার বিস্ময়কর প্রাচুর্য ওই কবিতাটিতে', ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত সেই কবিতারই গদ্যটানকে থেকে-থেকে প্রত্যাহত করছে ব'লেই কিন্তু ধারণা জন্মায়। এইখানে বুঝতে পারি বাক্‌বন্ধ এবং বাক্‌স্পন্দের ভিন্নতা। শব্দ ক'টি কীভাবে বিন্যস্ত হবে গদ্যে, এই হ'লো বাক্‌বন্ধের জিজ্ঞাসা। শব্দক'টি কীভাবে ব'লে থাকি আমরা, এই হ'লো বাক্‌স্পন্দের কৌতূহল। 'তবু তার যথেষ্ট হয়নি দেখা' 'এখানে রয়েছে লেখা' বা 'কিংবা কিছু ঐ ধরণের' বিষয়ে প্রশ্ন তুলব না, কিন্তু 'হাতে হাত ঠে কঁ লে ও চ ম কে না-উঠে' 'বাং লো র বারান্দায়' 'ক র ব না খামকা বড়াই'

'তুমি তাঁকে বলবে আমার হয়ে' 'কে যেন উঠল হেসে' : এ-সবও কি নিঃসংকোচ রাখে আমাদের ?৭ এ-কে কখনোই বলা যাবে না ছন্দপতনের উদাহরণ, বরং পুরোনো প্রথা মতো ছন্দোরক্ষাতেই এদের সতর্কতা, কিন্তু যদি একে বলি স্পন্দপতনের উদাহরণ ? অক্ষরবৃত্তের বিন্যাসগুণে চিহ্নিত শব্দাবলিতে আভ্যন্তরীণ রুদ্ধদলগুলি টান পেয়ে মাত্রা বাড়িয়ে নিচ্ছে, তার ফলে এর উচ্চারণ যতোটা দীর্ঘ হ'য়ে যায়, আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণে তার অভাব। ফলে কবিতাপড়ায় আসে অল্প কৃত্রিমতা, গদ্যের ধ্বনিসঞ্চার কিছু-বা বাধা পায়, চলতি চাল সত্ত্বেও রচনায় আসে খানিকটা এলায়িত ভঙ্গিমা।

একথা ঠিক যে এই দুর্বলতা পরিহার ক'রে উঠতে চান কবি। একদিকে স'রে যান স্পষ্ট গদ্যের দিকে, যেখানে ছন্দতান আর কথ্যতান কোন সংঘর্ষ তৈরী করে না, 'বিদেশিনী'র পরেই লেখা হয় "মধ্যতিরিশ"। "খণ্ডদৃষ্টি" বা "ব্যক্ত"র মতো কবিতাবলি ; অন্যদিকে দেখা দিতে শুরু করে আঁটো-সাটো একটি-দুটি সনেট বা সনেট কল্প ছোটো লেখা। "প্রত্যহের ভার" বা "মায়াবী টেবিল"-এর মতো রচনা যেন 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর অতিদূর পূর্বাভাষ, দৃঢ়বন্ধনের আয়োজন। কিন্তু কবির আজীবন স্বরপ্রত্যাশী মন সেই বন্ধনের সময়েও শব্দের সংশ্লেষভঙ্গির চেয়ে বিশ্লেষ ধরনকে কাজে লাগায় বেশি, অনেক স্বাচ্ছন্দ্যে। 'বলে, এতো ফু র্তি র ঋতু' 'রা স্তা য় গণ্ডগোল রাত্তির বারোটা অব্দি' বা 'এমন কি কবিতার শব্দে নয়, শ ব্দে র ছন্দে নয়, ছ ন্দে র সম্মোহনে নয়'—'শীতের প্রার্থনা'র এই শব্দ ছড়ানো রীতি 'যে-আঁধার আলোর অধিক' বইতে যেন অতিচারী হ'য়ে উঠলো : 'হৃদয়ের রত্নগুলি—সহনীয় স ল জ্জ তা য়' 'বিচ্ছেদের পা রি শ্র মি ক' 'ব্যবসায় অ ধ্য ব সা য়ে' 'লিখে গেলো স হ স্রা ধি ক' 'বরং কখনো যারা কাগজের নৌ কো য় চ'ড়ে' 'আমাকে দিয়ো না দৃষ্টি, বি চ্ছে দে ভ'রে আছে মন' 'পাবে বাড়ি, মাংস-ভাত ; গ ন্ধে র অন্ধকারে ঢুকে' 'বিরাট প রি শ্র ম শেষ হ'লে' 'যুদ্ধ করে, খুঁটে খায় ; নিমন্ত্রণে অ ভ্য র্থ না র' 'বাক্ অর্থ সম্পর্কের হিং স্র ক দাঙ্গা শেষ হলে' : এই রকম আরো অনেক।৮ আজকের দিনে অক্ষরবৃত্তের এই বিশ্লেষ কোনো ক্রমেই আর অসংগত নয়, কিন্তু সংশ্লেষণের তুলনায় এর প্রতি কবির অপার পক্ষপাত আমাদের আরেকবার ধরিয়ে দেয় তাঁর স্রোতস্বান্ মেজাজ, শীতল প্রবাহের প্রতি তাঁর অধীর আগ্রহ।

সেই আগ্রহের স্পষ্ট রূপ ধরা ছিলো 'কঙ্কাবতী'র কবিতায়। 'বন্দীর বন্দনা' আর 'কঙ্কাবতী'কে দুই মহল ব'লে মনে হয়েছিলো কবির হয়তো ছন্দের প্রকরণেও এরা দুই মহলের বাসিন্দা। প্রথম বইয়ের "কোনো বন্ধুর প্রতি" কবিতা দূরাগত

আহ্বানের অংশে ছন্দকে একটু দুলিয়ে দিয়ে যায়, কিন্তু এর সামগ্রিক চেহারাই হ'লো অক্ষরবৃত্তের কাঠামোয় গাঁথা, কখনো সনেট কখনো-বা খোলা মুক্তকে। সন্দেহ নেই যে এইটেই তাঁর আদ্যন্ত কবিতা-চর্চার প্রধান বাহন, বারবার ঘুরে আসেন এইখানেই, এবং 'কঙ্কাবতী'ও সে-অর্থে সম্পূর্ণ কোনো ব্যতিক্রম নয়। তবুও, ঐ ছন্দের অনেক ব্যবহার সত্ত্বেও 'কঙ্কাবতী' আমাদের মনে বিশিষ্ট হ'য়ে ওঠে মাত্রাবৃত্ত বা একটি-দুটি ছড়ার চালে, আর তা কেবল নাম-কবিতাটির গুণেই নয়। 'বন্দীর বন্দনা'র বিদ্রোহী তাপ স'রে গিয়ে প্রেম এখানে প্রায় গান হ'য়ে উঠেছে, খোলা হাওয়ার গান, কবিতা হ'য়ে উঠছে "সেরেনাদ"। কবিকে এখানে মনেই হ'তে পারে কিছু বা ছন্দবিলাসী; শব্দ ও ছন্দের ধ্বনিতে মশগুল, শোনা যায় 'চোখে চোখ পড়েই যদি/নিয়ো না চোখ ফিরিয়ে'র ঠমক, অথবা 'একসার মেঘ সরু এলোমেলো আঁকাবাঁকা কালো সাপের মতো/গাছের সবুজে জড়ায়ে শরীর রয়েছে প'ড়ে/আঁকাবাঁকা মেঘ, একা বাঁকা চাঁদ, বাঁকারেখা চাঁদ জলের নিচে,/ আঁকাবাঁকা জল, একা বাঁকা চাঁদ, আকাশ ফাঁকা'র উতরোল বাজনা।

'নতুন পাতা'কে ছেড়ে দিলে অতঃপর বুদ্ধদেবের সব কবিতার বই দোলায়িত হচ্ছে এই দুই ভিন্ন বৃত্তে, বলা যাক 'বন্দীর বন্দনা' আর 'কঙ্কাবতী'র বৃত্তে। 'যে-আঁধার আলোর অধিক'ও তার উদাহরণ। কিন্তু বিপদ এই যে মাত্রাছন্দে গদ্যের সঙ্গে বিরোধ আরো জোরালো হ'য়ে ওঠে এই ছন্দের গহনে মুক্তির পথ আরোই দুর্লভ। বেরিয়ে আসবার একটা ছোটো ধরন হয়তো মেলে মুক্তক মাত্রাবৃত্তে, এবং প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে তর্কচ্ছলে বুদ্ধদেব বলেওছিলেন 'মুক্তক ঢঙের মাত্রাবৃত্ত একবারও যদি সম্ভব হ'য়ে থাকে, তাহ'লে বারবার সম্ভব হবার পথে বাধা রইলো কোথায়।'৯ তবে তত্ত্বগতভাবে বাধা না-থাকা এক কথা আর তার অনায়াস বহুল প্রয়োগ হ'লো স্বতন্ত্র ব্যাপার। উত্তরকালের ইতিহাস থেকে বুদ্ধদেবকে অন্তত এর পরীক্ষায় ততোদূর উৎসাহী ব'লে মনে করা যায় না, ভাবা যায় না যে এই ছন্দের ভিতরকার সংঘর্ষে তিনি বেশি কোনো মন দিচ্ছেন।

তবে কি এর থেকে মুক্তি তৈরি হ'তে পারে মিশ্রছন্দে? যেখানে মাত্রাবৃত্ত-স্বরবৃত্তে অথবা স্বরবৃত্তে-অক্ষরবৃত্তে মেশামেশি হ'য়ে যাবে? ফ্রী ভার্স বা স্প্রাং রীদম্ নিয়ে যখন ভাবছিলেন তিনি এবং সুধীন্দ্রনাথের কাছে বুঝতেও চাচ্ছিলেন এর জটিল রহস্য, সুধীন্দ্রনাথ লিখছেন: 'হঠাৎ মনে হ'লো যে ছড়ার ছন্দ আর পাঁচ মাত্রার ছন্দ এবং মধ্যে-মধ্যে, খুব সাবধানে, স্বরাঘাতপ্রধান, হলন্তাক্ষরবহুল ছয় মাত্রার ছন্দ মিশিয়ে লিখলে হয়তো-বা স্প্রাং রীদম্-এর অনুকরণ বাঙালীর পক্ষে সম্ভব। আপনি চেষ্টা ক'রে দেখুন না।' শুভার্থী এই পরামর্শ কতোটা তাঁকে সেই কারুকর্মে

উত্তেজিত করেছিলো? এমন সম্ভাবনার উল্লেখ বুদ্ধদেবের নিজের আলোচনাতেও দেখতে পাই (দ্রঃ 'বাংলা ছন্দ'), এমনকি 'দ্রৌপদীর শাড়ি'তে পাওয়া যায় 'কালো চুল' এর মতো কবিতা যেখানে আটমাত্রা সাতমাত্রা অনায়াস সফলতায় জায়গা বদল করে: 'কঙ্কাবতী এসে দাঁড়ালো/খুলে দিলো কালো চুল, বিপুল ঢেউ তুলে লাল সূর্যাস্তের সন্ধ্যায়/খুলে গেলো পশ্চিমে সূর্যের জাদুকর জানালা/রঙের রূপসীরা বাড়ালো মুখ ঐ শৌখিন প্রাসাদের জানালায়' তাহ'লেও এই মিশ্রভঙ্গিমা মূলত অমিয় চক্রবর্তীর পথ, বুদ্ধদেব বহুদূর এগোতে চাননি এই ধরন নিয়ে।

অর্থাৎ অক্ষরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত, কোন ছন্দেরই ভিতর থেকে খুলবার আয়োজন বুদ্ধদেবে বিশেষ দেখি না, উপরন্তু তাঁর চরিত্রে আছে সুরের প্রতি অরোধ্য আকর্ষণ। তাঁর কবিতা বানিয়ে তোলে আসক্তি, ছড়িয়ে দেয় 'তীব্র মত্ত আত্মহারা ভালোবাসা' —'যে-ভালোবাসার বাসা আমার হৃদয় শুধু—তীব্র মত্ত আমার হৃদয়! আত্মহারা আমার হৃদয়', আর তারই ফলে আধো ঘুমে আধো স্বপ্নে আচ্ছন্ন কবির স্বরে ভেসে ওঠে 'গান, তাই আজও গান!' এই গান তবে থেকেই যায় শিরায়-শিরায়, কিন্তু তবু তো 'মড়কের সংগ্রাম, হৃদয়ের মৃত্যু, নৈরাজ্যের অন্ধকার' দেখতে হয় তাঁকে, তবুও তো 'স্বপ্নের তীব্রতা'র সঙ্গে আসে 'দ্বন্দ্বের সংঘাত'। তাঁকে ভাবতেই হয় তবু মুক্তছন্দের কথা, মিশ্রছন্দ এবং স্প্রাং রীদ্‌মের ভাবনা, লক্ষ্য করতে হয় কী ভাবে গদ্যের সঙ্গে অবিরতই সাযুজ্য তৈরি করতে চাচ্ছে আধুনিক পদ্য। 'সাহিত্য-চর্চার 'বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধটি অথবা 'কালের পুতুল'-এর রচনাবলি ছন্দবিষয়ে তাঁর এই উন্মুখ কৌতূহলকে চিনিয়ে দিচ্ছে। তবে কি তিনি নিশ্বাস নেবার জন্যই মাঝে-মাঝে বেরিয়ে আসেন গদ্যছন্দের সমতলে, 'বন্দীর বন্দনা' আর 'কঙ্কাবতী'র পর 'নতুন পাতা'য় যেমন? হয়তো তাই। তবে লক্ষ্য করতে হবে যে 'নতুন পাতা' থেকে আজ পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসুর গদ্যছন্দেরও মূল প্রবাহ রবীন্দ্রনাথেরই অনুষঙ্গ মনে ধরিয়ে দেয় বারংবার, তার শব্দে বা ছবিতে নয়, কিন্তু তার স্পন্দনে। এই পরীক্ষার সূচনাপর্বে এমনকি রবীন্দ্রনাথও দেখতে পাচ্ছিলেন তরুণতরদের গদ্যছন্দে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য। প্রেমেন্দ্র মিত্রে, মনে হয়েছিলো তাঁর, 'পাহাড়তলির বন্ধুর ভূমির মতো গদ্যের রুক্ষ পৌরুষ', সমর সেনের যেন 'গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য', আর বুদ্ধদেবের কবিতায় 'পদ্যের কণ্ঠে তালমানছেঁড়া লিরিক'। তালমানছেঁড়া লিরিক? তাহ'লে এখানেও নয়, গদ্যছন্দের এই চেহারাতেও বুদ্ধদেব বসুর এমন কোনো মৌলিক স্পন্দসঞ্চার নয় যা হ'তে পারে একান্তই তাঁর আপন, তাঁর অথবা বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ। কিন্তু 'নতুন পাতা'-রই মধ্যে যেন দেখা যায় আরেকটি কুঁড়ি, কবির আরেক রকম অস্বস্তির ইঙ্গিত।

পদ্যের তালমানছেঁড়া চেহারাও যে তাঁকে বিব্রত করছে কোথাও, তার আভাস যেন দেখতে পাই এই বইতেই। পদ্য-ছন্দের যে-মৃদঙ্গওয়ালা বোল নেই ব'লে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুর গদ্যকবিতায় স্বস্তি পাচ্ছিলেন, সেই মৃদঙ্গেরই ধ্বনি হঠাৎ বেজে উঠলো এর আর-কয়েকটি রচনায়। গদ্যের মধ্যে পদ্যের আমেজ ও মিলের চমক রবীন্দ্রনাথের মতো সুধীন্দ্রনাথেরও আপত্তির বিষয় ছিলো, তাহ'লেও এর প্রয়োগ ঘটছিলো অমিয় চক্রবর্তীর ছন্দে, এবং বুদ্ধদেবের হাতেও উড়ে এলো তার

তোমাকে বুকে ক'রে তোমাকে বুকে ভ'রে কাটে আমার রাত্রি।
সমস্ত চিরকাল সেই উত্তাল অন্ধকার-মন্থিত মুহূর্তে
থমকে দাঁড়ায়—যেন পথ হারায় অন্ধ অবায়ু চিরায়ু মহাশূন্যের যাত্রী–
কোন উদ্যত খড়্গের মতো আমার উত্তপ্ত মাংসের মধ্যে খুঁড়তে।

মনে রাখতে হবে যে অমিয় চক্রবর্তীর 'অন্তর্লীন ঝঙ্কৃত এবং সংহত verse libre' থেকে এর চরিত্র অনেকটাই ভিন্ন, এর আছে এক গড়িয়ে-যাওয়া ভারি মন্থর চলন, অমিয় চক্রবর্তীর রচনার মতো ছিপছিপে নয় এর চেহারা।

পশলা বৃষ্টিতে কালো সারালো মাটির গরম ভাপ
ধানপাকানো তাপ
টনটনে নেবুফুলে ঠাণ্ডা হাওয়া;
সোনালিকাঁটা কাঁঠাল, ভরাট আম,
ঝিকমিকে গ্রীষ্মে পাওয়া।

এ-সব লাইনের সঙ্গে প্রথমোক্তের সাদৃশ্য শুধু এই যে দুই লেখাতেই মিত্রাক্ষরের ব্যবহার।১০ কিন্তু 'নতুন পাতা'র উদ্ধৃত ঐ অংশে এ-টাই মস্ত কথা নয় যে লাইন শেষে মিল আছে। কয়েক তাল শব্দ গড়িয়ে এসে ঐ যে একটা যুক্তব্যঞ্জনময় ছোটো শব্দে আঘাত পেয়ে থেমে যাচ্ছে, গতি আর যতির এই বিশেষ চাঞ্চল্যটাই এখানে গণ্য করবার, তার মধ্যে থেকে যাচ্ছে একটা অনতিনির্দেশ্য পরিমাপের বোধ। যদি না-ই দেয়া হ'তো মিল ?. তখন উঠে এলো আরেক পরীক্ষা; স্তবকবন্ধের পরিমিতিতে গদ্যেরই একটা শ্লোকসদৃশ ধ্বনিরচনার পরীক্ষা। 'চিল্কায় সকাল'-এ দেখা দিচ্ছে এরই একটা প্রাথমিক ধরন :

তোমার সেই উজ্জ্বল অপরূপ মুখ। দ্যাখো, দ্যাখো,
কেমন নীল এই আকাশ।—আর তোমার চোখে
কাঁপছে কত আকাশ, কত মৃত্যু, কত নতুন জন্ম
কেমন ক'রে বলি।

পরম্পরায় এমনি স্তবকবন্ধ, যার শেষ চরণে হঠাৎ ছোটো-হ'য়ে আসা এক-একটি উচ্চারণ। ছন্দ আর অছন্দের মধ্যপথ খুঁজতে-খুঁজতে একবার যেন এই

শ্লোকবন্ধে এসে দাঁড়ালেন কবি। 'বন্দীর বন্দনা' আর 'কঙ্কাবতী'র 'যোগসাধনকারী সরু বারান্দাটির' নাম দেওয়া হয়েছিলো 'পৃথিবীর পথে'। 'নতুন পাতা'র উদ্ধৃত ঐ লাইনগুলিতে তেমনি একটি বারান্দা পাওয়া যাচ্ছে বাকস্পন্দের আর সুরস্পন্দের মধ্যে। এ-ঘর থেকে ও-ঘর যাবার পথে এই যে একবার চকিতে বারান্দাটিকে ছুঁয়ে যাচ্ছেন কবি, একে নিছক আকস্মিকত্ব বলা চলে না, বলতে হয় এষণারই ফলাফল, মনে রাখতে হয় 'বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধে তাঁর এই সতর্ক বিচার : বস্তুত, বাংলা গদ্যকবিতার দু-টো আলাদা ধারাই যেন দেখা যাচ্ছে : একটা রাবীন্দ্রিক রীতি, সেটা বিশুদ্ধ গদ্যের চালে, আর-একটাতে মাঝে-মাঝে পদ্যের আওয়াজ দেয় ; —এই দ্বিতীয় রীতি থেকে বাংলায় ফ্রী ভার্সের উদ্ভব হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।'

অবশ্য সন্দেহ নেই যে 'নতুন পাতা'য় এই নবীন ব্যবহার ততখানি স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত নয় এবং এর পরেও অনুরূপ পরীক্ষা বুদ্ধদেবে অবিরল দেখা যায় না। কিন্তু দীর্ঘ দিনের ব্যবধানেও এই যে তিনি অল্প সময়ের জন্য ঐখানেই ফিরে-ফিরে যান, ঐ খোলা হাওয়ার বারান্দায়, এবং নতুন-নতুন পর্বে আরো-একটু সামর্থ্য সঞ্চার করেন তার মধ্যে—সে-টাও একটা বড়ো ইঙ্গিত। 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' বইতে "মধ্যতিরিশ" বা "খণ্ড দৃষ্টি" কেবলই গদ্য কবিতা, ছন্দের কোনো মহিমায় তারা স্মরণীয় থাকে না :

> শুধু এতেও চলে না,
> ঘরে-ঘরে পরিচারক চাই।
> এই তো আমাদের কালীচরণ।
> বুদ্ধি তার যেটুকু দরকার, তার বেশি নেই।
> সে বাজার করে, কয়লা ভাঙে, রাঁধে বাড়ে,
> দুপুরবেলায় পুরো ঘুমটুকু না-হ'লেই তার চলে না।

এই প্রাত্যহিক গদ্য অতিক্রম ক'রে যখন পৌঁছই "কলকাতা" বা "শীতরাত্রির প্রার্থনা"র মতো কবিতায় তখন আবার কানে ভেসে আসে পুরোনো সেই শ্লোক-গম্ভীর চলন, আরো সংবৃত, আরো প্রত্যয়ের ভঙ্গিতে।

> যখন জন্ম নেয় যৌবন, নৌকোর পাল ফুলে ওঠে,
> আর দূরে, সোনালি কুয়াশার ফাঁকে-ফাঁকে, ঝিলিক দেয় মহাদেশ,
> তেমনি তুমি ছিলে আমার কাছে—অস্পষ্ট, উজ্জ্বল, অচিন্তনীয়,
>
> তুমি, কলকাতা।
>
> অতিথি হ'য়ে এসেছিলাম তখন, কৌমার্যের লজ্জা নিয়ে,
> কিন্তু তুমি, লক্ষ প্রণয়ের নায়িকা, আমার ভীরুতা ভাঙিয়ে

ঝাঁপিয়ে পড়লে আমার উপর, যেমন চোখের সামনে হঠাৎ খুলে যায়
অফুরন্ত সমুদ্র।

মনে পড়ে সেই সব মুহূর্ত, যখন ঘুম-ভাঙা গম্ভীর প্ল্যাটফর্ম
স'রে যেতো ঘোমটার মতো, আর ঘণ্টা বেজে উঠতো আমার বুকে।
—তুমি, আবার তুমি! তোমার তীক্ষ্ণ, প্রবল, পরিশ্রমী ভোর,
ভিস্তির জলে সদ্যস্নাত।

আর, অবশেষে এই রীতি পুঞ্জীভূত স্তরের মতো হ'য়ে উঠলো 'মরচে-পড়া পেরেকের গান'-এর কবিতাগুলিতে যা আসলে 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'র সংলাপ।

এই যে গদ্যের ছন্দে শ্লোকের সুর আর সংহতি, ব্যাপ্তি আর সুমিতি একই সঙ্গে টান-টান ক'রে ধরা, তাঁর একেবারে এই নিজস্ব ছন্দোরীতি কতটা প্রশ্রয় পাচ্ছিলো সংস্কৃত ছন্দ থেকে? দুই বিপরীত প্রান্তের মাঝখানে এই পথ পেয়ে যাওয়া কিছু কি বহিরাগত সমর্থনও পাচ্ছিলো না? 'মেঘদূত'-এর অনুবাদ প্রসঙ্গ এই সূত্রে অনিবার্যতই মনে আসে। মন্দাক্রান্তার ধ্বনিকল্লোল বিষয়ে বুদ্ধদেব লিখছেন: 'কবিতা আর মন্ত্র যখন অভিন্ন ছিলো, যখন ডাইনিপুরুতের অর্থহীন ও ছন্দোবদ্ধ প্রলাপই ছিলো কবিতা—সেই অতি দূর অতীতের স্মৃতি অবচেতনায় হানা দেয় যেন।'১১ এই 'ছন্দের গম্ভীর আন্দোলনে'রই অনুরূপ এক ঢেউ তুলছেন কবি তাঁর এ-সব কবিতায়। ঠিক কোন সময় থেকে সংস্কৃত এই কবিতাবলির সাহচর্যে তিনি ছিলেন তা আমরা জানি না, কিন্তু 'শীতের প্রার্থনা'র পরেই তাঁর অভিনিবেশ লক্ষ্য করি কালিদাস চর্চায়, আর 'মেঘদূত'-এর ছন্দ-দীক্ষা যেন সম্প্রসারিত হ'য়ে এলো 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' পর্যন্ত। অনুবাদের কারণে বোদলেয়ার বা রিলকের নিরন্তর সামীপ্য তাঁর উত্তরকালীন অক্ষরবৃত্তকে যেমন অনেকটা ঘনতা দিচ্ছিলো ব'লে অনুমান হয়, মন্দাক্রান্তার ব্যবহারও তেমনি নিতান্ত নিষ্ফল থাকেনি তাঁর অভিজ্ঞতায়। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'তে গাঁয়ের মেয়েদের প্রারম্ভিক প্রার্থনা 'আকাশে সূর্যের অটল আক্রোশ, জ্বলছে রুদ্রের রক্তচক্ষু' অথবা 'মরচে-পড়া পেরেকের গান'-এ 'যে তুমি বিশ্বের প্রথম শিহরণ, আলোর জাগরণ-মন্ত্র' মনে রেখেই যে এ-কথা বলছি এমন নয়, যদিও সে-ও একটা কারণ বটে। 'অক্ষম আজ অঙ্গরাজ, বীর্য তাঁর নিঃশেষ' কিংবা 'উজ্জ্বল হ'লো মঞ্চ, নটনটী চঞ্চল' এ-সব রচনাও থেকে-থেকে পশ্চাদ্বলয়ে 'মেঘদূত'-এর আভা আনে, আনে তার স্পন্দনগত স্মৃতি। এই ছন্দের প্রয়োগে 'নতুন পাতা' দ্বিধামুক্ত ছিলোনা, 'শীতের প্রার্থনা' সে-তুলনায় আত্মনির্ভর, কিন্তু এই এখনো-পর্যন্ত-শেষ পর্যায়ে তারও পর আরেকটি নতুন মাত্রা লাগলো প্রকরণে। কেবল শ্লোকবদ্ধ নয়, কবিতার সূচনায় নিয়মিত

ছন্দের ধ্বনি পর্যন্ত ভ'রে উঠছে, যদিও অল্প পরেই আবার খুলে নেওয়া হচ্ছে তার জাল। কখনো-কখনো এতটাই এসে যায় নিয়ম :

মুক্ত হ'লো স্রোতস্বিনী, অঙ্গদেশ রজস্বল,
পুত্র এলো স্বরাজ্যে, পূর্ণ হ'লো প্রতীক্ষা ;
শান্তার পতি অংশুমান, যেমন সত্যবতীর শান্তনু :
—উৎসব করো জনগণ, ধ্বনিত হোক জয়কার।

এর তৃতীয় পংক্তি থেকে 'যেমন'টুকু সরিয়ে নিলে এর পুরোটাই পাওয়া যায় পরিমিতির মধ্যে, কিন্তু তার পরেই আবার নবীন স্তবকে স'রে যাচ্ছে বন্ধন। বাঁধন এবং খোলার মধ্যপথটুকু আরো কতদূর মসৃণ হ'তে পারে, হয়তো তারও পরীক্ষা এর পর তাঁর রচনায় দেখতে পাবো আমরা। ইতিমধ্যে কেবল এ-পর্যন্ত ধরতে পারছি যে ফ্রী ভার্স বা মুক্তছন্দকে তিনি খুঁজতে চান এই বিপরীত সাধনায়, গদ্যকেই থেকে-থেকে আপাত-পদ্যের দিকে টান দেবার পরীক্ষায়, 'গদ্যছন্দের সঙ্গে 'গদ্যছন্দকে মেশাবার' এই মিশ্রধরনে। যেমন শিল্পকে জীবনের দিকে নয়, জীবনকেই শিল্পের দিকে আকর্ষণ করতে চান এই কবি, যেমন তাঁকে বলতেই হয় 'তোমার জীবনে এখনো ফলিত ললিতকলার রূপরস/আমার জীবন শুধু শিল্পের উপাদান'—তেমনি বাঁধা-ছন্দ থেকে গদ্যের দিকে নয়, গদ্যকেই তিনি তুলে নিতে চান স্পন্দনমহিমায়। বাংলা কবিতার ছন্দ-অভ্যাসে তিনিও শেষ অবধি মুক্তিই খোঁজেন, তবে ছন্দোমুক্তি নয়, ছন্দে মুক্তি।

১. এই অনুচ্ছেদে, এবং প্রবন্ধের অন্যান্য অংশেও, সুধীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি গৃহীত হচ্ছে বুদ্ধদেবকে লেখা তাঁর চিঠিপত্র থেকে। দ্র° 'কবিতা' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-স্মৃতি সংখ্যা, আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৭।

২. প্রথম তিনটি লাইন "দময়ন্তী" এবং পরের পংক্তিগুলি "হে কাল!" এবং "ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা" থেকে।

৩. এ অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত বুদ্ধদেবের মন্তব্যগুলি পাওয়া যাবে 'দময়ন্তী'র ঘোষণা পত্রে।

৪. লাইনগুলি পারম্পর্যায় "নির্বাসন" "মরুপথ" "প্রেমিকারা" এবং "মিল ও ছন্দ" কবিতা থেকে। দ্র° 'যে-আঁধার আলোর অধিক'।

৫. দ্র° 'সাহিত্যচর্চা' বইতে "বাংলা ছন্দ" প্রবন্ধ।

৬. দ্র° 'কালের পুতুল'-এর অন্তর্গত "বিষ্ণু দে : চোরাবালি"।

৭. সব-কটি প্রয়োগই 'বিদেশিনী'র।

৮. "কবিতার জন্য", "কবি : লোকের চোখে, আর হয়তো—তার নিজের", "কোনো কুকুরের প্রতি"; "নির্বাসন", "রাত তিনটের সনেট ২", এবং "রবীন্দ্রনাথ" থেকে।

৯. দ্র° "বাংলা ছন্দ"।

১০. 'নতুন পাতা'র কবিতাটির নাম "জন্ম"। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা "বসুধা" : 'অভিজ্ঞানবসন্ত' থেকে।

১১. দ্র° "মেঘদূত" এর ভূমিকা।

বুদ্ধদেবের রবীন্দ্রনাথ

শঙ্খ ঘোষ

'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন বুদ্ধদেব ১৯৩৫ সালে। এই সময় থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নতুন বই বেরিয়েছে অন্তত তিরিশটি, আর তাঁর রচনাবলীরও কয়েকটি খণ্ড বেরিয়ে গেছে ওর মধ্যে। আজ 'কবিতা' পত্রিকার পুরোণো সংখ্যাগুলি হাতে পেলে আমরা দেখব, কতখানি বিনীত অনুরাগ নিয়ে নতুন এই বইগুলির বিষয়ে মন্তব্য করেছেন সম্পাদক, মুহূর্তমধ্যে বরণ করে নিচ্ছেন প্রবীণ কবির প্রায় অলৌকিক প্রতিভাকে। গদ্যে আর পদ্যে এই শেষ ছ' বছরের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ যে বিন্যাসের পরীক্ষা করেছেন অনেক, তার কোনোটিই চোখ এড়িয়ে যায় নি বুদ্ধদেবের, সব কটি বিষয়েই তাঁর উচ্ছ্বাস শুনতে পাব আমরা 'কবিতা'র পাতায়, আর এর থেকে শিখতেও চেয়েছেন তিনি অনেকটা। তার মানে এই যে, রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের রচনাবলী তাঁর মনোযোগেরই বিষয় ছিল, সেটা তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরের ব্যাপার নয়।

এও ঠিক যে 'পূরবী'র কবিতাগুলি তাঁর সদ্য-যৌবনকে মথিত করেছিল, এ-অভিজ্ঞতার বিষয়ে পরে একটি কবিতাও লিখেছেন তিনি; সপ্ততিতম জয়ন্তীর উৎসবে, তাঁর তেইশ বছর বয়সে, 'পূরবী'র সঙ্গে 'মহুয়া'কে মিলিয়ে নিয়ে মন্তব্য করলেন বুদ্ধদেব, 'এসব কবিতায় এমন একটি গভীর বিষাদ আছে যা সস্তা কারুণ্য নয়, যা সত্যিকারের ট্র্যাজেডির সুর'। আমাদের মনে আছে 'শেষের কবিতা' নিয়ে অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর তর্ক, অথবা 'চার অধ্যায়' বিষয়ে তাঁর এই ধারণা: 'ভালোবাসার উজ্জ্বল রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যে এর তুলনা নেই'। এই সবই ঠিক। ঠিক যে, গদ্যছন্দ নিয়ে গদ্যগান নিয়ে নৃত্যনাট্য নিয়ে বুদ্ধদেব তাঁর উৎসাহ জানিয়েছেন অনেক সময়ে, লক্ষ্য করেছেন যে শেষ দশ বছরের 'রচনাধারার মধ্য দিয়ে গদ্য শিল্পের এক ত্বরান্বিত বিচিত্র বিকাশ সম্ভব হয়েছে'। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও আমাদের মনে করবার কারণ ঘটে যে বুদ্ধদেবের পছন্দ ছিল আদিপর্বে রবীন্দ্র রচনা, অন্তিম রবীন্দ্রনাথকে যেন খানিকটা এড়িয়েই যেতে চান তিনি।

'কবিতা' পত্রিকার বাইরে এসে যখন একবার পুরো রবীন্দ্রনাথকে দেখতে চাইলেন বুদ্ধদেব, তখন তাঁকে কীভাবে দেখলেন তিনি? 'তাঁর কবিতা বিষয়ে আমি তখন পর্যন্ত (হয়তো এখনো পর্যন্ত) মনস্থির করতে পারি নি, কিংবা সেই বিরাট বিষয়ের সমকক্ষ হতে আমার দেরি আছে' এই দ্বিধা নিশ্চয় তাঁর দূর হয়েছিল শেষ পর্যন্ত, কেননা ১৯৬০ সালের পর থেকে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তাঁর সামগ্রিক বিচার আমরা একাধিকবার শুনেছি। সে-বিচার আছে 'সঙ্গ নিঃসঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ' বইয়ের টুকরো-টুকরো প্রবন্ধগুলির মধ্যে, সে-বিচার আছে—কবি রবীন্দ্রনাথ' বা 'Portrait of a Poet'-ধরণের বইগুলির মধ্যে। আর, এই বিচারের সময়ে আমরা লক্ষ্য করব, কত সন্তর্পণেই বুদ্ধদেব এড়িয়ে যান; শেষ পর্বের রবীন্দ্রনাথকে, কত সহজেই তিনি উচ্চারণ করেন যে 'মানসী' হলো সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের 'অনুবিশ্ব'।

১৮৯০ সালে ছাপা হয়েছিল 'মানসী' বইটি। তার সত্তর বছর পর ১৯৬০ সালে যেন ঘটল এর পুনরুজ্জীবন, হঠাৎ আমরা শুনতে পেলাম সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু বা জ্যোতির্ময় দত্তের কাছে যে এই বইটির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যাবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রূপে। সুধীন্দ্রনাথকে লিখতে হলো: 'his inventive genius gave no better account of itself than in Manasi', আর প্রায় একই সঙ্গে উচ্চারণ করলেন বুদ্ধদেব : 'এই কাব্যগ্রন্থ—যাকে বলতে পারি তাঁর সমগ্র কাব্যের একটি অনুবিশ্ব– প্রাক্ রবীন্দ্র সমগ্র ভারতীয় সাহিত্য তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও তার সঙ্গে তুলনীয় আমরা কিছুই পাব না।' এ-বইটির বিষয়ে কবিদের একটা ঝোঁকের কারণ নিশ্চয় বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের নিজের মন্তব্য আমাদের মনে পড়বে, কবির সঙ্গে একজন শিল্পী এসে যে যোগ দিলেন এ বইতে, সেই তৃপ্তির বোধ আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ বা বুদ্ধদেব কি কেবল এর রূপের গরিমাতেই খুশি ছিলেন? খুশি ছিলেন কেবল এর কলাকৌশল দেখে? অন্তত বুদ্ধদেব স্পষ্টই আমাদের জানিয়ে দেন যে 'ভাববস্তুতেও মানসীকে রবীন্দ্রকাব্যের অণুবিশ্ব বলা যায়'। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অফুরন্তভাবে ফিরে ফিরে এসেছে যে সব মূলসূত্র, তার প্রথম সার্থক উচ্চারণ বুদ্ধদেব পেয়ে যান এই 'মানসী' বইতেই।

'মানসী'র ওপর এতটা ভর করবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন নির্দিষ্ট হয়ে গেল তাঁর রবীন্দ্র সমালোচনার পথ। এর পর এটা যেন প্রত্যাশিতই ছিল যে 'কবি রবীন্দ্রনাথ'-এর আলোচনায় তাঁর গণ্ডি তৈরি হবে 'মানসী' থেকে 'গীতাঞ্জলি' পর্যন্ত। 'বলাকা' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত রবীন্দ্র রচনার যে উত্তর খণ্ড, শেষ

জীবনে সে-বিষয়ে তাঁর ঔদাসীন্যের একটা মানে বোঝা যায় তখন। তাঁর আগ্রহ থেকে এতটাই দূরবর্তী হয়ে যায় এই জগৎ যে সহজেই তিনি লিখে বসেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'সমগ্র পটভূমি পুরাকাল থেকে সংগৃহীত : বাঁশি, ধান, পদ্মফুল ও নৌকো ; গেয়ো পথ, বটের ছায়া ও মাটির প্রদীপ, রথ, রাজা ও রাজপুরী'। এই পটভূমি কী অর্থে পুরাকাল থেকে সংগৃহীত, কেনই-বা আমরা বলব না যে আমাদেরও অভিজ্ঞতার মধ্যে আছে ধান নৌকো বা মাটির প্রদীপের সান্নিধ্য, এ-প্রশ্ন অবশ্য আমি তুলছি না এখানে। আমরা কেবল দেখতে পাচ্ছি যে শেষ দশ বছরের পটভূমিকে তেমন একটা গ্রাহ্য করতে চান না বুদ্ধদেব, বিস্তারিত আলোচনা না করেই আমাদের জানিয়ে দেন যে 'পুনশ্চে'র নাগরিকতা একটা ধার-করা জিনিস মাত্র। এই সিদ্ধান্ত করে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আসেন ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের আয়তনের মধ্যে, কিংবা বড়োজোর মিড্-ভিক্টোরীয় কবিদের আওতায়। আর এই রবীন্দ্রনাথই হয়ে দাঁড়ান বুদ্ধদেবের রবীন্দ্রনাথ।

আমাদের তিরিশের কবিদের কাছে এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ এসেছেন, এক-একজনের কাছে এক-এক রকম। বিষ্ণু দে-র চোখে রবীন্দ্রনাথ আর বুদ্ধদেবের চোখে রবীন্দ্রনাথ যে একেবারে একই জগতের অধিবাসী হবেন না এ-কথা খানিকটা বোঝা যায়, যেমন বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের কালিদাস আর বুদ্ধদেবের কালিদাস দুই ভিন্ন কালিদাস হতে বাধ্য। কবিদের পক্ষে অনেক সময়েই এটা স্বাভাবিক—যে তিনি নিজের বাসনাকে খুঁজে নেবেন তাঁর কবির মধ্যে, একেবারে তদ্গত সামগ্রিকতায় বিচার করা অনেক সময়েই সম্ভব হয় না কবির পক্ষে। তাই 'বলাকা' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত আস্তে আস্তে যে সরে যায় বুদ্ধদেবের চেতনার পুরোভূমি থেকে, এ হলো তাঁরই কবিচরিত্রের একটা তির্যক ইঙ্গিত। এটা লক্ষ্য করবার মতো যে অনুবাদের জন্য যখন বুদ্ধদেব নির্বাচন করে নেন কালিদাস বা বোদলেয়র বা হেল্ডারলিন বা রিলকে-র মতো কবিকে, তখন এর সর্বত্রই তিনি অল্পক্ষণের জন্য নিয়ে আসেন রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ। কিন্তু সে কোন্ রবীন্দ্রনাথ? সেও অনিবার্যভাবেই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' বা গানের রবীন্দ্রনাথ, 'গীতাঞ্জলি' বা 'খেয়া'র রবীন্দ্রনাথ। এক নিরুপাধিক শিল্পময় আধ্যাত্মিকতার সূত্রে বুদ্ধদেব বেঁধে নিচ্ছিলেন বোদলেয়র রিলকে হেল্ডারলিন আর রবীন্দ্রনাথকে, যে মিলনবিন্দুতে গিয়ে দাঁড়ালে তিনিও একদিন উচ্চারণ করতে পারবেন :

> বিশাল পৃথিবী দিকদিগন্তে ব্যাপ্ত,
> বিশাল আকাশ বহির্বিশ্বে নীল ;
> মাঝখানে বসা পালক হয়তো দোলে
> একক আত্মা—অনুদ্দিষ্ট—বাসনা!

'কবিতা'র সাত বছর

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আমার কৈশোরকালে সবচেয়ে বড়ো নেশা ছিলো দু-শো দুই রাসবিহারী এ্যাভিনিউ। প্রতি সন্ধ্যেয় সেখানে হাজির হ'তে না-পারলে মন খারাপ হ'য়ে যেতো।

সেই বাড়ির সামনে ছিলো একটি আশ্চর্য একেশিয়া গাছ। ফুটপাথের গাছ— ফুটপাতের মানুষের মতোই অনাদরে অবহেলায় বড়ো হ'য়ে উঠেছিলো। কিন্তু তার বাঁকা-বাঁকা ডাল, তার রেশমী পাতলা পাতা, তার অদৃশ্যপ্রায় রেণুর বিশেষ এক ধরনের মৃদু অচেনা গন্ধ মন কেড়ে নিতো।

সেখানে যে-আড্ডা বসতো সেটা সাহিত্যসভা নয়। তখন নিয়মিত যে-সাহিত্যসভা বসতো সেটা 'পরিচয়'-এর। সেখানে নিয়মিত বহু জ্ঞানী-গুণী আসতেন। প্রচুর ইন্‌টেলেকচুয়াল আলোচনা এবং বহুবিধ মুখরোচক বস্তুর ব্যবস্থা থাকতো সেখানে। 'পরিচয়' এর সভা ছিলো পোশাকী, কিন্তু দু-শো দুই-এর দৈনন্দিন আড্ডা ছিলো ঘরোয়া। সভাসমিতিতে একটা জাঁকজমক থাকে। কিন্তু বাঙালিদের কাছে যে আড্ডার টান নাড়ির টান, তার মধ্যে জাঁকজমক নেই। এমন একটা জিনিস থাকে যে-টা সেই একেশিয়া গাছের বাঁকা ডাল, রেশমী পাতা আর অদৃশ্যপ্রায় রেণুর মতো মন কেড়ে নেয়।

সেই ঘরোয়া আড্ডায় বুদ্ধদেব বসু একদিন জানালেন তিনি একটি পত্রিকা বার করবেন— নাম 'কবিতা'। তাতে থাকবে শুধু নতুন-নতুন কবিতা এবং নিছক কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা। কবিতা-পত্রিকা সম্বন্ধে তাঁর সেই যুগান্তকারী ঘোষণা আমাদের যেমন অবাক ক'রে দিয়েছিলো তেমনি করেছিলো উৎসাহিত।

রবীন্দ্রনাথ একদা লিখেছিলেন যে, শরৎকালে রাজারা দিগ্‌বিজয়ে বেরুতেন। সেই শরৎকালেই ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বেরুলো ১৩৪২ সালের আশ্বিনে। বাংলা কবিতার ইতিহাসে এ-রকম একটা দিগ্‌বিজয়ের অভিযান আগে কখনো বেরোয়নি। তখন 'কবিতা'র সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র, সহকারী সম্পাদক সমর সেন।

'কবিতা'র প্রথম বছরের চারটি সংখ্যা বাংলার আধুনিক কাব্য-ইতিহাসে এমন একটি স্বাক্ষর রেখে গেছে যা কোনো দিন মুছবে না। আধুনিক কবিতা যে নিছক

একটা মানসিক বিলাস বা খামখেয়ালী বস্তু নয়—সে-কথা ঐ চারটি সংখ্যা থেকেই বাঙালি পাঠকবর্গ অনুভব করেন। সেই সঙ্গে আবিষ্কার করেন এমন-সব কবিকে যাঁরা ভবিষ্যতে কবিতার নানা দিক বিজয় করেছেন। যেমন জীবনানন্দ দাশ, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন, মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব), সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। এঁদের অনেকের কবিতাই আগে নানা পত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু কবির সম্মান তাঁরা পাননি। তাঁদের কবিতা নিয়ে ভালো ক'রে আলোচনাও হয়নি। 'কবিতা' পত্রিকাই তাঁদের প্রথম কবি-সম্মান দেয়, তাঁদের কবিতা নিয়ে আলোচনা করে। 'কবিতা'র প্রথম বছরের সংখ্যাগুলিতেই যে-বিখ্যাত কবিতাগুলি ছাপা হয় তার মধ্যে আছে : অজিত দত্তের "ন খলু ন খলু বাণঃ" (সংহৃত করো, সংহৃত করো অয়ি,/যৌবন-বাণ তীক্ষ্ণ ভয়ঙ্কর) ; জীবনানন্দ দাশে'র "বনলতা সেন" (হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে) ; সমর সেনে'র "স্মৃতি" (আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে) ; প্রেমেন্দ্র মিত্রের "নীল দিন" (কত বৃষ্টি হয়ে গেছে/ কত ঝড়, অন্ধকার মেঘ/আকাশ কি সব মনে রাখে !) ; বিষ্ণু দে-র "বিবমিষা" (তোমাকে রাখিয়া দূরে তবে মোর চিত্ত প্রাণ রাখে) ; বুদ্ধদেব বসু'র "চিল্কায় সকাল" (কী ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায়/কেমন করে' বলি) ; সুধীন্দ্র নাথ দত্ত-র 'জন্মান্তর' (আধখানা চাঁদ রূপার কাঠির পরশে) ; এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছুটি' (আশ্বিনে সবাই গেছে বাড়ি)।

'কবিতা'র প্রথম বছরের পৌষ সংখ্যাতেই ছাপা হয় বুদ্ধদেব বসুর বিখ্যাত সম্পাদকীয় "আধুনিকতার মোহ" যাতে তিনি লিখেছিলেন : 'যত দিন যাচ্ছে, ততই স্পষ্ট ক'রে উপলব্ধি করছি যে কাব্য ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমার ধারণা কিছু সেকেলে। কেননা এখনো আমি কাব্যবিচার করি আমার ভালো-লাগা মন্দ-লাগা দিয়ে, এবং ঈশ্বর যদি সহায় হন, বাকি জীবন তা-ই করবো।····কোনো কবিতা পড়তে-পড়তে আমাদের নিশ্বাস ভারি হয়···কোনো কবিতা একবার পড়বার পর আমাদের সমস্ত দিন-রাত্রিকে হানা দেয়, তারপর কোনো অলস মুহূর্তের বিদ্যুৎ-ঝলকে তার গূঢ় রহস্য উপলব্ধি ক'রে সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে।'

এবং সেই সংখ্যাতেই ছাপা হয় রবীন্দ্রনাথের চিঠি : 'গদ্যে পদ্যছন্দের কারুশিল্প-কৌশলের বেড়া নেই দেখে কলমকে অনায়াসে দৌড় করাবার সাহস অবারিত হবার আশঙ্কা আছে। কাব্যভারতীর অধিকারে সেই স্পর্ধা কখনোই পুরস্কৃত হতে পারে না।···তোমরা ফাঁড়া এড়িয়ে গেছ।'

দ্বিতীয় বছরে (১৩৪৩-৪৪) 'কবিতা'য় জীবনানন্দের তেরোটি কবিতা ছাপা

হয়, সমর সেনের পাঁচটি, রবীন্দ্রনাথের তিনটি কবিতা এবং "গদ্যকাব্য" নামে প্রবন্ধ এবং সমর সেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কয়েকটি কবিতা'র উপর বুদ্ধদেববাবুর বিখ্যাত সমালোচনা "নবযৌবনের কবিতা"। এখানে যদি এই মন্তব্য করি যে বুদ্ধদেব বসু যদি 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশ না-করতেন এবং সমর সেনের কবিতা নিয়ে উক্ত দীর্ঘ প্রবন্ধ না-লিখতেন তাহ'লে তখনকার দিনের সমর সেন হয়তো অমন উৎসাহে অত কবিতা লিখতেন না এবং তার কবিতার প্রতি বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি পড়তো না – তাহ'লে বন্ধুবর সমর সেন হয়তো আমার উপর বিরূপ হবেন না। সেই বছরেরই চৈত্র সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসু আর একটি আশ্চর্য প্রবন্ধ লেখেন জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র উপর। প্রবন্ধটির নাম "প্রকৃতির কবি"। জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে আজকের দিনে প্রশংসার জয়ধ্বনি উঠেছে। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু-ই প্রথম তাঁর কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন: 'জীবনানন্দ দাশকে আমি আধুনিক যুগের একজন প্রধান কবি ব'লে বিবেচনা করি।'

'কবিতা'র তৃতীয় বছরে সম্পাদক হিশেবে নাম ছাপা হয় শুধু বুদ্ধদেব বসু এবং সমর সেনের। প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদনা ছেড়ে দেন এবং একটিও কবিতা লেখেননি। এই বছরেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দু-টি কবিতা সেখানে ছাপা হয়। ইতিপূর্বে সুভাষের কোনো কবিতাই আমি পড়িনি। বুদ্ধদেব বসুর মহৎ একটি গুণ—সব লেখাই তিনি যত্ন ক'রে পড়তেন এবং যার মধ্যেই কবিত্বশক্তির ইঙ্গিত পেতেন তাকেই তিনি সাদরে কবিতার আসরে স্থান দিতেন। এই বছরের আশ্বিন সংখ্যায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'ক্রন্দসী'র উপর তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে লেখেন: 'সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে আমার স্বাভাবিক সহানুভূতির অভাব, তাঁর ও আমার মেজাজে মিল নেই। তবু এ-কথা বলতেই হবে যে যখনই তাঁর কবিতা পড়ি তখনই মনে-মনে প্রশংসা না-ক'রে পারিনে।' ভবিষ্যতে বুদ্ধদেব বসু অবশ্য তাঁর কবিতার অত্যন্ত অনুরাগী হ'য়ে উঠেছিলেন। কেন এবং কী ক'রে, সে-টা আমার কাছে মস্ত বড়ো প্রশ্ন। সে-প্রশ্নের উত্তর একমাত্র বুদ্ধদেব বসু-ই দিতে পারেন।

'কবিতা'র চতুর্থ বছরে (আশ্বিন ১৩৪৫-আষাঢ় ১৩৪৬) অমিয় চক্রবর্তীর 'খসড়া'র উপর বুদ্ধদেব বসু একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। ইতিপূর্বে অমিয়বাবুর কবিতা নিয়ে কোথাও দীর্ঘ কোনো আলোচনা হয়েছিলো ব'লে আমার জানা নেই। বুদ্ধদেব বসু লেখেন: 'বিস্ময়কর বই…পংক্তিতে পংক্তিতে মন চমকে ওঠে।…কিছুরই সঙ্গে ও কাব্য মেলে না…এ একেবারেই আধুনিক, একেবারেই

অভিনব। আঙ্গিকের দিক দিয়েও তাঁর কাব্য অতি দুঃসাহসিক। কিন্তু এটাও বলতে হবে যে, অতি দুঃসাহসিক হবার অধিকারও তাঁর আছে।'

চতুর্থ বছরেব আষাঢ় সংখ্যায় অজিত দত্তের 'পাতাল কন্যার' উপর একটি নাতিদীর্ঘ সমালোচনা বুদ্ধদেব বসু লেখেন : 'আজকের দিনেও যদি ভালো রোমান্টিক কবিতা লেখা হ'য়ে থাকে, তাতেই প্রমাণ করে যে রোমান্টিক যুগ এখনো শেষ হয়নি।···কবিতাগুলি ভালো, আশ্চর্য রকম ভালো।....ব্যক্তিগত হতাশা বা আলস্যকে তিনি (অজিত দত্ত) তাঁর ভবিষ্যৎ কাব্যসৃষ্টির অন্তরায় হ'তে দেবেন না, এ শুধু আমাদেব আশা নয়, দাবি। বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনার এ-টাই বিশেষত্ব—সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখকদেব ক্রমাগত উৎসাহ দেওয়া, যে-টা সম্পাদকের প্রধান কর্তব্য এবং সমালোচকেরও।

'কবিতা'র পঞ্চম বর্ষ (আশ্বিন ১৩৪৬-আষাঢ় ১৩৪৭) বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য, কারণ এ-বছর থেকেই রবীন্দ্র-রচনাবলীর উপর বুদ্ধদেব বসুর অনবদ্য সমালোচনা প্রকাশিত হ'তে শুরু করে। 'কবিতা' ত্রৈমাসিক পত্রিকা হ'লেও একটি বিশেষ কার্তিক-সংখ্যা এ-বছর প্রকাশিত হয়। এই বিশেষ সংখ্যায় বিষ্ণু দে এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একই নামের দুইটি কবিতা বেরোয় : "এ-যুগের চাঁদ হলো কাস্তে"। কবিতার আড্ডাতেই এক দিন এই লাইন নিয়ে দু-জন কবিকেই এক-একটি ক'রে কবিতা লেখার অনুরোধ করা হয়, দু-জন কবিই সেই অনুরোধ রক্ষা করেন, ফলে দু-টি সুন্দর বাংলা কবিতার জন্ম।

'কবিতা'র ষষ্ঠ বছর (আশ্বিন ১৩৪৭-আষাঢ় ১৩৪৮) থেকে সম্পাদক হিশেবে নাম ছাপা হয় শুধু বুদ্ধদেব বসুর। সেই বছরেই কবিতাভবন থেকে আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'আধুনিক বাংলা কবিতা' নামের এক সংকলন। এই সংকলন গ্রন্থটির প্রকাশের মূলে কিন্তু ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। অতুলচন্দ্র গুপ্ত 'কবিতা'র বিশেষ কার্তিক-সংখ্যায় এই গ্রন্থের এক দীর্ঘ সমালোচনা করেন। সেই বছরেই প্রকাশিত হয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতার বই 'পদাতিক'। 'কবিতা'র পৌষ সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসু প্রায় ১৭ পাতা ধরে বইটির একটি সমালোচনা লেখেন।

এ-কথা সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে বুদ্ধদেব বসুর এই প্রবন্ধটি কবি হিসেবে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে খুব বড়ো রকমের সাহায্য করেছিলো। এ-কথাও তিনি মানবেন যে তাঁকে কবিতা লিখতে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু, যেমন তিনি উৎসাহিত করেছিলেন সমর সেনকে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রবন্ধে লেখেন : 'এ-কবির ভবিষ্যৎ আমাদের সকলের আশার স্থল।

'পদাতিক'-এর দুটি দিকই আমি দেখিয়েছি : 'প্রথমে সরল, চড়া গলার কবিতা, 'গণ'-কবিতা হবার যা দাবী রাখে, অন্যদিকে জটিল আঙ্গিকের সংস্কৃতিবান কবিতা। দু'দিক বজায় রাখা চলবে না, একদিক ছাড়তে হবে। কবি কোন দিক ছাড়বেন ?'

সপ্তম বর্ষের 'কবিতা'র (আশ্বিন ১৩৪৮—আষাঢ় ১৩৪৯) আশ্বিন-সংখ্যার প্রথম পাতাতে একটি ক্রোড়পত্র ছাপা হয় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জন্ম : ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮, মৃত্যু ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮। রবীন্দ্রনাথের তিরোধান সম্বন্ধে রচনাটি এই ব'লে বুদ্ধদেব বসু শেষ করেছেন : '...তাঁকে হারিয়ে আজ যতই শোকাকুল হই এ-কথা কিছুতেই মুখে আনতে পারবো না যে তিনি নেই। আমাদের প্রাণে যেখানে তিনি জ্বলছেন, সেখানে তিনি স্মৃতি নন, ইতিহাস নন, সেখানে তিনি জীবন্ত, তিনি মনোগোচর, এমন কি ইন্দ্রিয়গম্য। তা যদি না হবে তাহ'লে আমরা বেঁচে থেকে সকল কাজকর্ম করে যাচ্ছি কেমন করে ?'

কেবলমাত্র কবিতা এবং কাব্য-আলোচনা দিয়ে কোনো পত্রিকা প্রকাশ করার দুঃসাহস বুদ্ধদেব বসুর আগে কেউ করেননি। 'কবিতা' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তার আগে পর্যন্ত অধিকাংশ পত্রিকাতেই কবিতার প্রয়োজন হ'তো শুধুমাত্র পাদ-পূরণের জন্য। কবিতা লিখে সম্মান-দক্ষিণা পাবার কথা কবিরাও কল্পনানেত্রে তখন দেখতে পাননি। বুদ্ধদেব বসু কবিতার সেই অপমান ঘুচিয়েছেন। বাইরের দিক দিয়ে শান্ত কিন্তু অন্তরে চির-অশান্ত এই মানুষটি তার প্রতিভা, উদ্যম, উৎসাহ ও কর্মকুশলতায় বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে এমন একটি স্বাক্ষর রেখেছেন যা ইতিহাস হ'য়ে থাকবে।

আধুনিক কবিদের মধ্যে বলতে গেলে এমন কেউই নেই যাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতাগুলি 'কবিতা'য় প্রথম প্রকাশিত হয়নি এবং যাঁদের কবিতা নিয়ে বুদ্ধদেব বসু প্রথম দীর্ঘ আলোচনা করেননি।

ভাবুকের গদ্য

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কবির গদ্য তাঁর কবিতার নিকষোপম নিদর্শন, আমরা সকলেই সংস্কৃত উক্তিটির সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত আছি। বুদ্ধদেব বসুর গদ্য প্রসঙ্গে অনিবার্যতই কথাটি মনে আসে। এই গদ্য থেকে তাঁর কবিতার উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়, এরকম প্রত্যাশা এখানে জাগাতে চাই না। শুধু এটুকু বলা যেতে পারে, আশ্চর্য এই গদ্যরীতি কবিতা থেকেই জন্ম নিয়ে একটি স্বতন্ত্র সত্তার রূপ নিয়েছে।

এক সময়, মঙ্গল কাব্যের যুগে, 'গদ্য' শব্দটির অন্যতম অর্থই ছিল 'কৌতুক'। ভাবটা যেন এই, গদ্যে কোনো সীরিয়াস কথা বলা চলবে না। পরবর্তীকালে আমাদের দেশে গদ্য যখন গূঢ় গম্ভীর চিন্তনের বাহন হয়ে উঠল, তখন থেকেই প্রবন্ধ লেখকদের মনে যা-কিছু হাল্‌কা তাকে বর্জন করার প্রবণতা অত্যন্ত উচ্চারিত। এর ফল সব সময় যে শুভঙ্কর হয়েছে তা নয়। খুব অসহ্য রকম ছদ্ম-গম্ভীর রচনাও—মূল বক্তব্যের অমিত দীনতা সত্ত্বেও—অনেক সময় অর্জন করেছে প্রবন্ধের পদবী, এবং মঁতেইন থেকে উদ্বর্তিত ব্যক্তিগত রচনার ধারা—কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর অমোঘতা সত্ত্বেও—নিন্দিত হয়েছে। এর ফলে একদিন 'বিদগ্ধ' ও 'সৃজনী' এই দুটি স্রোত পরস্পরস্পর্শী না হয়ে নির্দয়ভাবে বিভাজিত হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথও এই বিভাজন ঠেকাতে পারেন নি, কেন না তিনি প্রমথ চৌধুরীর কোনো-কোনো সৃজন শক্তিহীন গদ্যকেও মনীষান্বিত বলে জেনেছেন। অদীক্ষিত অথচ সংবেদন-শীল পাঠকের মনে হতে পারে, সৃষ্টিশক্তি থাকলেই যেন কোনো 'মনীষী' লেখকের পক্ষে সেটা পণ্ডশ্রম হলো, এবং পক্ষান্তরে, কল্পনা শক্তিসম্পন্ন গদ্য লিখিয়ে যদি ভুলেও পণ্ডিতি কথা উচ্চারণ করে বসেন সেটিকে আদৌ আমল দেবার দরকার নেই। ফলত, আজ বাংলা সাহিত্যে গদ্যের 'বিশ্লেষণী' ও 'সৃজনী' উভয় শিবিরের মধ্যে ন্যূনতম যোগাযোগও রইল না আর।

বুদ্ধদেব নিজে এই বিচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন না। দিনের পর দিন যাঁরা তাঁর কবিতা ভবনের সেই কক্ষটিতে বুদ্ধদেব বসুর বৈঠকী অথচ তর্কদীপিত মনের আস্বাদ নেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তাঁদের কাছে এ তথ্যটি গোপন নেই। কী সম্ভ্রান্ত 'ছেলেমানুষি' নিয়ে তিনি সাহিত্যের অনুপুঙ্খ সমস্যার দিকে ধাবিত হতেন এবং সেই ধাবমানতার বৃত্তে যে-কোনো লৌকিক প্রসঙ্গ অন্তর্গত করে নিতে পারতেন,

সেটির প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে উপকৃত হন নি, এমন কাউকে আমি দেখিনি। বুদ্ধদেব নিজে, অন্তত একটি পর্ব পর্যন্ত, তথাকথিত 'অ্যাকাডেমিক' চর্যার ঘোরতর বিরোধিতায় মেতেছিলেন, অন্তত মেতে উঠবার ভঙ্গিটি ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু নিজে তিনি যখন শহরতলির এক বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনাশ্রিত সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে বৃত হলেন, সেই পর্ব থেকেই তাঁর গদ্যশিল্পে শুদ্ধ অ্যাকাডেমিকতার স্বতশ্চলন দেখতে পাওয়া যায়। সেই সময়ে পণ্ডিত শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও বিদগ্ধ বুদ্ধদেব বসু সতীর্থপ্রতিম উত্তেজনাব আনন্দ নিয়ে একযোগে কাজ করেছেন। বুদ্ধদেবের গদ্যে ঐ অধ্যায় থেকেই লক্ষ্য করা যায়, উপস্থাপিত প্রতিটি অনুভূতিকে সমর্থন করাবার উদ্দেশ্যে যুক্তি ও তথ্য অবতারণার উদ্যম।

এর আগেই সুধীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছিল তাঁর বাক্‌রীতির উপরে। সুধীন্দ্রনাথের সংহতিগুণকে তিনি ইচ্ছে করেই বৃহৎ পাঠক গোষ্ঠীর আনুকূল্যে এলিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথমোক্ত পুরুষের উপপাদ্যধর্মিতা শেষোক্তজনের মধ্যবর্তি-তায় পরিণত হয়েছিল সপ্রতিভ তার্কিকতায়। সেদিক থেকে দেখলে বুদ্ধদেবের জল্পনাশ্রয়ী গদ্য সুধীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় ঋদ্ধ গদ্যরীতির সবচেয়ে অব্যবহিত চাবি। কিন্তু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত মণ্ডলীর কাছে নিজের বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বুদ্ধদেব স্বগতকথন ও কথোপকথনের সমানুপাতিক যে সমাহার ঘটালেন সেটি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্যে বিরল। সেই সঙ্গে বাংলা গদ্যকে তিনি দিলেন অনন্য এক স্বচ্ছতার প্রসাদগুণ। তার সৌন্দর্যে অরসিক অধ্যাপক এবং তরুণ কবির মতো বিপ্রতীপ বর্গের মানুষ সমান আক্রান্ত।

কিন্তু তাঁর গদ্যের এই প্রাঞ্জলতা অনেক ক্ষেত্রেই প্রতারক। বস্তুত সাহিত্যের সঙ্গে কণামাত্র সম্পর্ক নেই এমন অনেককেই যখন বলতে শুনি 'ওঁর গদ্য পড়তে বেশ লাগে, বিশেষত তাঁর প্রবন্ধের গদ্য', তখন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়, 'আচ্ছা, বলুন তো, ওঁর বক্তব্যে আপনার সায় আছে কিনা'। নিশ্চিত জানি, ঐ পাঠকবর্গ এক বাক্যে বলবেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই তাঁর কথাটা মনে ধরবার মতো।' আসলে 'সুহৃৎসম্মিত' বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথের মতোই, অগোচরে সর্বশ্রেণীর পাঠকদের জন্যে গড়ে দেন একটি মোহন মনোরম স্ফটিকব্যূহ যার আকর্ষণে তাঁরা মজে যান এবং সেই অবকাশে প্রভুর মতো অনায়াসেই তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করে তোলেন।

তন্নিষ্ঠ পড়ুয়ার কাছে শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই চোখে পড়বে, বুদ্ধদেবের গদ্যের প্রধান গুণ অভিমানের লাবণ্য। এই অভিমান কখনো প্রকাশ পায় আত্মকরুণার আর্দ্র আচ্ছন্নতায়, কখনো উজ্জ্বল প্রত্যাঘাতের মাধ্যমে। 'কবি রবীন্দ্রনাথ' বইটিতে এরকম একটি জায়গা :

আমরা, যারা কখনো কোনো মহাযুদ্ধে নেমে পরাজিত পর্যন্ত হইনি, তৈরি করিনি কোনো আণবিক খেলনা, জগতের শান্তিকে বিপন্ন করার মতো শক্তি রাখি না, এবং ঋণ অথবা ভিক্ষালব্ধ অন্ন না-হলে যাদের উপবাসী থাকতে হয়—সেই আমরা কী রকম কবিতা লিখি বা না লিখি সে-বিষয়ে জগজ্জনের নির্বিকার থাকাই স্বাভাবিক··· রবীন্দ্রনাথ জগতে অজ্ঞাত থাকার জন্য যে-ক্ষতিটা হচ্ছে, সেটা জগতেরই—আমাদের নয়। (ঐ পৃ ১৪১-১৪৩)

এখানে স্বাভিমানের লক্ষ্যস্থল পশ্চিমি সমাজ যেখান থেকে, রবীন্দ্রনাথের মতোই বুদ্ধদেবেরও সাহিত্যাদর্শ উঠে এসেছে। এই অভিমান ধর্ম যুক্তি ও হৃদয়কে একাকার করে নেয়। এবং 'হৃদয়ের এমন যুক্তি আছে যে-বিষয়ে যুক্তিরও অধিগম্যতা নেই' এই রচনাটির যৌক্তিকতা সম্পর্কে নতুন করে অবহিত হয়ে উঠি আমরা বুদ্ধদেবের গদ্য রচনার সৌজন্যে।

বুদ্ধদেব বসু

আশরাফ সিদ্দিকী

"...ভাবলে আমি নিজেকে দেখতে পাই রমনার বিশেষ একটি রাস্তায়, যা চলে গেছে পুরানা পল্টনের মোড় থেকে সোজা পশ্চিম দিকে...। এই মাত্র খেয়েছি দিদিমার রান্না অতি তৃপ্তিকর মাছের ঝোল ভাত, হাঁটছি হালকা পায়ে প্রফুল্ল হাতে দু' একটি বইখাতা মেঘলা অথবা রোদালো দিনের বেলা দশটায়....। পাঁচ মিনিট পরে মেয়েদের হস্টেল—রমনার সব সুন্দরের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর সেই তথাকথিত চামালিয়া হাউস,... সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন পাঁচটি অথবা সাতটি সহপাঠিনী ··খৃষ্টান সন্ন্যাসিনীদের মত শ্রেণীবদ্ধ হয়ে হাঁটছেন তাঁরা, সমতালে পা ফেলে ফেলে মাথা আঁচলে ঢাকা...পথে পথে আরও অনেক চেনা মুখ ; কখনো দেখি বিজ্ঞান বিখ্যাত সত্যেন্দ্রনাথ বসু চলেছেন মন্দ চরণে হাতে গোল্ডফ্লেকের টিন, জামা বোতাম হারা...চুল উস্কোখুস্কো। ছাঁটা চুল, চোখে সোনার চশমা, গিলে-করা চুড়িদার পাঞ্জাবিতে সুপ্রসাধিত ডক্টর দে...সংস্কৃত বাংলার অধিনায়ক সুশীল কুমার।...ঢুকলেন ইতিহাস বিশারদ রমেশ চন্দ্র মজুমদার...ইংরেজী বিভাগের সত্যেন্দ্রনাথ রায়...তিনি মৃদু কেশে নরম আওয়াজে বলেন, "এই যে বুদ্ধ, ভালো আছো?" ...লিখি চিঠির উত্তর...একটি বা দু'টি সনেট, বা জাপানী ধরনে এক গুচ্ছ তানকা। লিখে সুখ পাই—কেননা, আমার অনবরতই লেখা আসছে।"
("আমার যৌবন", দেশ, ১৩৮০)

হাঁ—ঢাকা—সেই ঢাকা—যে ঢাকার ফরাসগঞ্জে এসে ১৯২১-এর শেষের দিকে অসুস্থ দাদামশাই চিন্তাহরণ সিংহকে নিয়ে নোয়াখালী থেকে বদলি হয়ে বাসা নিলেন আর যে ফরাসগঞ্জের সামনে ছিল উতল-বিতল-নিতল-শীতল বুড়ীগঙ্গা আর ১৯২২-এর সেই কলেজিয়েট স্কুল ঘরের সামনে ছিল বিভিন্ন লাইব্রেরী—বই কেনা হোক বা না হোক উইণ্ডো পিপিং-এ আনন্দ কি কম ছিল? না কিনলেও বই-পত্রিকা পড়তে দিত তারা। তারপর ফরাসগঞ্জ থেকে পুরানাপল্টন—টিনের ঘর। আষাঢ়-শ্রাবণে চালের উপর বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্, কখনো সেতার কখনো পিয়ানোর সুরে, সকাল আসে সোনাঝরা রৌদ্রের দাক্ষিণ্যে—সন্ধ্যা আসে চুপি চুপি পিদিমের শান্ত আটপৌরে সৌন্দর্য নিয়ে। সেই পুরানা পল্টন থেকে ঠন্-ঠন্-ঠন্ সাইকেল ঠন্ঠন্—ঘোড়ার গাড়ির ঝক্কর-ঝিক্কির-ঝিক্কির-ঝিক্কির ছন্দে ছন্দিত রমনার

ময়দানের দিকে সবুজ ঘাসের গালিচায় ছাওয়া রাস্তা, লাল ইঁটে গাঁথা দুই দিকে অধ্যাপকদের বাসা—। বর্ষায় বর্শার মত ফুটে থাকে দুইদিকে কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়ার রঙীন অভিনন্দন। রাস্তার লোকগুলি সহজ সরল—কথাগুলি আঞ্চলিক মাধুর্যে হৃদয়বেদ্য—আর মস্তো মস্তো সব ক্লাসঘর—বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীগুলি যেন ঘরোয়া সাহচর্যে 'আসুন আসুন', 'বসুন' 'বসুন' আহ্বানে সহজিয়া—পূর্ণ—নিজের গৌরবে নিজেই যেন পূর্ণ—নিরাভরণ জ্ঞানপিঠ।

আর টুনু—মানে—অজিত দত্ত—যার সঙ্গে ডাবলিং করে সাইকেল চালিয়ে দূর, অনেক দূর ঘোরা যায় বিনি ভাড়ায়।

এসব কথা বুদ্ধদেব বসু বহু বার বলেন.—পূর্ববাংলা থেকে যেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন শুনিয়েছেন আমাদের কলকাতায়, শান্তিনিকেতনে।

এরও বহু পরে সেই ১৯৬৩-৬৪ মার্কিন মুল্লুকে বসে, ইনডিয়ানার ব্লুমিংটনে।

আমার স্যার 'কঙ্কাবতী'র, 'স্বরঙ্গমা'র সুরেলা কবি, আমার প্রিয় কবি, ঢাকা আসবেন। অক্টোবর ১৯৫০।৩।৪ ; ঢাকা কায়েতটুলিস্থ ফ্রেণ্ডস সেণ্টার-এর উদ্যোগে। ফ্রেণ্ডসগণ একটি মার্কিন সংস্থা ছিল।

আমরা—আমি, কবি আবদুর রশীখান (তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের ছাত্র এবং "নতুন কবিতার" যুগ্ম-সম্পাদক), মোহাম্মদ মামুন (কবি, বর্তমানে মরহুম), মনোজ রায়চৌধুরী (কবি "সোনার বাংলার" ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক)। জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, (শহীদ) এবং আরও অনেকে গেলেন। ফ্রেণ্ডসগণ আমাকে বিশেষ করে যেতে বললেন কারণ প্লেন থেকে নামলে যাতে চিনতে এবং চেনাতে দেরী না হয়। বলেছিলেন জ্যোতির্ময়বাবুকেও। যথারীতি "এয়ার ইণ্ডিয়ার" প্লেন এসে ল্যাণ্ড করলো। কিন্তু স্যার—বুদ্ধদেব বসু কই? হ্যাঁ—আছেন—প্রায় সবার শেষে ধীরে ধীরে নামলেন। শরতের দ্বিপ্রহরের রৌদ্র মাথার উপর—কাস্টমস্-এ চেকিংপর্ব শেষ হল। এবার মৃদু হাসির সঙ্গে বের হয়ে এলেন লাউঞ্জের ভেতরের দিকে প্রসারিত ডান দিকের দরজা দিয়ে। গালের ডান দিকটা জুলফির কাছে বেশ কাটা। বললাম, কাটলো কিভাবে? প্লেনে কিছুতে আঁচড় লেগে? না—মৃদু হেসে বললেন—'ক্ষুরে'—মানে দাড়ি কামাতে—সাত সকালে দাড়ি কামাতে গিয়ে। ফ্রেণ্ডসদের গাড়িতে করে তাঁকে কায়েতটুলী সেণ্টারে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তাঁকে সেখানে পৌছে দিয়ে আমি এবং রশীদ সম্ভবত মুসলিম হলে চলে এলাম আমাদের আস্তানায়। বিকেলের দিকেই সম্ভবত অনেকেই দেখা করতে গেলাম—সৈয়দ আলী আশরাফ, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, মোহাম্মদ মামুন, রশীদ, শামসুর রাহমান প্রমুখ অনেকে। ফ্রেণ্ডস্-এর দুই তিন দিন ব্যাপী কয়েকটি

বৈঠকেই আধুনিক সাহিত্যের বিভিন্ন দিক এবং সমস্যা—বিশেষ করে আধুনিক কাব্য নিয়ে ঘরোয়া বৈঠক হয়। ফ্রেণ্ডদের উদ্দেশ্য সম্ভবত ছিল আলোচনা ঘরোয়া পরিবেশেই হোক—কোন টেবিল-চেয়ার সাজিয়ে ঘটা করে নয়। পরদিন সকাল ৯-১০টায় আসর বসলো ফ্রেণ্ডস্ সেণ্টারের ঢালা বিছানায় মেঝের কার্পেটের উপর। আমার যতদূর মনে পড়ে এই আসরে সৈয়দ আলী আশ্‌রাফ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীর অধ্যাপক, বাংলা কবিতায় ইংরেজী কাব্যের প্রভাবের উপর একটি লিখিত প্রবন্ধ পড়েন—সৈয়দ আলী আহসান ইংরেজীতে প্রবন্ধ পড়েন। যতদূর মনে পড়ে জ্যোতির্ময়বাবুও একটি প্রবন্ধ পড়েন। আলোচনা ও সমালোচনায় যোগ দেন খান সারোয়ার মুরশিদ (ইংরেজীর অধ্যাপক), জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, আবদুল গণি হাজারী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, শামসুর রাহমান, আবদুল মতিন (পরে জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক) মোঃ মাহমুদ (পরে লংমান কোম্পানীর কর্মকর্তা) প্রমুখ। এই বৈঠকে কবিতা পড়েন "নতুন কবিতা" গোষ্ঠীর আবদুর রশীদ খান, মোহাম্মদ মামুন, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, শামসুর রহমান, মনোজ রায় চৌধুরী, আমি। এবং আরও অনেকে। ফ্রেণ্ডস সেণ্টারের ঢালা বিছানায় পূবের দিকের কোণে বসে ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, বেশ ঘরোয়া ভঙ্গীতে—দুটি পা মুড়ে। পরিধানে পাট-ভাঙা পাজামা আর ঢিলে পাঞ্জাবি—পাঞ্জাবির বোতাম গলার বাম দিকে। ঐ ভাবেই তাঁকে পাঞ্জাবিতে দেখেছি তাঁর "কবিতাভবন" —২০২-এর রাসবিহারা এভিনিউতে এবং শান্তি-নিকেতনে। তারও বহু পরে ঘরোয়া পরিবেশে সুদূর আমেরিকার ব্লুমিংটন, ইণ্ডিয়ানায়—১৯৬৩-৬৫তে।

বুদ্ধদেব বসু সঙ্গে এনেছিলেন তাঁর সম্পাদিত "কবিতা" পত্রিকার নতুন-পুরানো কপি। "কবিতা"-কে বাঁচিয়ে রাখা যাবে কিনা—যে "কবিতা"-কে কেন্দ্র করে এদেশে আধুনিক কাব্য-কবিতার একটি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল, এ নিয়ে তাকে ভাবিত, চিন্তিত মনে হল।—সকলকেই বললেন এই সমস্যার কথা। কিভাবে ঢাকায় সে যুগে অজিত দত্ত (টুনু) প্রমুখকে নিয়ে "প্রগতির" সূচনা হয়; "কল্লোল" "কালিকলম" যুগে আধুনিক কবিতার কি রূপান্তর হল—বর্তমান ইউরোপীয় ও মার্কিন কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা কবিতায় কি হচ্ছে—বিশেষ করে মালার্মে এবং বদলেয়ারের কবিতা—টি এস এলিয়ট,—চমৎকার আলোচনা করেন ঘরোয়া পারবেশে। বুদ্ধদেব-বাবু তাঁর প্রতিটি আলোচনাতেই আন্তর্জাতিক পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বলে মনে পড়ে। রৌদ্রোজ্জ্বল ঢাকার সকাল, কায়েতটুলীর পত্রশোভিত গাছগাছালি, পুরাতন বাড়ির কড়িকাঠে একটি কি দু'টি চড়াই পাখির কিচির-

মিচির—বাইরে কাকের কা-কা-কা—এরই মধ্যে ধীরে-সুস্থে "উইজডম ইন এ স্মাইলিং মুড" বুদ্ধদেব বসুর বক্তৃতা—বক্তৃতা ঠিক নয়—সাহিত্য-আলাপন, বেশ লাগছিল। প্রশ্ন আসছিল উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্য থেকে। মীমাংসা হচ্ছিল সে প্রশ্নের। জোর করে চাপিয়ে দেয়া একতরফা মীমাংসা নয়—; আমি ত' এই মনে করি—অমুকে'ত, মানে জীবনানন্দ দাশ—বিষ্ণু দে—সুধীন দত্ত—বদলেয়ার—এলিয়ট এই বলেন—আপনি কি মনে করেন? আমার স্পষ্ট মনে আছে সুকান্ত (ভট্টাচার্য) সম্বন্ধে প্রশ্ন করলো একজন। বললেন—"কবিতায়" আমাদের বক্তব্য আমরা রেখেছি—পড়ে দেখবেন। "কবিতায়" সুকান্ত'র প্রতিভা সম্বন্ধে প্রশংসা করা হয়েছিল—দুঃখও করা হয়েছিল—এই বলে যে, প্রচারের মানে রাজনৈতিক প্রচারের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ও'কে ফুটতে দেওয়া হলো না। বললেন, সবাই আজ দুঃখ করছেন কিন্তু ছেলেটা সুদূর বেলেঘাটা থেকে রাহা-পয়সা বাঁচাবার জন্য যে জ্বর গায়ে হেঁটে যেত আর সময়মত খেতে পেত না—এমনকি একটা ভালো কলমও কিনতে পারতো না, সুতো পেঁচিয়ে ভাঙা কলমে কবিতা লিখতো, কই কেউ ত' বলেন নি তখন, কেমন আছো, কিভাবে চলছে, কি পড়ছো, কি ভাবছো—পরিচয় আছে বিদেশী কবিদের সঙ্গে? সুকান্ত সম্বন্ধে তাঁর এই দুঃখ-বোধ (সেটা সম্পূর্ণই তাঁর ব্যক্তিগত) আমার আমেরিকা প্রবাসকালে সেখানেও তাঁকে বলতে শুনেছি। বুদ্ধদেববাবু ফ্রেণ্ডস আসরের আলোচনায় যতদূর মনে পড়ে আর যতদূর আমার ডাইরীতে নোট আছে, যতদূর বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, যতদূর পুরাতন চিঠিপত্র থেকে খুঁজে পাই—বাংলা কাব্যে তুলনামূলক পাঠাভ্যাসের প্রতি গুরুত্ব দেন। বার বার বলেন—পড়তে হবে, বাইরে কি হচ্ছে জানতে হবে। কুনো ব্যাঙ হলে ত' আজ চলবে না।

সিটিং বসে পরের দিনও। প্রধান ভাষক ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। আলী আহসান সাহেব তাঁর স্বাভাবিক সহজাত বাচন ভঙ্গিতে শ্রোতাদের বিমুগ্ধ রাখতে পারেন—সমস্যা তুলে চিন্তাশীলদের ভাবিত করে তুলতে পারেন। যতদূর মনে পড়ে বুদ্ধদেববাবু তাঁর বক্তব্যেরও একটা মীমাংসা দিতে পেরেছিলেন। এই উপলক্ষ্যে তদানীন্তন রিটজ রেস্তোরায় (বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে এখন যেখানে গ্যানিস-এর দোকান) একটি খানাপিনারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বুদ্ধদেববাবু পুরানা পল্টন বেড়াতে গেলেন। কার্জন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সেগুন বাগিচা দেখলেন। বেড়ালেন রমনার ময়দানের ধারে—গেলেন পুরাতন পরিচিতদের গৃহে।

যাবার আগে কিনলেন রানুর (প্রতিভা বসু) জন্ম শাড়ি—ঢাকাই বুটিদার আর জামদানী। মিষ্টি কিনবেন—মানে ঢাকাই মিষ্টি। না, আজ নয়—কাল যাবার আগে।

রশীদ, মামুন, এরা সব মাটির পাতিল ভরে কিনে এনে দিল ঢাকার কালাচাঁদ, মরণচাঁদের আমৃত্তি, সন্দেশ, প্রাণহারা (বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় প্রাণহরণকারী ?) এবং দই। রানু নিতে বলেছেন। ঢাকার মেয়ে রানু এ-সব মিষ্টি খু-উ-ব পছন্দ করে।

এবারে বিদায়ের পালা। পুরানা পল্টন—সেগুন বাগিচা—কার্জন হল—কৃষ্ণচূড়া—রাধাচূড়া—মখমলের মত সবুজ রমনার ময়দান সেই ঢাকা থেকে বিদায়। কতবার বলেছেন আসবেন—ঢাকা আসবেন—বাংলা একাডেমীর বিগত সাহিত্য সম্মেলনেও নাকি আসার কথা ছিল, কিন্তু আসেননি। কাজেই ১৯৫০-এর শরৎ অপরাহ্ণে সেই-ই শেষ বিদায়। এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেনে উঠলেন ধীরে ধীরে—চাইলেন পেছন ফিরে—দুই হাতে ঢাকাই মিষ্টির ভারী ভারী বোঝা—প্লেন উড়লো—শূন্যে আরও শূন্যে ওড়ার জন্য চক্কর দিল ঢাকার উপর দিয়ে বুদ্ধদেব—১৯২২, ২৩, ২৪, ২৫······২৯-এর বালক-কিশোর-যুবক বুদ্ধদেব কি কাঁচের জানালায় মাথা রেখে দেখছিল কি দুঃসহ এক স্মৃতি বেদনার উতল-নিতল যন্ত্রণার মত মিলিয়ে যাচ্ছে তার ঢাকা—সবুজ ঢাকা—চোখের জলের মত এর নদীগুলি—টুনুদের ঘুড়ি ওড়ানো খেলার মাঠ—রানু সোমদের বাড়ি—কলেজিয়েট স্কুল—রমনার ময়দান—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—আর সব চেনা মুখগুলি।

চিঠি লিখলাম। ১৯৫০-এ প্রকাশিত আমার ও আব্দুর রশীদ খানের সম্পাদনায় প্রকাশিত নতুন কবিতা—তেরজন তরুণ কবির কবিতা সংকলন—'নতুন কবিতা' আর আমার 'তালেব মাস্টারের' সমালোচনা দাবী করে। পূবের মতই জবাব দিলেন ত্বরিত। পাঠালেন কিছু বই। কবিতার কিছু সংখ্যা—কিছু বিজ্ঞাপন। এই পত্রে শহীদ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার উল্লেখ আছে। নতুন পত্রটি :

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেয়েছি, বই পেয়েছি। রিভিয়ু তুমি যত তাড়াতাড়ি চাও তা সম্ভব হ'লো না—আগামী সংখ্যা তো মার্কিন, তার পরের সংখ্যায় সচেষ্ট থাকবো। আমাদের মুশকিল এই যে, পত্রিকার আয়তন স্বল্প এবং ওরই মধ্যে নানা রকম জিনিস দিতে হয়। প্রায়ই কুলিয়ে ওঠে না। পূর্ববঙ্গে তোমরা 'কবিতার' প্রচারের চেষ্টা করছো জেনে সুখী হয়েছি। খুব বেশী আশা না

করাই ভালো, ঢাকা শহরে কিছু সত্যিকার গ্রাহক (সত্যিকার মানে—যাঁরা পড়বেন) পেলেই ঢের হলো ভাববো। বিশ্ববিদ্যালয়ের কমনরুম, হল লাইব্রেরী ইত্যাদির হওয়া উচিত মনে হয়। এই সঙ্গে মার্কিন সংখ্যার কয়েকটা কাগজ পাঠালাম—যদি তোমাদের কাজে লাগে।

'কবিতায়' বিজ্ঞাপনের স্থানও অতি পরিমিত। সেটা সম্ভব হবে কিনা এখনই বলতে পারছি না। অতএব তোমার প্রস্তাবিত 'ঢাকা প্রকাশে' কবিতার বিজ্ঞাপন আপাতত বন্ধ রাখো। পরে দেখা যাবে। গ্রাহকদের টাকা পাঠানোর অসুবিধা আছে, তোমরা সংগ্রহ করে ফ্রেণ্ডস্-এর মারফৎ পাঠাতে পারো। কিংবা জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা এ-বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন। তাঁর এখানকার সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

ঢাকায় তোমাদের নূতন সাহিত্য-গোষ্ঠীর রচনা মাঝে-মাঝে 'কবিতা'য় প্রকাশ করা সম্ভব হলে সুখী হবো। তোমরা, সকলে আমার শুভকামনা গ্রহণ করো। —বুদ্ধদেব বসু

'কবিতার' এজেন্সি বিষয়ে ওয়ারি বুক স্টলের চিঠি পেলে তাদের কাছে বিবরণ পাঠাবো। ঢাকার ব্যাঙ্কের চেক তো এখানে চলবে না—কলকাতার ব্যাঙ্কে ব্যবস্থা করতে হবে।—তোমার বইয়ের বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মত জানাতে চেয়েছো। এর কোনো-কোনো কবিতা আগেই দেখেছিলাম—ভাল লেগেছিলো—বইয়ে মনে হলো গদ্য কবিতার সংখ্যা কিছু বেশি। ছন্দে হাত পাকলে তোমার লেখা মজবুত হতে পারে। —বু, বসু

এ তো গেল এখানকার, ১৯৫০-এর কথা।

আরও কিছু আগে ফ্ল্যাস-ব্যাক করা যাক।

স্থান কলিকাতা, পার্ক সার্কাসের বাসা। সময় রাত ৮টা কি ৯টা। ১৯৪৪ সাল। হঠাৎ অল ইণ্ডিয়া রেডিও ঘোষণা করলো, 'এবারে নিজের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবেন বুদ্ধদেব বসু।…'বন্দীর বন্দনা' ও 'কঙ্কাবতী' থেকে ইথারে ভেসে আসতে লাগলো স্বরতরঙ্গ : সুরতরঙ্গ :

—আর আমি ভালোবাসি নতুন ননীর মত
তনুলতা তব
(ওগো কঙ্কাবতী।)
আর আমি ভালোবাসি তোমার বাসনা মোরে
ভালোবাসিবার
(ওগো কঙ্কাবতী।)
ওগো কঙ্কাবতী।—

অপূর্ব আবৃত্তি। কথাগুলি যেন একটু থেমে থেমে বলা। বেশ দীর্ঘ কবিতা। চমৎকার ওঠানামা করছে স্বর—সুর—আর আবৃত্তিটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন আবুসাঈদ চৌধুরী এবং তার সে যুগের প্রেসিডেন্সি কলেজের বন্ধু এবং কবি কামাল চৌধুরী। কবিতার বই যেখানে যা পাই হাভাতের মত পড়ি—বুঝি আর নাই বুঝি। 'কঙ্কাবতী' কবিতার সুর গুন গুন করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন রিপন কলেজে (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ইংরেজীর ক্লাশ করতে গিয়ে শুনলাম আমার এই ক্লাশের শিক্ষক কাল রাতে শোনা 'কঙ্কাবতীর কবি' এবং খ্যাতিমান লেখক 'বুদ্ধদেব বসু'। বুদ্ধদেব বসু আমাদের ভাষায় বি-ডি-বি—পড়াতেন আমাদের ইংরেজী র‍্যাপিড রীডার। ক্লাশে এলেন। পরিধানে টাইবিহীন স্যুট-একটু যেন ক্লান্ত—পরিশ্রান্ত—তার উপর বেশ লাজুক—গাল ও ঘাড়ের কাছে একটি কালো জন্মদাগ। ছাত্রদের মুখের দিকে বড় একটা তাকাচ্ছেন না। কখনো বই-এর দিকে, কখনো অবিশ্রান্ত ভিড় ও জনস্রোতমুখর রিপন স্ট্রীটের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে থেমে থেমে পড়িয়ে যাচ্ছেন। এক সময় শেষ হ'ল ঘণ্টা। ছাত্রদের স্রোত এড়িয়ে অতি সন্তর্পণে লাজুক লাজুক মুখে তিনি চলে গেলেন নীচের তলার ইংরাজী বিভাগের কক্ষে —পরবর্তী ক্লাশের জন্য প্রস্তুত হবার জন্যে। এরপর প্রতি সপ্তাহে তাঁর সঙ্গে ক্লাশ করেছি ইংরেজীর—তিনি কোনদিন কাউকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন—বা জিজ্ঞেসিত হয়েছেন মনে পড়ে না। আসতেন। পড়িয়ে চলে যেতেন। ব্যস্। বাইরের দিক থেকে তাঁকে যেন আমার গম্ভীর অথচ লাজুক মনে হ'ত। মনে হ'ত বড্ড ক্লান্ত—পরিশ্রান্ত। কে শুনছে—কে শুনছে না—কে থাকছে বা থাকছে না—কোনই কেয়ার নেই। ইতিপূর্বে অধ্যাপক বুদ্ধদেববাবুর 'মর্মবাণী' (১৯২৫), 'বন্দীর বন্দনা' (১৯৩০), 'পৃথিবীর প্রতি' (১৯৩৩), 'কঙ্কাবতী' (১৯৩৭), 'দময়ন্তী' (১৯৪২) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সব না হলেও কিছু কিছু পড়েছি। মুগ্ধ করেছিল তাঁর ছন্দ—বিশেষ করে 'কঙ্কাবতী'র সেই ছন্দ—অপূর্ব আবেশ : কঙ্কা···কঙ্কা···কঙ্কাবতী গো···অথবা··· অন্য কবিতা :

ছোট ঘরখানি মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা ?
মনে কি পড়ে ? মনে কি পড়ে ?
জানালায় নীল আকাশ ঝরে,
সারা দিন রাত হাওয়ার ঝড়ে
সাগর দোলা—

বলা নিষ্প্রয়োজন, এ ছন্দ যে কোনো তরুণ কবিকে প্রভাবিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। এবং করেও ছিল সে যুগের বহু হবু কবিকে। আমার বন্ধু শৈলেন সেন (পরে শ্রীহর্ষের সম্পাদক)-এর সঙ্গে যথেষ্ট দ্বিধা নিয়ে একদিন উপস্থিত হলাম তাঁর ছোট কলেজ কক্ষটিতে। শৈলেন বললো: এ কিছু কিছু লেখে।

লেখে? বেশ তো।—কিছুমাত্র উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করে বললেন: দেশ-বিদেশের সাহিত্য পড়া দরকার। পড়ছে কি? তৃতীয় বচনে কথাটি বলে—শৈলেনের দিকে তাকিয়ে আবার মগ্ন হয়ে গেলেন কি একটি ইংরেজী বইতে। দুত্তেরি। কবি হলে কি হবে। বড্ড বেরসিক। বন্দীর বন্দনা এবং কঙ্কাবতীর কবি সম্বন্ধে অন্তত আমার তাই ধারণা হল। তাঁর লেখা পড়েছি। বই পড়েছি কিন্তু আর বড় একটা ঘেঁষিনি আমার ছয় মাসের সংকীর্ণ রিপন কলেজের ততোধিক সংকীর্ণ পরিসরে।

এরপর বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল শান্তিনিকেতনে। এসে উঠলেন উত্তরায়ণের উলটো দিকে—'হিরণকুঠি'তে। সস্ত্রীক। সকন্যা। কন্যাটির বয়স কম—চঞ্চলা। সঙ্গে দময়ন্তী। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের অনেকের ভিড় দেখা গেল। দেখা গেল বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ অনেককে যাঁরা তাঁর "কবিতা" পত্রিকায় লিখতেন। শান্তিনিকতনে সেবারে তিনি ২।১ দিনের বেশী থাকেননি। এসেছিলেন প্রবোধচন্দ্র সেনের বাংলা ছন্দ নিয়ে কোন আলোচনা করতে। তখন তিনি বাংলা ছন্দ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছিলেন অর্থাৎ আধুনিক কাব্যে বাংলা ছন্দ কি কোন সমস্যা হয়েছে কিনা এই সম্বন্ধে আলোচনা করতে, পারষ্কার হতে। কবিতা পত্রিকায় এ সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধও বের হয়। লেখেন আরও অনেকে। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর (শহীদ হায়দার ভাই'র) একটি প্রবন্ধ বের হয় এই সময়। শুনেছি, তার সম্পাদিত 'কবিতা' এবং 'বৈশাখী' বার্ষিকীর লেখা বাছাইতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। অনেক সময় মনোনীত লেখায় ছোটখাটো পরিবর্তন করে অ্যারো দিয়ে দেখিয়ে তিনি তা' আবার লেখকের কাছে পাঠিয়ে দিতেন তার সম্মতির জন্য। লেখক ও সম্পাদক হিসাবে তাঁর এই নিষ্ঠা এবং ব্যক্তিগত পরিশ্রমের দিকটি নিয়ে কেউ কিছু লিখেছেন কিনা আমার জানা নাই। তার ফাইলে মনোনীত লেখা দীর্ঘদিন অপেক্ষাও করতো। তখন থেকেই চিঠিপত্র লিখেছি। উত্তরও পেয়েছি। আছে সে সব পত্র। কেউ কেউ বলতেন, বুদ্ধদেববাবু, নাকি রবীন্দ্র-বিরোধী। জানি না, এই মিথ্যা অপবাদ অপনোদনের জন্যই কিনা তিনি 'সব পেয়েছির দেশে' (১৯৪১) লেখেন—তার শান্তিনিকেতন ভ্রমণের একটি রসমধুর স্মৃতিচারণ।

বলা বাহুল্য, বইটি শান্তিনিকেতনে যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছিল। এরপর 'দেশ', "প্রবাসী' ও 'বসুমতী' (মাসিক) প্রভৃতি পত্রিকায় এবং 'মোহাম্মদী' ও 'সওগাত'-এ আমার কিছু কিছু কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। যতদূর মনে পড়ে দু-একটি মুদ্রিত কবিতা তার কাছে কাগজ থেকে কেটে পাঠিয়েছিলামও। সম্ভবত ১৯৪৬-এর দিকে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও তার সতীর্থ সুসাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দিনের (বরিশাল) সঙ্গে ট্রামে চড়ে বুদ্ধদেব বসুর বাড়ি গেলাম আমরা, কবিতা ভবনে—বালিগঞ্জে ২০২, রাসবিহারী এভিনিউয়ে, ভাড়া করা বাড়ি। কলেজ স্ট্রীট থেকে ট্রামে যেতে বেশ সময় লাগলো। বৃষ্টিস্নাত অপরাহ্নটি ছিল বড় মাদকতাময়। রাস্তার দু-পাশে রাধাচূড়া আর কৃষ্ণচূড়ার গাছ, তাতে ধরেছে লাল ও হলুদ ফুলের গুচ্ছ, বর্ষার মত খাড়া। মনে পড়ে 'কবিতা' পত্রিকায় আবুল কালাম শামসুদ্দিনের একটি কবিতাও মুদ্রিত হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে দোতলার দক্ষিণমুখী প্রথম ঘরটিই বৈঠকখানা। উপরে থাকতেন ঢাকার টুনু, মানে কবি অজিত দত্ত, ঢাকার স্মৃতির মতই। (এখনও থাকেন)। বুদ্ধদেববাবু বাইরের ঘরেই একটি ইজিচেয়ারে বসেছিলেন। গায়ে ঢিলে পাঞ্জাবি, পরিধানে ঢিলে পাজামা—প্রুফ দেখছিলেন তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার অথবা চিন্তা ভাবনা করছিলেন নিজের লেখা কোন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নিয়ে। সুমার্জিত বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করলেন আমাদের। হায়দার ভাইয়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে দেখা হয়েছে একাধিকবার। পূর্বেই বলেছি, 'কবিতা' পত্রিকায় 'বাংলা ছন্দ' নামে তার একটি সুলিখিত প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছিল। এক ফাঁকে বললাম, রিপন কলেজে তাঁর ছাত্র ছিলাম। হায়দার ভাই ও আবুল কালামকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন—আমাকেও করলেন, শান্তিনিকেতনে কে কেমন আছেন ইত্যাদির কুশলাদি। বললেন, শান্তিনিকেতনে গিয়ে কোথায় কোথায় থেকেছেন। বিশেষ করে লালবাঁধ-এর তীরে ও সাঁওতালপাড়ায় বেড়ানো তার বেশ ভালো লাগতো ইত্যাদি নানাকথা—'সাহিত্যিকার' (আশ্রমের সাহিত্য প্রতিষ্ঠান) খবর প্রভৃতি। বললেন, সেই পুরানা ঢাকার জীবন—বিশ্ববিদ্যালয়—পুরানা পল্টনের বাড়ি - রাস্তা-ঘাটের বিবরণ—উচ্ছ্বাস নেই কথায় কিন্তু গাঢ়তা আছে। আসলেন রানুদেবী—মানে স্ত্রী প্রতিভা বসু মানে আমাদের ঢাকার মেয়ে রানু সোম। দেখো গো, তোমার বাপের দেশের লোক এসেছে। চা এলো। মিষ্টি এলো। মিষ্টি আর চা খেতে খেতে বারবার বলতে লাগলেন কোলকাতার মিষ্টি কি আর সেই কাঁলাচাঁদ আর ময়নচাঁদের মত হবে ? কোথায় পাবে বিক্রমপুরের রাবড়ি, সন্দেশ আর দই।

বললেন, মায়ের (দিদিমাকে মা বলতেন, নিজের মা ছিল না) কাছ থেকে পয়সা নিয়ে কলেজিয়েট স্কুল থেকে কয়েক কদম হেঁটেই কেমন পৌঁছে যেতেন কালাচাঁদের দোকানে চমৎকার দই—চমৎকার ছিল তার স্বাদ। আশ্চর্য—এই যে কথা হচ্ছে কোথাও যেন উচ্ছ্বাস নেই—যাকে বলে ব্যালেন্সড। ঢাকার কথা বলতে গিয়ে মধ্যে মধ্যেই যেন তাঁর কৈশোর-যৌবনে চলে যাচ্ছিলেন। বেশ বোঝা যাচ্ছিল ঢাকার প্রতি যেন তাঁর ছিল কোথায় প্রচ্ছন্ন মনস্তাত্ত্বিক এক দুর্বলতা। হায়দার ভাই এক ফাঁকে বললেন, 'আশরফ ত কবিতা লেখে।' 'হ্যাঁ—দেখেছি—' নিরুচ্ছ্বাস উত্তর। 'সঙ্গে এনেছো নাকি দু-একটা?' বুদ্ধদেববাবু বললেন। পড়লাম কয়েকটি। এর মধ্যে 'হাওয়া বুবুদের দেশে' (পরে 'তালেব মাস্টার' গ্রন্থে সংকলিত) তাঁর ভালো লাগলো। বললেন, রেখে যাও—'কবিতা'য় দেবো। আর শোনো, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান কবিতা খুব পড়বে। তোমাদের শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরী ত সুপার্ব ('সুপার্ব' কথাটির প্রতি তাঁর বেশ দুর্বলতা ছিল—প্রায়ই বলতেন পরেও দেখেছি)—আর শিক্ষকদের সাহায্যও পাবে। শালবীথি-আমবীথিতে নিরিবিলি বসে বসে পড়বে। কবিতা ত রেখে এলাম। কিন্তু দিন যায়, মাস যায়। ডিমাই সাইজের, উপরের কভারে দু-দিক থেকে ময়ূর পুচ্ছের মত পেখম তোলা শিল্পচিত্রে ভূষিত ঝকমকে চকমকে প্রচ্ছদের 'কবিতা' পত্রিকা আসে; কিন্তু আমার হাওয়া বুবুর কি খবর? পত্রও দিলাম। জবাব নেই। এর মধ্যে সাগরদা' (সাগরময় ঘোষ—'দেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক) শান্তিনিকেতন এলেন। তাকে দেখালাম কবিতাটা। বললেন, ঠিক আছে, নিয়ে নিলাম। সেই বছরই (১৯৪৬) শারদীয়া বিশেষ সংখ্যা 'দেশ'-এ কবিতাটি ছাপা হল। বুদ্ধদেববাবুকে লিখে জানালাম—কিছুটা প্রচ্ছন্ন অভিমানের সঙ্গে অর্থাৎ আপনি ত ছাপালেন না—এই দেখুন 'দেশ' ছেপেছে। এবার জবাব এলো ত্বরিত। গাঢ় নীল রং-এর উত্তাল স্রোতে ভাসছে নৌকা— এই মনোগ্রামের কার্ড।

কবিতা ভবন
২০২, রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা-২৯, ১৮-১১-৪৬

কল্যাণীয়েষু,

তোমার কবিতাটি পত্রান্তরে ছাপা হয়ে গেছে, সে খবর আগেই জানানো উচিত ছিল। তোমার জন্য বেশ একটু অসুবিধা হল আমাদের।

—বুদ্ধদেব বসু

এরপর ১৯৪৭-এর মার্চে 'শাহেরবানুরা পাঁচ বোন' নামে একটি কবিতা পাঠালাম (কবিতাটি পরে 'তালেব মাস্টার' গ্রন্থে সংকলিত)। জবাব এলো :

কবিতা ভবন
২০২, রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা-২৯, ৩১-৩-৪৭

কল্যাণীয়েষু,

তোমার 'শাহেরবানুরা পাঁচ বোন' কবিতায় প্রকাশ করা গেল। সঙ্গে টিকিট থাকলে তখনই জানানো হয়—এটা বোধ হয় আমাদের আপিসের ভুল হয়েছিল।

আমার কল্যাণ কামনা গ্রহণ করো।

—বুদ্ধদেব বসু

চিঠিটার মেজাজ দেখে মনে হল, এই তরুণ ছাত্র লেখকের প্রতি তাঁর স্নেহ-দৃষ্টি আছে। অন্তত সামান্য কিছু সহানুভূতি। ইতিমধ্যে 'দেশ', 'বসুমতী', 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর', 'ক্রান্তি' (ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়) সম্পাদিত 'দ্বন্দ্ব', 'চতুরঙ্গ' (হুমায়ুন কবির সম্পাদিত) এবং বিভিন্ন শারদীয়া সংখ্যা ও 'আজাদ', 'কৃষক', 'মিল্লাৎ' 'ইত্তেহাদ' প্রভৃতির বিশেষ ঈদ সংখ্যায় আমার কবিতা বের হচ্ছে আষাঢ়ের নব জলধারার মত। চিঠি লিখলাম বুদ্ধদেববাবুকে। জবাব এলো : এবারে জাফরানী রঙের প্যাডে। প্যাডের উপরে সেই বাদামওয়ালা একটি নৌকা : উত্তাল স্রোতে ভেসে যাচ্ছে : এই মনোগ্রাম। খামটিও একই মনোগ্রামে সুশোভিত। কিছুটা যেন নদী-মাতৃক পূর্ববঙ্গ মোটিভ। সে গবেষণা থাক, আপাতত পড়ুন পত্রটি।

কবিতা ভবন
২০২, রাসবিহারী এভিনিউ,

কল্যাণীয়েষু,

তোমার ৩০-৯ তারিখের চিঠি এখানে পৌঁছলো ১১-১০ তারিখে। যে সব বই চেয়েছো পাঠানো হলো, আশা করি পৌঁছতে খুব বেশি দেরি হবে না।

সাময়িক পত্রাদিতে তোমার কবিতা দেখে আসছি। তুমি গেঁয়ো সুর ধরেছো : এই সুরটা কল্লোলযুগেই জেগেছিল অনেকের মনকেই ছুঁয়েছিল তখন। মিষ্টি সুর, কিন্তু বড়ো ছোটো, বেশীক্ষণ শোনা যায় না, আর কোনো বড়ো তালের গানও এতে ধরে না। সেইজন্য তোমার সব রচনাই প্রায় একরকম হয়ে পড়েছে। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো, আমি বলবো তোমার এখন নানারকম চেষ্টা করা

উচিত, নানা স্বরে, নানাভাবে, নানা ছন্দে। হয়তো তোমার নিজের ভিতর থেকেই পরিবর্তন ঘটবে, কিন্তু সেই সঙ্গে তোমার চেতন-চেষ্টাও চাই।

'বৈশাখী' আর বেরোয় না। তুমি যে-প্রবন্ধের উল্লেখ করেছো তা আমি পড়িনি।

আমার শুভকামনা তোমাকে জানাই।

—বুদ্ধদেব বসু

অতঃপর আমার আরো কাব্যগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে। পাঠিয়েছি। একজন শিক্ষকের মতই তাঁর স্বাভাবিক বাগাড়ম্বরহীনতার মধ্যে দু-এক কথা লিখেছেন। যা 'ভালো' ভালোই বলেছেন—মন্দকে আরো ব্যাপক অনুশীলন অথবা তুলনামূলক পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে 'উত্তরিত' হতে উপদেশ দিয়েছেন। বিদেশে গিয়েছি একাধিকবার। যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয়বার বিদেশে যাত্রার প্রাক্কালে যোগাযোগ করলেন তিনই আমাদের আরেক বন্ধুর মাধ্যমে। তিনি তখন সস্ত্রীক আমেরিকায়। এবং আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিপূর্বে পড়েছি এবং এখন যাচ্ছি—সেই ব্লুমিংটন ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়—ভিজিটিং অধ্যাপক হিসাবে—তুলনামূলক সাহিত্যে। বন্ধুটি পত্র দিল বসু পরিবারের জন্য আমি যেন ঢাকার বুটিদার ও জামদানী শাড়ি নিয়ে যাই। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই নেবো।

দীর্ঘদিন পর ১৯৬৩-৬৪-এর শিক্ষাবর্ষে আবার দেখলাম বুদ্ধদেব বসুকে। প্রায় ১৩।১৪ বছর পর। স্বাস্থ্যের সেই লাবণ্য নেই। শরীরে বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে। কিন্তু কবি-মনটি আছে আগের মতই সবুজ এবং সরেস। সম্ভবত আরও সরেস।

ব্লুমিংটন বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী থেকে হেঁটে একটু পূবদিকে গেলেই ব্যালেনটাইন হল। সেই ব্যালেনটাইন হলে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে তাঁর অধ্যাপনা। আমার বিভাগীয় প্রধান ডক্টর রিচার্ড ডরসনকে বললাম তুলনামূলক সাহিত্যে কিছু ক্লাশ করার অনুমতি দিতে। অনুমতি মিললো। বুদ্ধদেববাবু সেবার বক্তৃতা দিচ্ছিলেন রামায়ণ-মহাভারত এবং বেউল্‌ফ, ইলিয়াড, ওডেসি প্রভৃতি ভারতীয় মহাকাব্য বনাম পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্য নিয়ে। তিনি প্রথম কয়েকদিন মহাকাব্যগুলির কাহিনী ঘরোয়া পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদের গল্পের আকারে বলে গেলেন। মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকাদের নাম বোর্ডে লিখে যেতে লাগলেন আমেরিকান ও বিদেশী ছাত্রদের নামগুলির সঙ্গে পরিচিত করে তোলার জন্য। তারপর ক্লাশের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে গল্পগুলি এবং কাহিনীর বিশেষত্ব নিয়ে সেমিনারের জন্য প্রবন্ধ তৈরী

করতে দিলেন। আর কি। ছেলেমেয়েরা লাইব্রেরী চাষ করতে লেগে গেল। এরপর প্রতিদিন চলতে লাগলো ছাত্রদেব প্রবন্ধ পড়া এবং পঠিত প্রবন্ধের উপর সমস্ত ক্লাশ এবং সর্বশেষে বুদ্ধদেববাবুর আলোচনা। জমে উঠলো ক্লাশ। তখন দেখেছি সমালোচক বুদ্ধদেব বসুকে—বিভিন্ন রেফারেন্স গ্রন্থ ঘেঁটে ঘেঁটে তিনি তাঁর নোট বইতে লিখে নিয়েছেন বিভিন্ন উদ্ধৃতি। এখনো যেন অবসর মুহূর্তে চোখ বুঁজলে দেখতে পাই—সামার সিজনে ঝরে পড়ছে উইলো গাছের পাতা—আর ব্যালেনটাইন হলে বুদ্ধদেববাবুর বক্তৃতা চলছে: "ইয়েস, প্যাটারনাল কোয়ালিটি—ইয়েস, লং কনটিনিউইং ট্রাডিশন—ইয়েস, রিলিজিয়ন উইথ সিনসিয়ারিটি অ্যাণ্ড সাবলিমিটি"—এই হল ভারতীয় মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য। প্রাচ্যে মিলন-বিরহ, ত্যাগ তিতিক্ষা নিয়ে এই জীবন দর্শন, আর প্রতীচ্যে আছে ঐহিক আকাজ্ক্ষা, আছে দৈহিক আকাজ্ক্ষা। ওখানে ত্যাগের ইন্দ্রধনুচ্ছটায় মোহনীয় দুঃখের ধরিত্রী। আর এখানে জ্বলে যাক নগব—জ্বলে যাক গৃহ—পুড়ুক ট্রয় নগরী। আমি চাই—আরও চাই—।

শীতে বরফ পড়ছে ব্যালেনটাইন হলের বাইরে, মেঘাচ্ছন্ন আমেরিকার আকাশ – কিন্তু পথে-ঘাটে তবু জনস্রোত। ঘরে বসে থাকে না পশ্চিমের ব্যস্ত মানুষ। নো ওয়ার্ক—নো ফুড। ছাত্রছাত্রীরা স্কুল কামাই করে না। চলছে যানবাহন—বলছেন বুদ্ধদেব: "কিভাবে তোমরা বুঝে নেবে প্রভেদটা। তোমরা সংগ্রামী। তোমরা কর্মী। তোমাদের নেই গুরুজনদের দায়িত্ব। তোমরা পিতা-পিতামহ বৃদ্ধ হলে তাকে বৃদ্ধলোকদের এসাইলামে পাঠিয়ে দাও। আর এদিকে বেচারা রামচন্দ্রকে তরুণী স্ত্রী নিয়ে বনে গিয়ে পিতৃসত্য, "প্যাটারনাল রাইট" রক্ষা করতে হয়। আর বেচারা লক্ষ্মণ। তাকে শুধু পিতৃসত্য নয়, ভ্রাতৃসত্যকেও শ্রদ্ধা জানিয়ে বিবাহিতা স্ত্রীকেও পিতৃগৃহে ফেলে যেতে হয়।"

জনৈকা সুন্দরা ছাত্রী হয়তো প্রশ্ন তুললো, এ বড়ো বেশী বাড়াবাড়ি। আরেক সুন্দরী বললো, আমি কিন্তু ঐরূপে ডসরথের (দশরথের) পুত্রবধূ হতে চাইবে না। মৃদু হাসছেন বুদ্ধদেব বসু। বলছেন, একটা শান্তি কিন্তু তারা পায়—সে হল মৃত্যুর পরে একটা স্বর্গলোকের প্রতিশ্রুতি। আর মৃত্যুটা এমন একটা জটিল ব্যাপার যে, এর আদি বা অন্ত কেউই বলতে পারে না। বাইবেলও নয়। এমনকি ট্রয়ের রূপসী হেলেনও নয়। কিন্তু সীতা বা লক্ষ্মণের স্ত্রী উর্মিলার কাছে তার অন্য অর্থ ছিল।

আমেরিকায় শরৎ এলো। আকাশে বাতাসে নয়া পত্রপল্লবের বিজয়গীতি। অসংখ্য পাখির কলকাকলিতে পূর্ণ সবুজ বনভূমি। বুদ্ধদেববাবু পড়াচ্ছেন:

"...শকুন্তলা আর টেম্পেস্টের মীরান্দা এক নয়। এক নয় রাজা দুষ্যন্ত এবং ফার্দিনান্দ। দুই-ই পরিপূর্ণ নিজেদের পটভূমিতে। পটভূমিটাই আসল। দারিদ্র্য সব ক্ষেত্রে শান্তি আনতে পারে না বলেই প্রাচুর্য শান্তি আনতে পারে - এটাও ঠিক নয়।"

আমেরিকান এবং ইংরেজগণ বাস্তববাদী হয়েও কিন্তু বঙ্গ-ভারতীয় গণকের নাম শুনলে দুই হাতই বাড়িয়ে দেয়। তারা ম্যাজিকের আশ্চর্য জগতের কথা শুনলে অনুসন্ধিৎসু হয়। বঙ্গ-ভারতীয় অধ্যাপকগণও তাই এদেশের সনাতন জীবনের—দর্শনের এবং ধর্মতত্ত্বের কথা বলে একজন তরুণ বা তরুণীর মাথাটা বিলকুল ঘুরিয়ে দিতে পারেন—কারণ তারা গভীরে যেতে চায়—আর গভীরে একবার ঢুকলে ওদের পক্ষে ফেরাও মুশকিল—হয় পি-এইচ-ডি পর্যায়ে যাবে নয়তো হিপ্পী হয়ে যাবে। এই জন্যই বুদ্ধদেববাবুর ক্লাশগুলি বেশ জমে উঠতো—অজস্র প্রশ্নের শরাঘাতে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে আরও জানার আগ্রহে। বুদ্ধদেববাবু তৈরী থাকতেন। উঠুক প্রশ্নবাণ, পরিষ্কার হোক প্রাচ্যের মহাকাব্যগুলির বিরাট অরণ্যানীর অন্ধকার। তপোবনে। তপোমনের তপোজীবনের।

সেই ১৯৪৪-৪৫ এর লাজুক অধ্যাপককে দেখেছি ক্লাশ শেষে অথবা বিরতিতে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছেন, তাদের দেওয়া সিগারেট অম্লানবদনে তাদেরই লাইটারের আগুনে একটু নিচু হয়ে ধরিয়ে নিচ্ছেন। ছাত্রীগণ তাঁর কাছ থেকেই লাইটার ধার করে সিগারেটের ধূম উদ্গীরণ করছে, আর পঞ্চপতি সেবিকা বেচারা দ্রৌপদীর (ড্রাউপডী) অন্তহীন শাড়ি (এনডলেস ক্লোদিং) আর সতীত্ব (চ্যাস্‌টিটি) নিয়ে সব মারাত্মক প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করছে। বুদ্ধদেববাবু উইলো গাছের আপেল-বীথির দূর্বাসবুজ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে মুচকি হেসে বলছেন—কখনো আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন সেই প্রবাদটি......ঐ সে বিশ্বাসে সব মিলে হাঁ, 'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর'—'ইউ আর টু বিলিভ ম্যাডাম—ইউ আর টু বিলিভ মেনি থিঙ্কস ইন ইণ্ডিয়ান মিথ—দ্যাট ইজ এ পার্ট অব ইণ্ডিয়ান রিলিজিয়ান।"

শেষ পর্যন্ত বুদ্ধদেববাবুর আমেরিকান ছাত্রছাত্রীদের কেউ কেউ আমাদের কাছে পর্যন্ত ধাওয়া করতে লাগলো ত্রৈমাসিক টার্ম পেপার লেখার সময়।

আচ্ছা, তপোবনে 'সীটা'—সীতাকে একটি সার্কল—বৃত্তের মধ্যে রেখে রাম 'ম্যাজিক ডিয়ার'—মায়ামৃগের পেছনে কেন গেলো? ওয়াজ ইট এ ম্যাজিক? এটা কি কোন ইন্দ্রজাল। আর 'ডসানানা' দশাননের দশ মাথা। ব্যাপারটা কি। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে এমনটি নেই কেন? ইত্যাদি—ইত্যাদি। নেই কেন সেটা

বুঝবার জন্য বুদ্ধদেববাবু একদিন তাঁর ক্লাসে ডেকে নিয়ে এলেন বিখ্যাত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোকবিজ্ঞানী স্টিথ থম্পসন সাহেবকে—ইংরেজী তুলনামূলক সাহিত্য ও লোক-বিজ্ঞানের অশীতিপর বৃদ্ধ অধ্যাপক। থম্পসন বললেন, ইন্দো-ইউরোপীয় যে মানবগোষ্ঠী এশিয়া-মাইনর থেকে গিরিপথ অতিক্রম করে ভারতে গেলো, তারা সংখ্যায় 'অজস্র' ছিল না। আদিবাসীদের সঙ্গে তারা মিশেছে, মিশতে হয়েছে, বিবাহ করেছে, বিবাদ করেছে। যেমন হয়েছে আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে রেড ইণ্ডিয়ানদের। তিনি ক্লাসের একটি আধুনিকা রেড ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠিসম্ভূতা সুন্দরী মহিলাকে (এখন খাঁটি আমেরিকান) অঙ্গুলি সংকেত করে দেখিয়ে বললেন, কি ম্যাডাম—আপনি কোন্ কালচারে বিশ্বাসী? মহিলা ত্বরিত জবাব দিলেন, "বোথ—বাট ইন এ রিফাইনড ওয়ে" অর্থাৎ উভয়ই, তবে আধুনিক সভ্যতাকে স্বীকার করে। থম্পসন বললেন, ভারতীয় মহাকাব্যেও তেমনি প্রাচীন আদিবাসীদের সংস্কৃতি আছে—"বাট ইন এ রিফাইণ্ড ওয়ে।" ভীমের দুঃশাসনের বক্ষরক্তপানের ব্যাপারটা আসলে ক্যানিবালিজম' বা নররক্ত পানের কোন প্রাচীন বিশ্বাসের জের। প্রাকৃতিক আবহাওয়া, খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য, সহজলভ্য জীবনপথ—মানুষকে একটু কবি করেছে। ভাল সাহিত্য গড়ে উঠেছে। আর মহাকাব্যের নায়ক—কি আইরিস কুহুলীন, কি রাশিয়ান ইলিয়া মুরোমেট, কি বেউল্ফের হ্রদগার কি সোহরাব ও রুস্তম আর কি লক্ষণ আর অর্জুন—সবই সেই প্রাচীন শিভ্যালরীর ধারা। আর যেখানে শিভ্যালরী—সেখানেই ম্যাজিক ইন্দ্রজাল, অসাধ্য সাধন। জন্মটাও মানে বীরের জন্মটাও এক ইন্দ্রজালিক ব্যাপার—ম্যাজিক্যাল বার্থ মটিফ।

ক্লাশ জমে উঠলো।

বুদ্ধদেববাবুকে দেখি ক্লাশের অবসরে কাগজের গ্লাসে কোকাকোলা খাচ্ছেন আর তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে জাজিম বিছানো লবীতে কথা বলছেন। এরপর দেখা হয়েছে লাইব্রেরীতে। বই নিচ্ছেন—বই পড়ছেন। দেখা হয়েছে পথে ঘাটে, গ্রোসারী দোকানে—মুরগী-মাংস তরিতরকারী কিনছেন। কখনো একা—কখনো কখনো স্ত্রী প্রতিভা বসুর সঙ্গে। কখনো সঙ্গে তাঁর ছেলে শুদ্ধশীল বসু ওরফে পাপ্পা। পাপ্পা তখন পড়ছে ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে—প্রিগ্রাজুয়েশন বা প্রাক ডিগ্রী পর্যায়ে। দেখা হয়েছে, বিভিন্ন সেমিনারে, ইন্টারন্যাশনাল হাউসে অথবা ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের মিলন সম্মেলনীতে। আমার যেন মনে হয়েছে—'যস্মিন দেশে যদাচার'—অর্থাৎ বিদেশে গিয়ে তাঁর সেই লাজনম্র ব্যক্তিগত গণ্ডী যেন একটু প্রসারিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি খুশি। বেশ কাটছে কিন্তু দিনগুলি।

একটি ঘটনা বলি। প্রথম পর্যায়ে আমি থাকি ব্লুমিংটনের ৩০৭, ইস্ট থার্ড স্ট্রীটে। আর বুদ্ধদেব বাসা নিয়েছেন সাউথ ফেস্ এভিনিউতে। হেঁটে গেলে পাঁচ মিনিট। গাড়িতে দুই মিনিট। বাসায় আছেন তাঁর স্ত্রী প্রতিভা বসু, ছেলে পাপ্পা। একদিন লাইব্রেরী থেকে বের হচ্ছি। পরিশ্রান্ত। বললেন, চলো—বাসায় কফি খাবে। গেলাম। কীহে, তুমি এত মনমরা কেন? হোম সিক? দেশের জন্য মন কেমন? হ্যাঁ—বলো কোন চীজ খাবে? দেশী না বিদেশী? প্যারিসের না আমেরিকার না লণ্ডনের। আমি বিনয়ের সাথে বললাম, ড্রিংক করি না। 'পিতৃসত্য' পালন করছি—মানে তাঁর ক্লাশ বন্ধু তার কথা বললাম। বেশ-বেশ—কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রও যদি এমনি বয়সে বিপত্নীক, মানে বিনাপত্নী আসতেন তবে ওই ডরোথী, মেরিলীন, ক্যামেলিয়ার সঙ্গে কি 'স্পিকটি নট'—মানে কথাও বলতো না। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। কথা বলো—নাচো—হাসো—গাও, নইলে ত মন খারাপ লাগবেই। কবিতা লেখো না কেন তোমাদের বান্ধবীদের নিয়ে?

প্রতিভা বসু বাঙালী কায়দায় খাবারের ডালি সাজিয়ে আনতেন। শুধু ভালো লেখিকা নন, ভালো রন্ধন-পটিয়সীও বটে। বলতেন, ওর স্ত্রী আছে, ও কেন মেয়েদের সঙ্গে ভাব করতে যাবে। বুদ্ধদেববাবুর উত্তর, আহা, লেখক তো—কল্পনায় কি আর ভাব করা যায় না। লেখো—লেখো—দেখো সব কিছু। বুদ্ধদেববাবুর সাউথ ফেসের বাসাটি দেখলাম একটি ছোটখাটো লাইব্রেরীতে পারণত হয়েছে।

এরপরও দেখা হয়েছে। কখনও লাইব্রেরীর সামনে ক্যাবিস-এর দোকানে বই দেখছেন। কিনছেন, তন্ময় হয়ে পাতা ওলটাচ্ছেন। হাতে কফি বা কোকো-কোলা। কখন লাইব্রেরী ভবনের তিনতলার বেসমেণ্ট এ তার নির্দিষ্ট টেবিলে বই-এর সমুদ্রে নিমজ্জিত। ভাবছেন ভারতীয় মহাকাব্যের কোন সমস্যার সমাধান।

আরও দেখা হয়েছে।

অনেক—অনেকবার ·।

এর মধ্যে শরৎ অবকাশের পূর্বে ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংলিশ বিল্ডিং-এ। রাইটার্স ওয়ার্কশপে আবার বুদ্ধদেববাবুর বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য হ'ল। আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েই হবু লেখকদের একটি বিশেষ ক্লাশ আছে। যারা লেখক-লেখিকা তারা শখ করে এই কোর্সটি নেন। নিজেদের লেখা গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ ক্লাশে পড়া হয়, এই উপলক্ষ্যে খ্যাতিমান লেখকদেরও নিমন্ত্রণ জানানো হয়—ওয়ার্কশপ অনেক সময় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েও ভাবের আদান প্রদান করে

সেখানকার ওয়ার্কশপের সঙ্গে। তাদের পত্রিকাও আছে। প্রতিটি লেখারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ হ'ত—কি করলে লেখাটি আরও ভালো হতে পারতো, বিশেষজ্ঞ বা বিশিষ্ট শিল্পী সাহিত্যিকগণ তা বলতেন। বড় বড় লেখকগণ তাদের অভিজ্ঞতাও বর্ণনা করতেন। বুদ্ধদেববাবু বাংলা সাহিত্যে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবের উপর বক্তৃতা দেন। থেমে থেমে তার সেই বক্তৃতাভঙ্গী আমার এখনও মনে আছে—'ইয়েস-ইয়েস আওয়াব লিটারেচার, আই মীন মডার্ন বেঙ্গলী লিটারেচার হ্যাজ বীন ব্রট আপ্ ইন দি স্কুল অব ইংলিশ থট এণ্ড সেন্টিমেন্টালিটি।' ইংলিশ বিল্ডিং থেকে লাইব্রেরীতে আসতে বললেন, আমাদেব দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই ধরনের লেখার স্কুল থাকা উচিত। তাহলে তরুণ লেখকদের ভালো লেখা কাকে বলে এবং ভালো লিখতে কি, কেন এবং কিভাবে (হোয়াট, হোয়াই এণ্ড হাউ) পড়া দরকার তাও বুঝবে। আমরা ত সব কুনো ব্যাঙ হয়েই রইলাম। আমি বললাম, মিসিসিপি অঞ্চলের নিগ্রোদের জীবন নিয়ে ওখানকার এক লেখক উপন্যাস লিখছেন। তিনি তো ফোর্ডফাউণ্ডেশনের গ্রাণ্ট নিয়ে আজ তিন মাস ধরে আমাদের ফোকলোর লাইব্রেরীতে মিসিসিপির লোক-সাহিত্য, ছড়া, প্রবাদ, পোশাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আমাদের দেশে এত তেল কি পুড়বে? রাধা কি নাচবে?

আরও দেখা হয়েছে। অনেক—অনেকবার··· বসে আছি নিজের বাসায়—অ্যাপার্টমেন্টে। বরফ পড়ছে চারিদিকে। হঠাৎ টেলিফোন এলো। পাপ্পা (বুদ্ধদেব বসুর ছেলে) বলছে বাবা আসতে বলছেন। কবিতা নিয়ে আসবেন। নতুন লেখা কবিতা।

নতুন কবিতা ছিল না। পি-এইচ-ডির থিসিসের ধাক্কা সামলাতেই জান কাবার। কবিতা লিখবো কখন? বই নিয়ে গেলাম—আমার প্রকাশিত ৫টি কাব্যগ্রন্থ। দেখলাম আসর বসেছে মন্দ নয়। আছে হরি উপাধ্যায়। ভারতীয়, বিহারী, বলছেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ চাকরি আর সাহিত্য—দুটো এক সঙ্গে হয় না। চাকার করলে কি রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র, শরৎচন্দ্র হতেন। আমাদের নতুন লেখকদের এখন সর্বত্রগামী হওয়া প্রয়োজন—তাদের নতুন নতুন এক্সপেরিমেন্ট করা দরকার—বড় লেখক হতে চাইলে ভালো পাঠক হওয়া প্রয়োজন। দেখছো ত কেমন পড়ে এঁরা। সেইজন্যই ও চাকরী ছেড়ে দিই মধ্যে মধ্যে। না করে যদি পারা যেত, তবে আরও ভালো হ'ত।

এলেন ঢাকার জহরুল হক। বঙ্গবাসী। আছে বাংলা ভাষা অনুরাগী বিদেশী

ছাত্র-ছাত্রী। আরও অনেক বঙ্গবাসী। কবিতা পড়লাম। সেই পুরানো উপদেশ। ছন্দে কবিতা লিখবে। বললেন, লিখেছো অনেক। লিখবে। লিখবে। আমি বললাম ১৯৪৪-এ কলিকাতা বেতার থেকে আপনি 'কঙ্কাবতী' কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন, মনে আছে ?

হ্যাঁ-হ্যাঁ—ঠিক তো। স্মরণশক্তি আছে তো বেশ তোমার।

শুনবো সেটা আজ।

বাইরে বরফ পড়ছে। সাদা সাদা পেঁজাতুলো। সূর্যের আলো পড়ে সে বরফ আরও সাদা দেখায়। স্বপ্ন জগৎ যেন।

—হাহাকার করে বেহায়া হাওয়ার বেহালাখানি
কঙ্কাবতী !
জানালার কাঁচে হানা দেয় তার অঝোর বাণী,
কঙ্কাবতী !
কোন্ কথা কয় ? তুমি কি শুনবে ?
শুনবে নাকি ?
আধো বিস্ময়, আধো সংশয়ে মেলবে আঁখি ?
কঙ্কা, জাগো—

তখনো অঝোর ধারায় বাইরে পড়ছে বরফ—পত্রহীন উইলো গাছের সারি।
আর ১৯৬৪-র সেই—ব্লুমিংটন।

এরপর আবার সুরঙ্গমা। অনুরোধক্রমে।
'ছোট ঘরখানি মনে কি পড়ে সুরঙ্গমা—'

মহৎ কবিতা—তার বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন—আবেদন সর্বত্র—সর্বকালগামী। এ কবিতা সেই দূর বিদেশ থেকে টেনে নিয়ে গেল সেই সুদূর বাংলায়—যেখানে চোখের জলের মত নদী—সবুজ গালিচার মত মাঠ—আর উতল-বিতল-নিতল-শীতল সন্ধ্যায় বর্শার ফলার মত ফুটে ওঠে একগুচ্ছ কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়া।

আর হাওয়া বয়—উতল হাওয়া।

রাতে টেলিফোন করে জানালাম, আপনার কবিতা বড় 'হোমসিক' করে তুলেছে। পড়াশোনা বন্ধ।

বাইরে বরফ পড়ছে—বেশ তো পড়ো না কবিতাই। লেখো।

বুদ্ধদেব বসুকে একজন বক্তা, মার্জিত অথচ যাকে ইংরেজীতে বলে 'স্কলারলি ওরেটর' হিসাবে দেখেছি ইণ্ডিয়ানা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কয়েকটি সেমিনারে।

এমনিতে লাজুক হলেও বক্তৃতামঞ্চে তাঁকে আমার মনে হয়েছে খাপখোলা তলোয়ার—ধারালো। এইসব সেমিনারে ভারতীয় মহাকাব্যের সমস্যা, আধুনিক বাংলা কাব্য, উপন্যাস ইত্যাদি সম্বন্ধে বলেছেন। তীক্ষ্ণ ছিল তাঁর তুলনামূলক মন্তব্য—যাকে বলে লাইভলী এবং শার্প। অতঃপর দেখলাম মে-ফ্লাওয়ার হোটেলে। ওয়াশিংটন ডি সি-র 'বার্ষিক এশিয়ান ফোকলোর কনফারেন্স'—জুন, ৩।৪।১৯৬৪-তে। বিশ্বের বহু বরেণ্য লোকবিজ্ঞানী যোগ দিয়েছিলেন এই কনফারেন্সে। বাংলার লোকসাহিত্য গবেষণাব অগ্রগতির উপর একটি প্রবন্ধ পড়লাম আমি (পরে এশিয়ান ফোকলোর পত্রিকা, ১৯৬৪-তে প্রকাশিত)। সভাপতি ডঃ রিচার্ড এম ডরসন। বক্তা ছিলেন বিখ্যাত বিখ্যাত লোকবিজ্ঞানী। ছিলেন এডউইন কার্কল্যাণ্ড এবং ভারত থেকে বুদ্ধদেব বসু। আমার প্রবন্ধে ছিল ঐতিহাসিক পর্যালোচনা অর্থাৎ সার্ভে। বুদ্ধদেববাবু লোকবিজ্ঞানী নন। কিন্তু বললেন :

আমেরিকা এসে আমার একটি লাভ—ডকটর ডরসনের সঙ্গে আলাপ। লোক-সংস্কৃতি যে কিভাবে আধুনিক সাহিত্যকে প্রভাবিত করে বা করতে পারে তার ইতিহাস আমাদের দেশে এখনো লিখিত হয় নি। আমার নিজের রচনাতেও জ্ঞাতসারে—অজ্ঞাতসারে আমি লোক-সংস্কৃতির 'মটিফ' - নিয়েছি—নিয়েছেন শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। একজন কবি গাল্পিক এবং ঔপন্যাসিকের এই লোক-জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে সাহিত্য রচনার সুবিধা হয় বইকি। নিশ্চয়ই হয়। আমি আশা করি এই প্রবন্ধের লেখক আমাদের কাব্য-উপন্যাসে এই মটিফগুলি কিভাবে এসেছে, ভবিষ্যতে একটি সমীক্ষা বা সার্ভে করবেন।

এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন তদানীন্তন দূতাবাস থেকে (ওয়াশিংটন) ডকটর সুরত আলী খান—এডুকেশনাল এটাচী—বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত ও ঢাকায় অবস্থানরত। তিনিও চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছিলেন বাংলার লোকজীবনের উপর। বাজানো হয়েছিল বাংলাদেশের লোক-সংগীতের উপর টেপ—রানিং কমেণ্টারী সহ। তন্ময় হয়ে শুনলেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁর পূর্ববাংলার গান। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যে-সাহিত্যে গল্পে-উপন্যাসে নোয়াখালী, কুমিল্লা, ঢাকা, যেখানে কেটেছে জীবনের দীর্ঘ অবসরগুলি, কি নেই ?

বাংলাদেশেরই বিচিত্র জীবন আর মানুষ তার সঙ্গে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা আর আত্মভাবনা—এই কি আমরা দেখিনি তাঁর গল্প-উপন্যাস সাড়া (১৯৩০), আমার বন্ধু (১৯৩৩), সূর্যমুখী (১৯৩৪), লাল-মেঘ (১৯৩৪), ঘরেতে

ভ্রমর এলো (১৯৩৫), কালোহাওয়া (১৯৪২) প্রভৃতিতে ? এর মধ্যে ভোজনবিলাসী যে-সব নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে তারা কি নোয়াখালী, কুমিল্লা অথবা ঢাকা এবং পরবর্তী সময়ে শহর কলকাতায় তাঁর অভিজ্ঞতা আর পরিচিতির আলোকে পরিবর্ধিত হয়নি ?

বুদ্ধদেববাবু এর পর বাসা নিলেন ব্লুমিংটনের হোসিয়ার কোর্টের কাছে শিক্ষক-দের জন্য নির্মিত বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাপার্টমেন্টে। একদিন খবর দিলেন কলকাতা থেকে অনেক পত্র-পত্রিকা এসেছে—বিশেষ করে শারদীয়ার বিশেষ সংখ্যাগুলি। পড়তে চাইলে আনতে পারি। গেলাম একদিন সন্ধ্যায়—সঙ্গে বিহারের হরি উপাধ্যায় (এখন জর্জিয়ায় অধ্যাপক), কলকাতার মুকুল ব্যানার্জি, ঢাকার জহুরল হক, তার স্ত্রী মনিরা ও অধ্যাপিকা মাহমুদা খাতুন (এখন ঢাকা কলেজের অধ্যাপিকা)। দেখলাম আমেরিকার কেনা ঢোলা পাজামা আর সার্ট পরে তিনি বসে আছেন বারান্দায়। চোখ দুইটি দূরে নার্সভিলে লেকের দিকে প্রসারিত। ডানে টিপয়ের উপব অনেকগুলি বই—অধিকাংশই বিদেশী কাব্যগ্রন্থ বা তার ইংরেজী অনুবাদ। বললেন, ঢাকার কথা। পূর্বেও বহুবার বলেছেন। বহুবার। সেই পুরানা পল্টন, সেই টিনের বাড়ি, বৃষ্টি নামতো—অপূর্ব সেতার বাজতো টিনের চালে। আর রমনার ঐ ময়দান। বড্ড মনে পড়ে। বড্ড মনে পড়ে। শুনেছি তাঁর বিবাহের গল্প। ঢাকার মেয়ে রানু সোমের সঙ্গে কিভাবে বিয়ে হল। কবি নজরুল ইসলামের ঢাকায় অবস্থানের গল্প।

—আসুন না একবার।

—যাবো—যাবো—নিশ্চয়ই যাবো। আমি না গেলেও আমার আত্মা যাবে। ঢাকাকে কি তিনি ভুলতে পারেন ?

এসেছিলেন কি বুদ্ধদেববাবু ঢাকায় ? হ্যাঁ—সেই ১৯৭১-এর পঁচিশে মার্চের পর একদিন। তাঁর আত্মা এসেছিল। দেখে গিয়েছিলেন বিধ্বস্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর নিজের কথাতেই বলি :

ক'দিন থেকে জোর হাওয়া দক্ষিণ থেকে,
বাইরে ঝড়ধুলো আর শুকনো
পাতা, টেবিলের কাগজপত্র ছত্রখান—জোর
হাওয়া, যেমন বইতো মস্ত ফাঁকা
মাঠ পেরিয়ে পুরানা পল্টনে চৈত্র মাসের
সবুজ কোন সকাল বেলায়।

সবুজ হয়ে ছড়িয়ে আছে রমনা। আমার
উনিশ বছর বয়সের মত সবুজ।
শান্ত নির্জন রাস্তা দিয়ে আমি হেঁটে
চলেছি, আমার ডাইনে-বাঁয়ে বাগান
আর ছবির মত একটি দু'টি বাড়ী।
চুপচাপ -

* * *

আর আজ শুনছি, বিধ্বস্ত সেই বিদ্যাপীঠ।—

* * *

—কিন্তু আমি কি দিতে পারি বলো,
কোন্ উপহার পাঠাতে পারি তোমাদের জন্যে ? -

* * *

উপহার? কেন, রইলো তাঁর সাহিত্য, রইলো কাব্য। আর পুরানা পল্টনের সেই স্মৃতিমুখর সন্ধ্যাগুলি। যে পুরানা পল্টন, রমনা, ঢাকা তাঁকে কবি করেছিল। সাহিত্যের হাতে খড়ি। যেখানে তাঁর সাহিত্যিক আত্মা বিচরণ করবে—শত-সহস্র বৎসর।

জীবন্ত বুদ্ধদেব বসু

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

হাওয়াই থেকে একটি চিঠিতে বুদ্ধদেব বসু আমাকে লিখেছিলেন যে সেখানকার প্রকৃতি তাঁকে দারুণভাবে মুগ্ধ করেছে, অতিশয় গাঢ় রংয়ের আকাশ এবং সুসজ্জিত বৃক্ষরাজি থেকে চোখ ফেরানো যায় না। কিন্তু, তিনি লিখেছিলেন, আমার মুস্কিল হচ্ছে এই যে, এই সব সুন্দর দৃশ্য দেখলেও আমার কোনো না কোনো বিখ্যাত কবিতার লাইন মনে পড়ে, আমি ভুলতে পারি না, বিশ্বসাহিত্যের রত্নরাজি আমার মাথার মধ্যে ভিড় করে আসে। আমি শুধু সাহিত্যের মধ্য দিয়েই সব কিছু উপভোগ করি, এ ছাড়া নিছক সাদা চোখে কিছু দেখার ক্ষমতা আমার চলে গেছে! (এটা তাঁর চিঠির অবিকল ভাষা নয়)

আমার মনে হয়, এটাই বুদ্ধদেব বসুর সঠিক পরিচয়। তিনি চব্বিশ ঘণ্টা সাহিত্যের মধ্যেই বেঁচে থাকতেন, কখনো নিজের লেখায়, কখনো অন্যদের রচনায়। তিনি ব্যক্তি জীবনে মোটেই নীরস মানুষ ছিলেন না। বরং সদা ছটফটে এবং হাস্যময়, কিন্তু তাঁর রসিকতা এবং উপভোগের ব্যাপারগুলিও ছিল সাহিত্য সংক্রান্ত, অন্য কোনো রকম অসমীচীন কথাবার্তা তাঁর পছন্দ ছিল না। কখনো উৎসাহ দেখাতেন বটে মাছ বিষয়ে, বাঙালী রন্ধন প্রণালী সম্পর্কেও তিনি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু এই সব কিছুই সাহিত্য মনস্ক আগ্রহ। তিনিই একবার বলেছিলেন, মৌরলা মাছ কখনো শিশু, তরুণী বা বৃদ্ধা বা না—সব মৌরলা মাছই কিশোরী।

বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আমাদের অনেকেরই মতের মিল ছিল খুব কম। প্রায়ই বেশ ঝগড়াঝাটি হতো। যখন তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। তাকে কবিতা পাঠাতাম "কবিতা" পত্রিকায়, তিনি প্রতিবার সযত্নে উত্তর দিতেন, কিছু কিছু পরিবর্তনের পরামর্শ দিতেন—এতে মুগ্ধ হয়ে যেতাম।

এরপর যখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়, তাঁর বাড়ীতে যাওয়ার একটা অধিকার জন্মায়, আমরা যে-কোনো সময় হঠাৎ হঠাৎ গিয়ে হাজির হতাম। একবার আমরা কয়েক জন মিলে গিয়েছিলাম রাত সাড়ে এগারোটা বা তারও একটু পরে। একবার রাত দুটোর সময় শরৎ ওঁকে টেলিফোন করেছিল, এমনিই, ঝোঁকের মাথায়।

কেন এরকম যেতাম ? গেলেই তো ঝগড়া। উনি বরাবর অভিযোগ করতেন, আমরা ছন্দ জানি না। তখন ওঁর "শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর" বেরিয়েছে—সেখানে তিনি ছন্দকে একটু আলগা করে দিয়েছেন, পয়ারের কোনো কোনো পর্ব সাত মাত্রায় ছেড়ে দিচ্ছেন, অর্থাৎ তাঁর ঝোঁক সুরেলা করার দিকে। আর আমরা চাইছি কবিতাকে আরও আঁট করতে, কথ্য ভাষার ধ্বনি সরাসরি ঢুকিয়ে দিতে, হসন্তগুলি অগ্রাহ্য করে প্রথম পর্ব ন' মাত্রাতেও নিয়ে যেতে। আমরা বলতাম, আমরাও আপনার এই নতুন ছন্দ মানি না। তারপরেই বেধে যেত তুমুল তর্ক।

তবু কেন যেতাম ? তার কারণ, এখন বুঝতে পারি, বর্ষীয়ান কবিদের মধ্যে আর একজনও কেউ ছিলেন না তখন, যাঁর সঙ্গে ঝগড়া করার ব্যাপারেও আমাদের আগ্রহ থাকতে পারে। যাঁর কাছে আমরা নিজেদের কথাগুলি খোলাখুলি বলতে পারি। যিনি আমাদের যুক্তি না মানলেও আমাদের অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করবেন না। আর সবাই ছিলেন বড় দূরে, দেখা হলে বড় জোর একটু ভদ্রতার হাসি, কিংবা প্রচ্ছন্ন ভৎসনা। বুদ্ধদেব বসু ছিলেন আমাদের মধ্যে সব সময় জীবন্ত।

শেষ জীবনে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তেরই শেষ জীবনে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে বেশ একটা হৃদ্যতা হয়েছিল। স্বভাব-কুড়ে বুদ্ধদেবকে প্রায়ই দেখা যেত সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে আড্ডায়। যেহেতু সংযোগকারী হিসেবে অনেক সময়েই থাকতো আমাদের বন্ধু জ্যোতির্ময় দত্ত, তাই অনেক সময় সেই আড্ডায় যোগদান করার সুযোগ পেয়েছি। এই দুই কবির আলাপচারি, একই সঙ্গে পরিহাস ও রঙ্গরসের সমন্বয়, আমাদের বহু সন্ধ্যাকে স্মরণীয় করেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার অনুরাগী নই, বুদ্ধদেব বসুরও কবিতার চেয়ে গদ্য রচনাই আমার বেশী পছন্দের—তবু। এঁদের কাছে গিয়ে মনে হতো খুবই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের কাছে এসেছি। সামান্য লেখালেখি সুরু করার পর, নিজের বাবা-কাকা-মামা জ্যাঠাদের সঙ্গে সম্পর্ক আলগা হয়ে গেছে, দেখা সাক্ষাৎ অনেক কমে গেছে, কিন্তু আস্তে আস্তে অনুভব করেছি, অদৃশ্যভাবে রয়েছে একটি বিশাল পরিবার, সেই পরিবারে আমরা কেউ খুব ছোটো, অনেকে বড়, কিন্তু রক্তের সম্পর্ক অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

দুগ্গো দুইয়ের বাড়ি থেকে একদিন বেশ রাত্রে ফিরছি, উনি সিঁড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, যে কোনো কারণেই হোক সিঁড়িতে আলো ছিল না। উনি বললেন, অন্ধকারে—

কথাটা আমার মনে আছে, কারণ উনি, 'অন্ধকারে' এই পর্যন্ত বলে একটু থেমে ছিলেন, আমি সচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম—উনি তখনও থেমে আছেন দেখে আমি বলেছিলাম, আচ্ছা যাই। উনি আবার বলেছিলেন, অন্ধকারে দেখে দেখে যেও।

অতি সাধারণ সামান্যই কথা, তবু মনে আছে এই জন্য যে উনি অন্ধকারে বলে থেমেছিলেন।

আমাদের ঋণ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

'তাঁর অনতিবর্ধ' শরীরে বজ্র কঠিন দাঢ্য লেখা আছে,—অনেকটা এই রক ভাষায় বর্ণনা পড়েছিলাম কল্লোল যুগ গ্রন্থে। একটু শক্ত কথা চট করে মানেট বোঝা যায় না, তা ছাড়া তখনো বুদ্ধদেব বসুকে চোখে দেখি নি। চোখে দেখার পর বুঝতে পেরেছিলাম তিনি একজন ছোটখাটো চেহারার মানুষ। লাজুক এব সাহসী। কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গিয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন যে-কোন সময়ে গলার আওয়াজ উচুঁতে উঠে যায়। এবং মাঝে মাঝেই, কিংব প্রায়ই, তিনি অসম্ভব জোরে হেসে ওঠেন। তিনি সেই হাসি সঞ্চারিত করে দে অন্যদের মধ্যে।

না, আমার ভুল হচ্ছে। ওঁর সম্পর্কে আমি বর্তমান ক্রিয়াপদ ব্যবহার করছি কিন্তু বুদ্ধদেব বসু আর বেঁচে নেই। মৃত্যু এই পৃথিবীর একটি বিরল সত্য ঘটনা তবু বিশ্বাস হয় না।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'কল্লোল যুগ' যখন প্রকাশিত হচ্ছিল 'পূর্বাশা' পত্রিকায় আমরা দুর্দান্ত আগ্রহ নিয়ে পড়তাম। যে-সমস্ত লেখকরা তখন আমাদের দেবতা যাঁদের তখনো চোখে না দেখেও পৃথিবীতে সবচেয়ে আপন মনে হয়, তাঁদে জলজ্যান্ত জীবনের কথা কি আশ্চর্য সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে ঐ গ্রন্থে। আমর তখন সদ্য কলেজীয় যুবক, একটু লেখালেখি শুরু করেছি, চায়ের দোকানে বন্ধুবান্ধবদের কবিতা শোনাই—কিন্তু কোনো চিত্রতারকা বা রাজনৈতিক কিংবা ফুটবল বা ক্রিকেট খেলোয়াড়ের জীবন সম্পর্কে তেমন আগ্রহ বোধ করি বরং অদম্য কৌতূহল ছিল সেই সব লেখকদের সম্পর্কে, যাঁরা আমাদের করে রেখেছিলেন।

বুদ্ধদেব বসুকে চাক্ষুষ দেখার আগেও তাঁর সম্পর্কে অনেক খুঁটিনাটি আমাদে সংগ্রহে এসে যায়। এর মধ্যে সব কিছুই যে গৌরবজনক, তা নয়। একট বয়েস থাকে যখন সম্মানিত ব্যক্তিদেরও খানিকটা হেয় করে এক ধরণের আনন পাওয়া যায়। যাঁরাই প্রতিষ্ঠিত এবং বিখ্যাত—তাঁদের নামে নানারকম সত্য মিথে গল্প জুড়ে একটু ছোট করতে পারলে অংহকারে বাতাস লাগে, তাছাড়া, বিখ্যাত

ব্যক্তিদের সম্পর্কে অনেক রকম গুজব প্রচলিত থাকেই। আমরা শুনেছিলাম, বুদ্ধদেব বসুর মতন অহংকারী মানুষ নাকি আর দুনিয়ায় দুটি নেই, বাড়িতে কেউ গেলেই উনি বিলিতি কুকুর লেলিয়ে দেন। পরে দেখেছি, ওঁর মতন খাঁটি অর্থে ভদ্রলোক খুব কমই আছে এবং ওঁর বাড়িতে কেউ গেলে সচরাচর উনি নিজেই দরজা খুলতেন। বিলিতি কুকুর কখনো দেখি নি। তবে একটি শান্ত ও কবি কবি মুখের দেশী কুকুর আছে, প্রতিভা বসুর পোষ্য। এই কুকুর প্রসঙ্গে একটি লম্বা গল্প আছে, যার শেষ দিকটা মর্মান্তিক রকমের।

বুদ্ধদেব বসু সারাজীবন বহু নিন্দেমন্দ সহ্য করেছেন। প্রায় বালক বয়েসেই বিখ্যাত হয়েছেন এই কারণে—এবং শেষ জীবন পর্যন্ত, বহু কটূক্তি বর্ষিত হয়েছে তাঁর দিকে। এই নিন্দুকদের মধ্যে একদল, বলাই বাহুল্য, ঈর্ষাপরায়ণ অক্ষম, আরেকদল, রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, এবং আর একটি দল, আমার দৃঢ় ধারণা, যাঁরা বুদ্ধদেব বসুকে ঠিক মতন চিনতে পারেন নি এবং নানারকম গুজবে বিশ্বাসী হয়েছেন।

যখন বুদ্ধদেব বসুকে চিনতাম না, তখন থেকেই অন্যদের সঙ্গে প্রায়ই দারুণ তর্ক করতাম বুদ্ধদেব বসু বিষয়ে। আমাদের মনোভাব অনেকটা এ রকম ছিল, আমরা নব্য লেখক, আমরা পূর্ববর্তী লেখকদের সম্পর্কে যা-খুশী বলতে পারি, কিন্তু অন্যরা কেন বলবে? সেই সময়ে ছাত্র মহলে সাম্যবাদের দিকে দারুণ ঝোঁক, আমরাও ছিলাম—কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্কটা কেউই স্পষ্টভাবে বোঝাতে পারেন নি। এক একজন এক-এক রকম কথা বলতেন, অতি উগ্ররা রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া, তারাশঙ্করকে প্রতিক্রিয়াশীল এবং বুদ্ধদেব বসুকে উন্মার্গগামী কিংবা দুর্নীতিগ্রস্ত আখ্যা দিয়েছেন। একজন লেখক নিজেদের দলে নয় বলেই তার সাহিত্য মূল্য খর্ব করার চেষ্টা আমার কাছে বরাবরই ঘৃণ্যকারজনক মনে হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, বুদ্ধদেব বসু একজন প্রকৃত সাহসী লেখক—কোনো হীনতার কাছে মাথা নীচু করেন নি কখনো। একবার মাত্র তিনি ফ্যাসী বিরোধী লেখক সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তারপর আর জীবনে কখনো কোনো রাজনৈতিক দল—বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজের নাম জড়ান নি। তিনি সাম্যবাদী দলে বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু তাই বলে কখনো ক্ষমতাসীন শাসক দলের ছত্র-ছায়াতেও গিয়ে দাঁড়ান নি। সুবিধা ভোগের চেষ্টা করেন নি কোনোদিন. হাওয়া বুঝে মত বদলান নি। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায়, একজন লেখকের পক্ষে রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকাই যে সম্মানজনক, তিনি তা দেখিয়েছেন।

তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের আগেই তাঁর বিষয়ে তর্ক করতাম কেন বিরোধীদের সঙ্গে?

তার কারণ, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে তিনিই একমাত্র লেখক, যিনি সব সময়ে আমাদের ব্যস্ত রেখেছিলেন। ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার বেশী প্রিয়, কবি হিসেবে জীবনানন্দ দাশকে অনেক বেশী ভালোবেসেছি হয়তো—কিন্তু সব মিলিয়ে, সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে বুদ্ধদেব বসু আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয়। তিনি সব সময়েই কিছু না কিছু একটা কাণ্ড করেছেন। এবং তিনি কখন কি লিখেছেন—তার দিকে লক্ষ্য না রেখে উপায় নেই। তাঁর যে-কোনো নতুন লেখাতেই তিনি প্রকৃতপক্ষে কোনো না কোনো উপায়ে নতুন। তারাশঙ্কর তাঁর শেষের দিকের উপন্যাসগুলিতে আমাদের অনাগ্রহী করে তুলেছিলেন—ভালো বা খারাপের প্রশ্ন নয়, নতুনত্ব ছিল না। বুদ্ধদেব বসুর কল্লোলের বন্ধুরা প্রায় তো লেখা থামিয়েই দিয়েছেন, কিন্তু বুদ্ধদেব বসু শেষ পর্যন্ত সজীব থাকতে পেরেছিলেন বলেই স্থবির হন নি। অকস্মাৎ এক সময় তিনি কবিতা উপন্যাস ছেড়ে মন দিলেন অনুবাদে, বদলেয়ার, রিলকে, হেল্ডর্লিন, এদিকে কালিদাস—অনুবাদের জন্য যে কতখানি নিষ্ঠা লাগে, স্থাপন করলেন তার দৃষ্টান্ত। অনুবাদ ছেড়ে আবার উপন্যাসে, বাধালেন একটা হই হই কাণ্ড। ফের শুরু করলেন নাটক ও কাব্য নাটক। সেই নিয়ে কিছুদিন কাটলো। কাব্যনাটকগুলি সবে মাত্র একঘেয়ে হতে শুরু করেছে, আমরা বুদ্ধদেব বসুকে খরচের খাতায় লিখবো লিখবো করছি, এমন সময় দুম করে আরম্ভ করলেন মহাভারতের কথা—ঐ দুর্ধর্ষ বাংলা গদ্যের দিকে মনোযোগ না দিয়ে উপায় আছে! এবং প্রায়ই একই সঙ্গে লিখতে লাগলেন পর্বে পর্বে তাঁর আত্মজীবনী, রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা ও জীবন স্মৃতির পর—এই ধরনের এমন মধুর রচনা আমি আর পড়ি নি।

বুদ্ধদেব বসু ছিলেন পুরোপুরি সাহিত্যিক। তিনি আমাদের দেখিয়ে গেলেন যে অন্যান্য পেশার মতনই সাহিত্যও একটি অতি পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার এবং একজন লেখককে পাঠক হিসেবেও কত খাঁটি হতে হবে। দিনেব মধ্যে ষোলো থেকে আঠেরো ঘণ্টা পর্যন্তও তিনি পড়াশুনো ও লেখালেখির মধ্যে ডুবে থাকতেন, বিদেশী সাহিত্যের প্রচণ্ড অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও খবর রাখতেন সাম্প্রতিকতম বাংলা রচনার। আমাদের মতন ক্ষুদ্র লেখকদেরও তিনি ডেকে ধমক দিতেন, লেখার ত্রুটি নির্দেশ করতেন, তাতে আমাদের শ্লাঘার বিষয় এই ছিল যে, আমরা একেবারে মনোযোগের অযোগ্য হই নি।

বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে অনেক বিষয়েই আমার মতের মিল না হওয়ার কথা। সাহিত্য কিংবা জীবন বিষয়ে আমরা ভিন্ন ধারণা পোষণ করেছি, ওঁর নির্দেশ অধিকাংশ সময়েই মানিনি। তবু, কখনো মুখে মুখে তর্ক করতে পারিনি—কারণ,

আমার দুর্বলতা এই, যে লেখকের রচনা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি, অভিভূত হয়ে থেকেছি, তাঁর মুখোমুখি এসে কখনো স্বাভাবিক হতে পার নি, আড়ষ্টতা থেকেই যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বা তারাশঙ্করের সঙ্গে আমার তেমন সাক্ষাৎ পরিচয়ই হয়নি, প্রেমেন্দ্র মিত্র বা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে কখনো জানাবার সুযোগ পাই নি যে এক সময় ওঁদের রচনা আমাকে কত পাগল করেছে। বুদ্ধদেব বসুও শেষ পর্যন্ত আমাকে একটি অবাধ্য যুবক হিসেবেই জেনে গেলেন।

অথচ, 'অন্য কোনো খানে' কিংবা 'মৌলিনাথ' প্রভৃতি উপন্যাস যখন প্রথম পড়েছি, কয়েকটা দিন বিহ্বল হয়ে থাকতাম—হাত খরচের সামান্য পয়সা বাঁচিয়ে সেই সব বই কিনে বন্ধুবান্ধবদের পড়াতাম—যে-কোনো সুন্দর জিনিস যেমন সবাই মিলে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে হয়, আমি যা পেয়েছি, আমার প্রিয় কেউও যদি সেটা না পায়, তা হলে যেমন আশ মেটে না। 'মৌলিনাথ' বইখানি আমি তিন কপি কিনেছিলাম। পরবর্তীকালে কারুর কারুর মুখে শুনেছি, ওটা উপন্যাসই নয়। বুদ্ধদেব বসুর প্রায় সমস্ত উপন্যাস সম্পর্কেই এ রকম মন্তব্য করেছেন কোনো কোনো সমালোচক। সমালোচকরা এ সব ব্যাপার নিশ্চয়ই ভালো জানেন, কিন্তু আমি কি করে অস্বীকার করবো, বুদ্ধদেব বসু যে-জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, তা আমাদের বুদ্ধিনির্ভর এক স্বপ্নের জগত, যেখানে উদ্ভাসিত হয় সুন্দরের একটি অংশ—হয়তো খুবই রোমান্টিক, কিন্তু ভাষা শিল্পের যে এক একটি সুন্দর প্রতিমা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আজকাল দাবি উঠছে, উপন্যাসকে সমাজ সচেতন হতে হবে, তার মধ্যে মানুষের মঙ্গল কিংবা শ্রেণী বৈষম্য দূর করার কথা থাকা উচিত—এ সবই ঠিক কথা। কিন্তু বিশ্ব সাহিত্য এখনো দাঁড়িয়ে আছে লেখক শিল্পীদের রোমান্টিকতার ওপরে, এবং ওতেই যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই! জানি, বুদ্ধদেব বসু তার মধ্য বয়েস পর্যন্ত যে সব উপন্যাস ও গল্প রচনা করে গেছেন, সেই ধারায় এখন আর কেউ লিখবে না—তিথিডোর বা নির্জন স্বাক্ষরের সেই চুপ-চাপ মন্থর গতি, সেই সব স্পর্শকাতর ভাবুক মানুষরা হারিয়ে যাবেন, তবু সে জন্য আমার অন্তত দুঃখ বোধ থাকবেই। অনেক সার্থক উপন্যাস পড়ব ভবিষ্যতে, বাহবাও দেবো, কিন্তু ঐ সৌন্দর্যের স্বাদ আর পাবো কি ?

বুদ্ধদেব বসুর কাছে আমাদের সবচেয়ে বেশী ঋণ কবিতার জন্য। যাকে আমরা এখনো আধুনিক কবিতা বলি সেই আধুনিক কবিতাকে তিনি একাই তিতিয়ে দিয়ে গেছেন। আরো অনেক বড় বড় কবি এসেছেন

রবীন্দ্রনাথের পরে কিন্তু সকলের হয়ে লড়াই করেছেন বুদ্ধদেব বসু। 'আধুনিক কবিতা' ছাড়া অন্য যে কবিতার ধারা, সাধু ক্রিয়াপদ ইত্যাদি—সেটি এখন হেরে গেছে নিশ্চিতভাবে। এটা বুদ্ধদেব বসুর একক কৃতিত্ব যে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জীবনানন্দ দাশ যখন প্রায় অপরিচিত, তখন বুদ্ধদেব বসু অবিরাম প্রবন্ধ ও আলোচনায় লোক সমক্ষে এনেছেন তাঁকে। একজন কবি আর একজন জীবিত কবি সম্পর্কে এ রকম উৎসাহ নিয়ে লিখেছেন, এ দৃষ্টান্ত বিরলের চেয়েও বিরল। শুধু জীবনানন্দ নয়, তিনি ঐ রকমই লিখেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পর্কে। অন্যরা অবশ্য বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে প্রায় কিছুই লেখেন নি, অথবা যৎসামান্য, কিন্তু তিনি তো সে বিষয়ে চিন্তা করেন নি কখনো।

তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছেন নবীন কবিরা। কবিতা পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরবর্তীদের যে কত ক্ষতি হয়েছে, তার পরিমাণ নির্ণয় করা শক্ত। একজন নবীন কবি কি করে জানবেন যে তার কবিতা সক্ষমতার সীমা-রেখাটা স্পর্শ করেছে কিনা? কবিতা পত্রিকা ছিল সেই মানদণ্ড। বুদ্ধদেব বসুর মতন একজন কবির কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার পর আত্মবিশ্বাস অনেক দৃঢ় হয়।

কবিতা পত্রিকা সম্পাদনার সময়ে তাঁর নিষ্ঠা ছিল তুলনাহীন। প্রত্যেকটি চিঠি তিনি নিজের হাতে উত্তর দিতেন। এবং অবিশ্বাস্য দ্রুতভাবে। আমরা একটা কবিতা তাঁর ঠিকানায় ও ডাক বাক্সে ফেলে পরের দিনই উত্তর পেয়ে যেতাম। কবিতা ভবনের ছাপ আঁকা খামে তাঁর খয়েরি কালিতে লেখা হাতের লেখা দেখলেই আমাদের বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠতো।

এই প্রসঙ্গে একটু ব্যক্তিগত কথা বলি। 'কবিতা' পত্রিকায় পাঠানো আমার প্রথম কবিতাটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন একটুখানি বদলে। সেই বদলটুকু আমার পছন্দ হয়নি। পরে আর একটি সংকলনে সেটি অন্তর্ভুক্ত হলে আমি আবার সেটি নিজের মতন করে দিই। এর দু'তিন বছর বাদে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় এক সভায়—সেখানে তিনি আমার পরিচয় পেয়েছিলেন অন্যভাবে, আমি ও'র এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের মেয়ের প্রাইভেট টিউটর ছিলাম। পরে জিজ্ঞেস করলেন, ও, তুমিই কবিতা লেখো? তোমার চেহারা দেখলে তো তা বোঝা যায় না। এই বলে তিনি এত জোরে হাসলেন, যে-রকম আমরাও সহজে হাসতে পারি না। তারপর, আমার সেই কবিতাটিতে

ও'র সংশোধন আমি মানিনি কেন সে কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি সঠিক উত্তর দিতে পারি নি। আসলে সেটা আমার গোঁয়ার্তুমি ছাড়া আর কিছু না। এর পরে আমি আর একটা কবিতা পাঠাবার পরেই তিনি সেটা ফেরৎ দিয়ে জানালেন, এই কবিতাটিকে কিছু কিছু বদল দরকার।

আমি চুপচাপ চেপে গেলাম। এর বছর খানেক পরে আবার এক জায়গায় দেখা, উনি কথা প্রসঙ্গে বললেন, তুমি আর লেখা পাঠাও না কেন? আমি ব্যগ্র হয়ে বললাম, পাঠাবো? আপনি অনুমতি দিলেই পাঠাতে পারি। উনি আবার সেই রকমভাবে হাসলেন। বাড়ি, ফিরেই আমি আবার সেই পুরোনো কবিতাটাই একটুও না বদল করে পাঠালাম। এই রকমভাবে সেই একই কবিতা আমি 'কবিতা' পত্রিকায় পাঠিয়েছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল। এটা আমার একটা নিতান্ত ছেলেমানুষী জেদ। এই ঘটনাটার উল্লেখ করলাম এই কারণে যে কতখানি উদারতা থাকলে এই ধরনের ঔদ্ধত্য এবং মূর্খামি সহ্য করা যায় তা বোঝা যাবে। উনি তো আমার কবিতাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার লেখা ছাপা বন্ধ করে দিলেই পারতেন। উনি আমাদের প্রতি মনোযোগ দিতেন বলেই আমরা মনোযোগ দিয়ে ও'র কথা শুনতাম। এ রকম ব্যবহার তো আর কারুর কাছে পাইনি। পরবর্তী কালে ও'র কথা শুনে আমি অনেক কবিতা সংশোধন করেছি। একই ক্রিয়াপদ দিয়ে যে পর পর দুটি বাক্য শেষ করা উচিত নয়, এটা ওঁর কাছ থেকেই প্রথমে শিখি। খুবই সামান্য ব্যাপার—কিন্তু নবীন লেখককে তো কারুর এটা বলে দেওয়া দরকার।

বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর স্থান নেবার মতন কেউই রইলেন না। পরবর্তী কালের লেখকদের পক্ষে এটা এক বিরাট ক্ষতি। বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যাদর্শে কারুর বিশ্বাস থাক বা না থাক, যে বুদ্ধদেব বসুর সব রচনা পড়বে না, সে বাংলা ভাষার অনেক কিছুই শিখবে না। সে দরিদ্র থেকে যাবে।

এলেজি : বুদ্ধদেবের স্মৃতির প্রতি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

তোমার নিকটে এসে বৃক্ষের ভরসা পেতো কবি, ছায়া পেতো, সচ্ছলতা পেতো
সুন্দর, নির্ভরযোগ্য কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হিমানী পেতে-পেতে মনে হয়
আজো পাবো সহসা সন্ধ্যায়, ক্ষণকাল, ব্যস্ত তুমি, সৃজনের শান্ত কবি তুমি
তাও স্বচ্ছ নিমন্ত্রণ, এসো এসো, কী খবর বলো, সুনীল কেমন আছে তারাপদ,
আত্মীয়স্বজন ?
সকলে নিশ্চিত ভালো, যতোখানি ভালো থাকা যায়
নষ্ট ফল, ভিতরে গভীর কীট—মানুষের সকল হৃদয়ে ছোটো ও সংক্ষিপ্ত দুঃখ
কিন্তু তুমি, প্রান্তর যেমন সীমাহীন, পারহীন সমুদ্রের আলেখ্য যেমন
তেমনই অব্যর্থ, দীর্ঘ, কবিতার অগ্রজ কুসুম
তোমার হাসির তীব্র বাল্যকাল আমাকে ছুঁয়েছে
ভিতরের ভূ-কম্পনে স্থাপিত ভ্রান্তির ভাঙা ইট গুঁড়িয়ে হয়েছে ধুলো
যতগুলো পথ ছিল উঁচুনিচু সংহত হয়েছে ছন্দে, আনন্দে আনন্দে
কেটে গেছে কতদিন। এখন কীভাবে যাবে ? কোন্‌ভাবে যাবে ?
তবু যায়। সমুদ্রের মৌনতা নিয়ে শোকযাত্রা চলে গঙ্গাতীরে…
শান্ত ও ঘুমন্ত মুখ কবিতার নীরব ভাষায় কথা বলে শোনা যায়—
কোনো কোনো শোকসঙ্গী শোনে
পাথরের চোখে জল, মনে হয় ধুলোই পড়েছে !
জল, নুন, দারুণ দুকূলে জয়, ধ্বংস হলো কলকাতা শহর এইমাত্র
জলে গেলো চিৎকারে, কাঙের হাতে, ক্রন্দনে সমস্ত ঘরবাড়ি
একি অকস্মাৎ যাওয়া, ঘর ছেড়ে পরের দুয়ারে !
স্বর্গ তো আপন নয়, তোমার নিজস্ব স্বর্গ ছিলো
ছেড়ে গেলে, কিন্তু কেন গেলে ?

শেষ দিনটি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমি কখনো কোনো শোকমিছিলে যাই না। শুধু, সুধীন্দ্রনাথ মারা গেলে তাঁর শবের অনুগামী হয়েছিলুম। তাঁর ছাত্র ছিলুম তখন, যাদবপুরে। বুদ্ধদেব আমাদের বিভাগের প্রধান ছিলেন তখন। তারপর অনেকেই দেখেন—প্রায় সকলেই অপ্রত্যাশিতভাবে গেলেন। নারায়ণবাবু চলে গেলেন, শান্তিদা—শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় চলে গেলেন হঠাৎ, নরেনদা গেলেন। তার কিছুকাল আগেই গেছেন বুদ্ধদেব। শেষ গেলেন অচিন্ত্যকুমার আর ঋত্বিক। এরা আমার চেনাশুনো, আপনার জন। আপনার জনের এই হঠাৎ-যাওয়া আমি সহ্য করতে পারি না। কিন্তু, সহ্য করতেই হয়। আমি শুধু যা পারি, তা এই শবানুগমনে না থাকা। শ্রাদ্ধ শান্তিতে যোগ না দেওয়া। পালিয়ে যাওয়া মানুষেরসঙ্গে আমার কোনো সংশ্রব না থাকুক– এই চাই।

বুদ্ধদেব নেই - আকাশবাণী থেকে প্রচারিত সংবাদটুকু শুনে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছি—তখন সকাল। জানালা-দরোজা বন্ধ করে অন্ধকার বানিয়েছি। শুয়েই ছিলাম, আমার বন্ধুরা এসে জোর করে নিয়ে গেলো। যামিনী রায়ের পুত্র মনিদা ছিলেন, গাড়ি নিয়ে। তাঁর সঙ্গে আমি আর নিখিল নাকতলা যাই। সেখানে পৌঁছেই সব মানুষের অবনত মাথা আর ফুলগন্ধ আমাকে ভীষণ জব্দ করে। থেকে তাঁর ঘুমন্ত মুখশ্রী দেখিনি। সেখানে স্তব্ধতা আর মানুষের অসহনীয় ভিড়। কাউকে কাঁদতে দেখলেই আমার চোখে জল এসে পড়ে। বুকের ভেতরটা কেমন খালি-খালি লাগে। যেখানে সবার চোখে জল, মুখ বিষাদ-থমথমে, আমি সেখানে দাঁড়াতে পারি না। কেন এলুম? নিজেকে ভর্ৎসনা করতে থাকি, মনে মনে। অসহ্য এক বেদনার নীলরঙ আমার মুখেচোখে জুড়ে বসে। আমরা এক ঝলক তাঁকে দেখে, পাশে দেবব্রতর ফ্ল্যাটে চলে যাই। সেখানে গিয়ে অবিরাম সিধুপান চলে। গান হয়, চোখ জলে ভাসে—ওঁর সম্পর্কে কথা একেবারেই হয় না। যেন এক সমূহ দৃশ্য থেকে উদ্ধার পেয়ে, স্মৃতি থেকে পার—আমরা গলাধঃকরণ করতে থাকি অগ্নি। যা তাঁকেও, কিছুকাল বাদে, বৃত্তাকারে ঘিরে ধরবে। অনুমান করি।

কিছুক্ষণ বাদে স্টেটসম্যান কাগজের অরণি আসেন। নরেশ গুহ তাঁকে বুদ্ধদেব সম্পর্কে রচনা তৈরি করতে সাহায্য করেন। আমরা মাঝেমধ্যে শুনি। অরণির হাতের কাগজ পুড়ে যায় অকস্মাৎ। আমাদের মনে হয়, তিনি তাঁর সম্পর্কে কোনোরকম রচনাই চান না। আমরা, ঐ ঘটনার পর, কেমন অন্যরকম হয়ে যাই। অরণি আবার শুরু করেন। নরেশদাকে বলি : এমন কোনো কথা বলবেন না যাতে ওঁকে আবার কাগজ পুড়িয়ে দিতে হয়।

সারাদিন আমরা আর ঐ খুপরি থেকে বেরুই না। কেউ কেউ বেরোয়। আমি, নিখিল আর মনিদা ঠায় বসে থাকি। সন্ধ্যে নাগাদ ওরা কেওড়াতলা যায়, আমাকেও যেতে হয়। না যাওয়াই ভালো ছিলো। সেখানে আমি, পরে শুনেছি, প্রচণ্ড গোলযোগ করেছি—যাতে কিছুতেই অগ্নি তাঁকে স্পর্শ না করে—আমি এমন দাবি করছিলুম পাগলের মতো। বলেছিলুম, ওঁর দেহ আমাদের দিয়ে দেওয়া হোক, আমরা কাছে রাখবো।

পাগলের কথা কেউ শোনে নি। প্রতিবাদে সমস্ত পাগল স্থানত্যাগ করে সেদিন।

বুদ্ধদেবের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ প্রায় বিশ বছরের। বিশবছরের স্মৃতি একটি সার্থক পাহাড়। এখানে সেই শেষদিনটির সামান্য চিত্র তুলে ধরা হলো।

যে-আঁধার আলোর অধিক' প্রসঙ্গে

প্রণবেন্দু দাসগুপ্ত

বুদ্ধদেব বসুর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের তুলনায় 'যে-আঁধার আলোর অধিক' বহুলাংশে স্বতন্ত্র। যে-প্রেম ও প্রেমজ কামনা 'বন্দীর বন্দনা' থেকে 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' পর্যন্ত প্রতিটি কাব্যগ্রন্থের প্রধান উপজীব্য তা 'যে-আঁধার আলোর অধিকে'ও কিঞ্চিদাধিক উপস্থিত; এবং এই গ্রন্থের প্রধান বিষয়-সূত্র, শিল্প-ভাবনা বা শিল্প-চেতনা বুদ্ধদেব বসুর পূর্ববর্তী কবিতার-বইগুলিতেও একেবারে অনুপস্থিত নেই। তাহ'লে? এ-বিষয়ে নতুন ক'রে ভাবতে গিয়ে মনে হ'ল যে, তাঁর পুরোবর্তী কবিতার আবেদন মূলত আবেগ গ্রাহ্য। ভালো কবিতামাত্রই, অন্ততপক্ষে প্রাথমিক স্তরে, অনুভূতিগোচর ও আবেগগ্রাহ্য; 'যে-আঁধার আলোর অধিকে'র কবিতাও তা-ই। কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে, এই অলক্ষণীয় আবেগগ্রাহ্যতা ছাড়াও আলোচ্য বইটিতে এমন একটি আয়তন আভৃত হ'য়ে আছে যাকে বহুলাংশে বুদ্ধিগ্রাহ্য বা ধারণাগ্রাহ্য বলা চলে।

এমন একাধিক বিষয়বস্তু ও থীমের প্রসঙ্গ আমরা মনে করতে পারি যা একই সঙ্গে 'যে-আঁধার আলোর অধিক' এবং প্রাগ্বর্তী কোনো কাব্যগ্রন্থে উপস্থিত। 'দময়ন্তী'-র 'বিচিত্রিত মুহূর্ত' অংশের "ছন্দ" কবিতাটি থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

> আমার বিশ্বের জন্ম তোমার লীলায়,
> তোমারই চকিত স্পর্শে কেঁপে ওঠে কল্পনার শ্রোণী,
> কবিতার জন্ম হয়।
> আমার হৃদয়
> পূর্ণ করে তুমি আজ এলে
> বৃষ্টি-ঝরা রাত্রিতে পা ফেলে
> ঝঙ্কারে, নিক্কনে…।

প্রায় একই বিষয়ে 'যে-আঁধার আলোর অধিক' থেকে উদাহরণ :

> দেবতা, নির্জ্ঞান মন, নাকি এক চতুর শয়তান?
> তার মুখে অনন্ত রাত্রির মায়া। তাই সে করুণা ক'রে

পাঠিয়েছে প্রতিভূ, প্রবক্তা, দূত—ছন্দ, মিল, ধ্বনির ইশারা,
নিরঞ্জন-গণিত, আবহমান নিরুক্তের অমোঘ বিধান—
যার পূত শাসনে সঞ্চিত জল, নর্দমায় স্বেচ্ছায় না-ঝ'রে
হ'য়ে ওঠে অধীন, উদ্দেশ্যময়, উজ্জ্বল ফোয়ারা।

প্রথম কবিতাটিতে 'ছন্দ'কে তুলনা করা হয়েছে কোনো নটী বা নৃত্যপরা প্রণয়িণীর সঙ্গে, পায়ে যার নূপুর, বৃষ্টি-ঝরা রাত্রিতে যার ঝংকৃত অভিসার। শুধু তাই নয়, এই নারীরূপিণীর আবেদন আমাদের হৃদয়ের কাছে: 'আমার হৃদয় পূর্ণ ক'রে তুমি আজ এলে'। 'দময়ন্তী' (১৯৪০) প্রকাশের প্রায় আঠারো বছর পরে যখন 'ছন্দ'কে আবার সরাসরি কবিতার বিষয়বস্তু করা হ'লো, তখন সে আর নটিনী বা অভিসারিকা নয়—'নিরঞ্জন গণিত', যাকে রচনা করেছেন স্বয়ং ঈশ্বর বা চতুর কোনো শয়তান। অর্থাৎ, শেষের এই কবিতাটির আবেদন আমাদের আবেগের কাছে নয়, বা শুধুমাত্র আবেগের কাছে নয়; কবিতাংশটির বুদ্ধিগ্রাহ্য ও ধারণাগ্রাহ্য সূত্রটিই এখানে অনেক বেশি জরুরি। একইভাবে, 'দময়ন্তী' এবং 'যে-আঁধার আলোর অধিক' থেকে আরো দু-একটি সমধর্মী উদাহরণ সংগ্রহ করা যায়, যেমন, "কুকুর", আর "কোনো কুকুরের প্রতি", এবং "এখন বিকেল" আর "স্মৃতির প্রতি : ১" ইত্যাদি।

১৯৪৪-এ প্রকাশিত 'রূপান্তর'-এ উৎসর্গ-পত্রের কবিতাটিতে (কবিতাটি পরে 'দ্রৌপদীর শাড়ি'তে অন্তর্গত করা হয়) একটি জরুরি থীমের অবতারণা আছে। থীমটি হ'লো "রূপান্তর"—অর্থাৎ আমাদের কল্পনা এক বস্তুকে আরেক ব্যঞ্জনায় পাল্টে নেয় বা সৃজনী শক্তি শিল্পোপকরণকে উত্তীর্ণ করে গিয়ে, 'রূপান্তর'-এর প্রাথমিক অর্থ হ'লো এই। থীমটিকে জরুরী বলছি দু-টি কারণে: এক, বিষয়বস্তুটি যদর্থেই চিরকালীন, দুই, এই থীম নানাভাবে বুদ্ধদেব বসুর অনেক কবিতাতেই পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে:

ধাতুর সংঘর্ষে জাগো, হে সুন্দর, শুভ্র অগ্নিশিখা,
বস্তুপুঞ্জ বায়ু হোক, চাঁদ হোক নারী,
মৃত্তিকার ফুল হোক আকাশের তারা
জাগো, হে পবিত্র পদ্ম, জাগো তুমি প্রাণের মৃণালে

এবং এই বইটিরই আরেকটি কবিতা "সেতু"-র একটি পংক্তি—

পথ হ'লো নদী, রাত হ'লো দিদি।

কিন্তু, 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এ একই থীম ব্যবহৃত হচ্ছে সম্পূর্ণ বুদ্ধিগ্রাহ্য, গাণিতিক এক সমীকরণে—

ঘটায়, ঘোমটার তলে, মৌলিকের নিত্য রূপান্তর—
পদার্থের, চেতনায়, স্পন্দমান মাংসের, মানসে, ('সংবেদনী')

যে নারীবন্দনা ('মোহমুক্ত') বা নারীদেহের বন্দনা ("কিছুই প্রেমের মতো নয়") 'বন্দীর বন্দনা'তে (১৯৩০), বা 'কঙ্কাবতী'তে (১৯৩৭), 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এ তারই রূপান্তরিত অভিব্যক্তি :

হও ক্ষীণ, অলক্ষ্য, দুর্গম, আর পুলকে বধির।
যে-সব খবর নিয়ে সেবকেরা উৎসাহে অধীর,
আধ ঘণ্টা নারীর আলস্যে তার ঢের বেশি পাবে।'
('রাত তিনটের সনেট . ২')

শিল্পের জন্যই যে শিল্প, এই কলাকৈবল্যবাদ 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর একাধিক কবিতার বিষয়বস্তু। বুদ্ধদেব বসুর সাম্প্রতিক অন্যান্য রচনাকর্মও এই মতের সমানুপাতিক। দীর্ঘদিন আগে, 'দ্রৌপদীর শাড়ি'-র "স্বর্গ-মর্ত্য" কবিতাতেও বুদ্ধদেব লিখেছিলেন—

তাই মনে হয়, পৃথিবীতে
যা হচ্ছে তা হোক গে,
ঘুম না-এলে ল্যাম্পো জ্বেলে
বসি লেখার যক্ষে,
বাঁচতে হ'লে বাঁচি আমার
মন-বানানো স্বর্গে।

লক্ষণীয় যে, যথোচিত ব্যঙ্গের সঙ্গে বিষয়টির অবতারণা করেছেন লেখক, এবং কলাকৈবল্য সম্পর্কে লঘু কোনো মন্তব্য করাই তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর কোনো-কোনো কবিতায় এই একই থীম অনেক বেশি গম্ভীর এবং চাপল্যবিহীন। যেমন :

উদ্ধারের স্বত্বাধিকারী
ব্যতিব্যস্ত পাণ্ডাদের জগকম্প. চামর, পাহারা
এড়িয়ে আছেন তাঁরা উদাসীন, শান্ত, ছন্নছাড়া।
তাই বলি, জগতেরে ছেড়ে দাও, যাক সে যেখানে যাবে,
('রাত তিনটের সনেট: ১')

এ-পর্যন্ত আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, একই থীম ও বিষয় বুদ্ধদেব বসুর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে অনেক বেশি আবেগগ্রাহ্য ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ (একেবারে শেষের উদাহরণটি ছাড়া) কিন্তু 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর কবিতায়—তা মূলত বুদ্ধিগ্রাহ্য ও ধারণা নির্ভর। এখন আরো একটি সূত্র এই বক্তব্যের সঙ্গে

যোগ করে নিই : 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর অধিকাংশ কবিতাই একটি প্রধান থীমের অন্তর্গত ; প্রায় প্রতিটি কবিতাই পরস্পরের পরিপূরক—একটি কবিতায় যে-আলো জ্বলে ওঠে তারই সংস্পর্শে উদ্ভাসিত হয় পাশের কবিতাটি। এই প্রধান থীম বা বিষয়-সূত্র হ'লো : প্রকৃতি ও শিল্পের সম্পর্ক।

বুদ্ধদেব বসুর পূর্বের কবিতায় এই থীম যে একেবারে উপস্থিত ছিলো না তা নয়—১৯৪৮-এ 'দ্রৌপদীর শাড়ি'তেই "মায়াবী টেবিল" কবিতাটি আছে, যার প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই সোচ্চার শিল্পবন্দনা : 'তাহ'লে উজ্জ্বলতর করো দীপ, মায়াবী টেবিলে/সংকীর্ণ আলোর চক্রে মগ্ন হও'। কিন্তু ঐ একই বই থেকে এমন অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করা যায় যা এই শিল্পপ্রাণতার সম্পূর্ণ বিপক্ষে। পক্ষান্তরে, এক ধরনের শিল্পমনস্বতা, এবং আরো স্পষ্টভাবে বলা চলে যে শিল্প ও প্রকৃতির সম্পর্কজনিত থীমটি, 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এব প্রায় অধিকাংশ কবিতার প্রাণরস। শুধু তাই নয়, তিনি যে অপেক্ষাকৃত নতুনভাবে তাঁর শিল্প ও জীবনবিষয়ক অভিজ্ঞতাকে অনুধাবন করছেন তা এই কবিতার বইটি পড়লে স্পষ্টই বোঝা যায়। 'যে-আঁধার আলোর অধিক' প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৫৮-এর মে মাসে। আগের বছরের এপ্রিলে, 'কঙ্কাবতী'-র পরিবর্ধিত নাভানা সংস্করণের ভূমিকায় বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, "যে-সব স্থলে পরিবর্তন করেছি—যেমন কবিতায়—সেখানেও আমার আজকের দিনের কোনো অভিজ্ঞতাকে প্রবেশ করতে দিইনি।" এই 'আজকের দিনের অভিজ্ঞতা'র অনুপ্রবেশ ঘটেছে 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর অধিকাংশ কবিতায়।

'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর মূল বক্তব্য সম্পর্কে বিস্তৃততর ইঙ্গিত তাহ'লে এই : প্রকৃতি হ'লো অফুরন্ত, অসম্পূর্ণ সম্ভাবনাপুঞ্জ, আর শিল্প—অমোঘ, কৃত্রিম, অব্যর্থ রূপকার ; যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে সর্বত্র প'ড়ে থাকে, তাকেই পরিমার্জিত ও রূপান্তারত করে শিল্প, এবং এই দিক থেকে শিল্প শুধু প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র নয়, গুণগতভাবে উৎকৃষ্টও বটে। বোদলেয়ার, তাঁর কবিতায়, নগ্নিকার অঙ্গেও অন্তত একটি অলংকার পরিয়ে দিতেন, কেননা অলংকার কৃত্রিম ও নির্মিত : শিল্পের প্রতীক। টোমাস মান প্রায় অঙ্কের মতো ভাগ করেছিলেন প্রকৃতি ও শিল্পের সম্পর্ক : দক্ষিণ য়ুরোপ রৌদ্রোজ্জ্বল, শস্য-আকীর্ণ, জীবননিষ্ঠ—অর্থাৎ প্রকৃতি ; উত্তর য়ুরোপ শীতজীর্ণ, কৃত্রিম, সংকুচিত—অর্থাৎ শিল্প। শুধু তাই নয়, যে-লোকটি অসুস্থ, যার দাঁত খারাপ, এমনকি যেও শিল্পের প্রতীক বা শিল্পী, আর যে স্বাভাবিক,

স্বতঃস্ফূর্ত স্বাস্থ্যবান—সে প্রকৃতির প্রতীক। অসুস্থতা মানে স্বাভাবিকতার বিচ্যুতি, এক হিসেবে প্রকৃতির বিরোধিতা, সুতরাং এই সূত্রে শিল্পের সঙ্গে তার সাযুজ্য। মধ্যযুগের য়ুরোপে অসুস্থ ভিখারি, বা কখনো-কখনো কুষ্ঠরোগীকে যে 'দ্রষ্টা' বা 'বিশেষ ক্ষমতা'সম্পন্ন ব্যক্তি' বলা হ'তো, তা-ও সম্ভবত একই কারণে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কবিতার দুই রীতি বিষয়ক বিখ্যাত প্রবন্ধে শিলারেরও প্রধান অভিনিবেশ হ'লো : নাঈভ লেখক হ'লেন তাঁরাই, যাঁরা প্রকৃতির সমধর্মী, আর সেন্টিমেন্টাল লেখক প্রকৃতিবিজয়ী, প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র—বিদগ্ধ। লেখা বাহুল্য নয় যে, 'সেন্টিমেন্টাল' বিশেষণটি এখানে এক বিশেষ অনুষঙ্গের দ্যোতক; অর্থাৎ, শব্দটির সাম্প্রতিক অর্থকে এখানে অগ্রাহ্য করতে হবে।

'দ্রৌপদীর শাড়ি'র প্রথম ও শেষ কবিতায় শিল্পের "মায়াবী টেবিল"-এর উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু "কার্তিকের কবিতা"য় এই শিল্পতত্ত্বকেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে :

হায়রে, মানুষ করেছে বন্দি
প্রকৃতির হবে প্রতিদ্বন্দ্বী!—
কেড়েছে শক্তি, শেখে নাই তার ছন্দ
প্রকৃতির কোলে যে-নতুন আসে
তারই ছোঁয়া লেগে বিশ্ব বিকাশে,
এমনকি, পীত শীতের আভাসে
খানিক ঝরায় সুধা

'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর বহুলাংশেই "কার্তিকের কবিতার" প্রতিবাদ। এই গ্রন্থের "আটচল্লিশের শীতের জন্য : ২" শুরু হচ্ছে এইভাবে—

প্রান্তরে কিছুই নেই, জানালায় পর্দা টেনে দে।
ওরা তোকে কেবল ভোলাতে চায়— ঘাস, মাটি, পুকুর, আকাশ :
ফেলে দে পুতুল, ফুল, পোষা পাখি, শৌখিন ক্যাকটাস,
ডুবে যা নিরভিমান, একতাল, বিস্বস্ত নির্বেদে।

ঘাস, মাটি, পুকুর, আকাশ, ফুল, সব কিছুই এখানে আক্ষরিক অর্থে প্রকৃতির অন্তর্গত। একমাত্র 'পুতুল' বিষয়টি প্রাকৃতিক নয়—পুতুলও নির্মিত সামগ্রী, এবং 'শিল্প'। এক্ষেত্রে, পুতুলকে অবশ্য অজরুরি খেলনা হিসেবে ভাবা হয়েছে—'বিস্বস্ত নির্বেদে' যার কোনো ভূমিকা নেই। আসল কারণ, আমার অনুমান, অন্ত্যমিল। 'ফুলের' পাশাপাশি 'পুতুল'।

এই যে 'নিরভিমান, একতাল, বিশ্বস্ত নির্বেদে' নিমজ্জিত হ'তে আহ্বান জানাচ্ছেন লেখক, তার কারণ এই যে, প্রকৃতির প্রতারণা প্রধানত অ-ফলপ্রসূ,- বাহির থেকে ভিতরে প্রবেশ করতে পারলেই এই ফাঁকি ধরা পড়ে—এবং তখন, শুধুমাত্র তখন, প্রবঞ্চক প্রকৃতি থেকে ছিনিয়ে নেয়া চলে এক কণা শিল্প :

গাদ, ক্বাথ, বুদ্ধদের পরপারে এক কণা অব্যয় কস্তুরী,
কঠিন ছিপিতে আঁটা, স্বচ্ছতায় সঞ্চিত আঁধার;
অথবা, প্রপাত যার অভিপ্রায় কোনোদিন চুরি
ক'রে নিতে প্যারবে না—সেই দূরনিবদ্ধ নীহার।
(অপেক্ষা)

'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর শেষ কবিতার সর্বশেষ স্তবক এই বইটির প্রধান থীমের স্পষ্টতম ঘোষণা :

শূন্য শিশি ধ্বংস ক'রে যেদিন
গন্ধ হ'য়ে জ্বলবো আমি, স্বাধীন,
ঠাণ্ডা, রোগা, ঝকঝকে, আর মেকি!

এখানে 'ঝকঝকে' শব্দটিতে বোঝানো হ'লো শিল্পের চূড়ান্ত ঔজ্জ্বল্য। 'মেকি' শব্দটিও, এই সূত্রে, অনুধাবনযোগ্য। মেকি—অর্থাৎ কৃত্রিম, নির্মিত, অ-প্রাকৃতিক। বলা বাহুল্য, শব্দটি এখানে নঙর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না।

"প্রেমিকের গান : ১", এবং "দেবযানী স্মরণে কচ : ৩" এই দু-টিমাত্র সরাসার প্রেমের কবিতা ছাড়া 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর প্রতিটি কবিতাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই থীমের অন্তর্গত। প্রতিটি কবিতাই যে শিল্প বিষয়ক তা নয়; কোনো কোনো কবিতা স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত; একাধিক কবিতার নাম "প্রেমিকের গান"; কোনোটি-বা জনৈক তরুণ কবির উদ্দেশ্যে রচিত; কোনো-কোনো কবিতা গ্যেটের প্রণয়বহুল জীবনের প্রতিধ্বনিতে অনুরণিত; দেবযানী ও কচ কোনো কবিতার নায়িকা ও নায়ক, এবং একাধিক কবিতার মূল চরিত্র স্বয়ং তৃতীয় পাণ্ডব; সর্বোপরি, কোনো-কোনো কবিতা, আক্ষরিক অর্থেই, ঈশ্বর বিষয়ক। এতৎ সত্ত্বেও, সমস্ত কবিতা থেকেই একটি সামান্য লক্ষণ আবিষ্কার করা চলে, যাকে আমরা বলতে পারি একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত উপকরণপুঞ্জকে যা এক বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতায় পরিণত করে। যখন 'ছন্দ ও মিল'-কে অবলম্বন করে লেখক বলেন, 'যার পূত শাসনে সঞ্চিত জল, নর্দমায় স্বেচ্ছায় না-ঝ'রে/হ'য়ে ওঠে অধীন, উদ্দেশ্যময়, উজ্জ্বল ফোয়ারা', এবং 'অনুরাধা'র

প্রসঙ্গে লেখেন, 'আবর্তমান কমলালেবুর/পরিশ্রমে/অম্ল-মধুর ইন্দ্রিয়লোক/সকল দিকে উঠছে জ'মে' বা অন্য-একটি কবিতায় প্রেমিকার উদ্দেশে লেখেন, 'শুনি অতল জলরাশির দোলা/যেখানে জড়—অন্ধ, অনিচ্ছুক—/বাধ্য তোমার সৃষ্টি করার কাজে—/তাতেই ভরে বুক, আমার বুক,' এবং স্মৃতিকে সম্বোধন ক'রে "স্মৃতির প্রতি" কবিতায় রচনা করেন, 'অবিরাম চলে অধঃপাত।/বাঁচে শুধু, যা তোমার হাত/চিরকাল মূর্ছার কন্দরে/রেখে দিয়ে, করে উন্মোচন—/রূপান্তর থেকে রূপান্তরে—/পৃথিবীর প্রথম যৌবন।'/ তখন বিষয় বৈচিত্র্য সত্ত্বেও আমরা এই একই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অভিব্যক্তি অনুধাবন করি।

কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পের এই দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষের তাৎপর্য কী? বহিঃপ্রকৃতির কথাই প্রথমে ধরা যাক। গাছ, ফুল, মেঘলা দিন, গা-বেয়ে-ওঠা আঙুরলতা, আকাশ-রাঙানো হলুদ-ফুলে-ঢাকা দিগন্তের খেত, এদের কি সত্যিই আমাদের 'গণিতের কঠিন সংকেত' ব'লে মনে হয়? 'পউষে-ফাল্গুনে-গাঁথা কান্না-হাসি-দোলানো' জীবন কি আমাদের আছে "অন্যায়ের" সমতুল্য? 'দিন,' 'রাত্রি,' 'আলো,' 'ছায়া'—তারা কি 'নির্বোধ উচ্ছ্বাসে' 'দিগন্ত ডুবিয়ে দেয়'? এই ধরনের প্রশ্নের কোনো সঠিক উত্তর নেই তা বলা বাহুল্য, কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে বহিঃপ্রকৃতিকে আমরা সর্বদাই অসম্পূর্ণ খণ্ডতা বা সংযোগবিহীন গাণিতিক সংকেত হিসেবে অনুভব করি না। অথচ, কোনো লেখক যদি বুঝিয়ে দেন যে অসম্পূর্ণ প্রকৃতি প্রকৃতপক্ষে শিল্পের উপকরণ, এবং শিল্পই সদর্থে রূপান্তরিত করে প্রকৃতিকে, তাহ'লে এই সংবাদের তত্ত্বগত দিকটিতে আমরা সঙ্গে-সঙ্গে-সাড়া দিতে পারি। এজন্যেই এই নিবন্ধের প্রথমাংশে দাবি করেছিলুম যে, অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের তুলনায় 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর আবেদন অনেক বেশি বুদ্ধিগ্রাহ্য ও ধারণানির্ভর। বুদ্ধদেব বসু দর্শন-বিরোধী, এই তথ্য স্বয়ং লেখকই একাধিকবার ঘোষণা করেছেন, এবং এই খবর বহুলাংশেই নির্ভুল। কিন্তু 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর রচয়িতা সম্পর্কে এই উক্তি পুরোপুরি খাটে না। অথচ তত্ত্ব ও দার্শনিকতার গুরুভারকে তিনি অন্যভাবে পুষিয়ে নিয়েছেন তাঁর কবিতায়, যার অধিকাংশ চিত্রকল্প ও উপমা একাধারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অনুভূতিগোচর, এবং আবেগ-উদ্দীপক।

প্রকৃতি-শিল্প দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে বোদলেয়ার ও টোমাস মান-এর যে নাম উল্লেখ করেছিলুম কিছু আগে, তা শুধু নামোল্লেখের বিশুদ্ধ আনন্দে নয়। 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর পটভূমিকায় এই দুই নামের বিশেষ তাৎপর্য আছে। আরো

একজন লেখকের নাম এই সূত্রে অবশ্যস্মরণীয় : রাইনার মারিয়া রিল্‌কে। 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর অনেক কবিতা ও বোদলেয়ারের কবিতার বুদ্ধদেবকৃত অনুবাদ একই সঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছিলো 'কবিতা' পত্রিকায়। রিল্‌কের 'অর্ফেয়ুসের প্রতি সনেটগুচ্ছ'-এর সঙ্গেও 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর আত্মিক সাদৃশ্য চোখে পড়ে কখনো-কখনো—'রূপান্তর'-থীমটির সূত্রে বিশেষত। প্রায় ঐ সময়েই, অর্থাৎ ১৯৫৭-৫৮ সালে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের তৎকালীন কর্ণধার বুদ্ধদেব বসু তাঁর এম. এ. ক্লাসের ছাত্রদের পাঠ দিতেন টোমাস মান-এর গল্পগুচ্ছ, প্রধানতঃ 'ভেনিসে মৃত্যু,' 'ট্রিস্টান', এবং 'টোনিয়ো ক্রোগার' গল্প তিনটি। কোনো হঠকারী পাঠক যদি মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ ক'রে বসেন, 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর কবিতা রিল্‌কে বা বোদলেয়ারের কবিতার প্রতি-ধ্বনি বা মান-এর শিল্প-দর্শনের অনুসরণ, তাহ'লে তিনি অত্যন্ত ভুল বুঝবেন। আমি শুধু মানসতার অভিন্নতা বোঝাতে গিয়ে এই চার লেখকের প্রসঙ্গ অবতারণা করেছি। শিল্প ও জীবন সম্পর্কে বোদলেয়ার, রিল্‌কে, এবং মান একই সত্যকে বিভিন্ন দিক থেকে আলোকিত করেছিলেন; বাংলা কবিতায় সেই দায়িত্ব পালন করেছেন বুদ্ধদেব বসু।

শুধু তাই নয়। 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই বাংলা কবিতায় একটি আবহাওয়াগত পরিবর্তন ঘটেছিলো। যাঁদের আজকাল 'পঞ্চাশের কবি' বলা হয়, তাঁদের অনেকেই এই গ্রন্থের দ্বারা জন্মান্তরিত হয়েছিলেন। অনেকদিন পরে, 'যে-আঁধার আলোর অধিক' প্রসঙ্গে এই তথ্যটি স্মরণ করতে আমার ভালো লাগলো।

বুদ্ধদেব বসু : রুচি ও শিক্ষা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

বাংলা সাহিত্যে এখন অশিক্ষিত পটুত্বের রাজত্ব চলেছে। পড়াশুনো, অনুশীলন, রুচির চর্চা—সব কিছুর বিরুদ্ধেই সাম্প্রতিক সাহিত্যের বাগ্‌বিস্তার। আমার এই উক্তির সপক্ষে প্রধান প্রমাণ হ'লো এই যে, বাংলা সাহিত্যে এখন কোনো প্রবন্ধ রচিত হচ্ছে না। প্রবন্ধের নামে যা প্রকাশিত হয়, তা হয় ফুটনোট কণ্টকিত, ধূসর অ্যাকাডেমিক নিবন্ধ, অথবা স্টান্টসর্বস্ব, ভঙ্গীপ্রধান, ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস। কবিতার মান অবশ্য প্রবন্ধের প্রতিতুলনায় অনেক বেশি উঁচুতে, তবু সেখানেও মুড়ি মুড়কিকে এক তুলাদণ্ডে বিচার করা হচ্ছে। অজস্র কবিতা লেখা হচ্ছে চতুর্দিকে, একটি কবিতা থেকে জন্ম নিচ্ছে আরেকটি কবিতা—দেখতে-শুনতে-চলনসই একই শব্দপুঞ্জকে ঈষৎ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করছেন অনেক কবিযশোপ্রার্থী। অবশ্য প্রথমেই ব'লে নিই যে, অশিক্ষা বা শিক্ষাহীনতার সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্কটি খুবই ঘোরালো। পুঁথি-পড়া বিদ্যার মানেই "জ্ঞান" নয়। আমাদের অনুভূতি শেষপর্যন্ত যা আহরণ করে, এবং যা আমাদের মর্মলোকের অন্তর্গত হ'য়ে যায়, তাই শেষ পর্যন্ত আমাদের "জ্ঞান" বা "শিক্ষা"। একজন কবি সূর্যাস্তের দৃশ্য থেকেও রসদ সংগ্রহ ক'রতে পারেন, যেমন পারেন পাস্তেরনাকের কবিতা থেকে। এমনকি "স্বভাবকবিত্ব" বলেও একটি বস্তুর সত্যিই হয়তো অস্তিত্ব আছে—যা থেকে বিশিষ্ট প্রতিভাবানেরা তাদের রস সংগ্রহ করে নেন। কিন্তু যাঁরা প্রতিভাবান নন, কিন্তু ক্ষমতাবান সু-লেখক, তাঁদের পক্ষে পড়াশুনা, এবং কৃষ্টির অনুশীলন প্রায় অপরিহার্য। আর সবার পক্ষেই প্রয়োজন রুচির পরিচর্যা। এখানে 'সবার' বলতে আমি বোঝাই যাঁরা প্রতিভাবান এবং যাঁরা ততোটা প্রতিভাবান নন (কিন্তু ক্ষমতাবান), তাঁদের সবাইকেই।

এই সার্বিক রুচিহীনতার যুগে বুদ্ধদেব বসুর কথা স্বভাবতই মনে আসে। আজীবন তিনি ছিলেন এই রুচিহীনতার বিরুদ্ধে একটি প্রমূর্ত প্রতিবাদ। শুধু তাঁর রচনা নয়, তাঁর কথাবার্তা, চলন-বলন, তাঁর নিজস্ব আদর্শের প্রতি আনুগত্য —সব কিছুর মধ্যেই ছিলো একটি পরিশীলিত রুচির স্পর্শ। তিনি প্রতিভাবান ছিলেন, কিন্তু কদাচ অশিক্ষিত পটুত্বের অবস্থা রাখেন নি। প্রচুর পড়াশুনা

করেছিলেন তিনি, তাঁর ছাত্রদের এবং তাঁর ছাত্রপ্রতিম তরুণ কবিদের তিনি পড়াশুনা বিষয়ে নিরন্তর উৎসাহ দিতেন, কিন্তু পঠন-পাঠন তাঁর প্রতিভাকে কখনো দুর্ভার বা ক্লিষ্ট করেনি। তিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন "যা তোমার মানসিক পুষ্টির পক্ষে প্রয়োজন, ঠিক ততোটুকুই তোমার মধ্যে থেকে যাবে—বাকিটা নিঃশব্দে ঝ'রে যাবে—ও নিয়ে চিন্তা ক'রো না।" আমার আমেরিকা যাবার প্রাক্কালে, তিনি হাওড়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে আমাকে বলেছিলেন "শুধু বইয়ের পাতার মধ্যে চোখ আটকে রেখো না, বাইরের পৃথিবীটাকেও দেখো।" পঠন-পাঠনে তাঁর যেমন অকৃত্রিম অনুরাগ ছিলো, তেমনই পঠন-পাঠনই যে মানুষের শিক্ষার একমাত্র অঙ্গ নয়, তাও তিনি নির্দ্বিধায় মানতেন।

রুচির প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসি। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত "কবিতা" পত্রিকায় তিনি যে রুচির আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তা অদ্যাবধি লঙ্ঘিত হয়েছে ব'লে আমার জানা নেই। পত্রিকাটির প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আগাগোড়া সম্পাদকের সুরুচির স্পর্শ আকীর্ণ হ'য়ে থাকতো। এই রুচিবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো সম্পাদকীয় ঔদার্য, যা আজকের যুগে প্রায় বিরলদর্শন। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে দুই বিপরীত মেরুর কবি, জীবনানন্দ দাশ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে তিনিই প্রথম বাংলাদেশে জনপ্রিয় করেছিলেন, বিশেষত জীবনানন্দ দাশকে। জীবনানন্দ তাঁর কবিতা বিষয়ক গ্রন্থে বিষ্ণু দে'র নামোচ্চারণ পর্যন্ত করেন নি, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জীবনানন্দের কবিতা আদৌ পছন্দ ক'রতেন না (উনি আমাকে বলেছিলেন, জীবনানন্দর কবিতার ফর্ম খুব ঢিলে-ঢালা, এবং এই ফর্মের কোনো বিবর্তন নেই), অমিয় চক্রবর্তী বুদ্ধদেব বসুর কবিতা বিষয়ে কোনো কোনো সময়ে নিরুৎসাহ প্রকাশ করেছেন, বিষ্ণু দে'র সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর আদর্শগত অমিল ছিলো—কিন্তু বুদ্ধদেব বসু সবাইকেই একই সঙ্গে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন "কবিতা" পত্রিকায়। শুধু "কবিতা" পত্রিকায় নয়, "কালের পুতুল" গ্রন্থেও। একহিসেবে, আধুনিক কালে বুদ্ধদেব বসুই বাঙ্গালী পাঠককে প্রথম কবিতামনস্ক করেছিলেন।

রুচি, ঔদার্য, এবং শিক্ষা—এই তিনটি গুণ, যা আমরা বুদ্ধদেব বসুর জীবনে ও রচনায় বারবার লক্ষ্য করেছি, তার অভাব আমি প্রতিনিয়ত সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে অনুভব করি। অশিক্ষা বা অর্ধ-শিক্ষা থেকেও একধরণের মহৎ সাহিত্য রচিত হ'তে পারে হয়তো—তা আমি আগেই স্বীকার করেছি—কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে যদি একটি রুচিশীল, শিক্ষিত, প্রাপ্তবয়স্ক সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত না হয়, তাহ'লে আমাদের অধিকাংশ লেখাজোখাই একদিন মাঠে মারা যাবে।

যতটুকু জানি

পূর্ণেন্দু পত্রী

এক একটা মানুষ থাকেন, চওড়া উঠোনের মত। অনেক রোদ, অনেক আলো, অনেক ঝড়-বৃষ্টি অনেক লোক, অনেক মতামত, অনেক হৈ চৈ উৎসব এসে মিলতে পাবে সেখানে। এবং সে উঠোনে ঢোকার দরজা সব সময়েই খোলা। এবং সকলের জন্যেই।

বুদ্ধদেব বসুকে আমার মনে হয়েছে তেমনি মানুষ। প্রথম পরিচয়ের আগে খুব আশংকা ছিল। কারণ বাজারে ছড়ানো ছিল অনেক গুজব। আশংকা ছিল সেইখানে। যদি সত্য হয়। আলাপ যখন ঘন হয়ে এল, তখন জানলাম, বুদ্ধদেব বসু খানিকটা বড় মাপের মানুষ। নইলে এমন গুজব রটতো না।

বুদ্ধদেব বসুর চেয়ে অনেক বেশী পণ্ডিত লোক দেখেছি। এবং আছেনও। তাঁর চেয়ে বড় দরের কবি দেখেছি। এবং আছেনও। কিন্তু তাঁদের কাছে যেতে অনেক কুণ্ঠা। বুদ্ধদেব বাবুর কাছে না যেতে পারলেই মনে হতো ক্ষতি। যখনই ডেকেছেন ছুটে গেছি। যখন পারিনি, ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি টেলিফোনে। পর মত-সহিষ্ণু মানুষ এযুগে বড় বিরল। বুদ্ধদেব বসু নিজের জায়গায়, অর্থাৎ মতে, সিদ্ধান্তে, আদর্শে, উপলব্ধিতে, বটের মত স্থির। অথচ অন্যের, অপর পক্ষের, যাবতীয় বিরুদ্ধ বাক্যের ঝড়-ঝাপটা সইবার বা বইবার মত ধৈর্য ছিল অগাধ। ধৈর্যে ছিলেন অটল। অপরকে অপর্যাপ্ত স্বাধীনতা দিতেন তিনি। গুরুগিরি বা গার্জেনি-ঢঙ-দেখানো ছিল তাঁর স্বভাবের সীমানার বাইরে। যে কোনো মনের কথাই তাঁর স্বভাবের সীমানার বাইরে। যে কোনো মনের কথাই তাঁর সামনে সিগারেটে আগুন ধরানোর মত দপ্‌ করে জ্বালিয়ে নেওয়া যেতো।

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট হিসাবে বহুদিন যাবত তুলি কালি ঘসছি। অনেকেই আমাকে ভালবাসেন। পছন্দ করেন। অপছন্দ করার লোক সংখ্যাও যে কম, তা বলছি না। কিন্তু এই দীর্ঘ শিল্পী জীবনে তাঁর মতো সম্মান কেউ দেয় নি আমাকে। পাইনি কখনো। সম্ভবত আর পাবার আশাও রাখি না।

অনেকেই আমাকে দিয়ে মলাট আঁকায়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমারই আঁকা মলাট তাদের চাই। আমারটা হলে ভাল। না পেলে অন্য কেউ।

কেবল তাঁকেই জানি, যার প্রয়োজন ছিল আমাকেই। তার জন্যে কখনো কখনো দীর্ঘ ছ'মাসও অপেক্ষা করেছেন তিনি। চিঠি এবং ফোনে তাগিদ দিয়েছেন ক্রমাগত। কখনো রুষ্ট হতে দেখিনি। চিঠি লিখতেন বড় মজার। কি চান, কটা রঙ, কত বড় হবে অক্ষর, তার বিশাল বিস্তৃত ফিরিস্তী। কিন্তু সকলের শেষে, প্রত্যেকটি চিঠিতেই, সকলের শেষে, বুদ্ধদেব বসুর মত মানুষের পক্ষেই যে-কথাটা বলা সম্ভব, সেই লাইনটি। 'কিন্তু তুমি যা ভাল মনে করবে, সেটাই করবে।'

একদিন একটা সংবাদ শুনে জল এসে গিয়েছিল চোখে। কানে এল, মৃত্যুর আগে তিনি যে-প্রকাশককে তাঁর গ্রন্থাবলী ছাপবার অনুমতি দিয়েছিলেন, সেখানে অন্যান্য সর্তের মধ্যে একটা ছিল, পুর্ণেন্দু পত্রী ছাড়া অন্য কেউ যেন কিছু না আঁকে। এত স্নেহের যোগ্য নই আমি। কিন্তু ঐ উদার মানুষটি, মানুষ হিসেবে, যোগ্য ছিলেন আরও অনেক শ্রদ্ধার।

বুদ্ধদেব : বিষাদে, কৌতুকে

দিব্যেন্দু পালিত

যে-রূপে ক্যামেরার লেন্‌স্ তাঁকে ধরে রাখত সতর্ক বা অসতর্ক মুহূর্তে, বা যে-গলায় তিনি আবৃত্তি করতেন 'তোমায় আমি রেখে এলাম ঈশ্বরের হাতে—,' একান্তভাবেই তাদের আবহ বিষাদ। বলা যায় সেই সব মুহূর্তগুলির কথাও, যখন ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিন্যু'র ড্রইং-রুমের সোফায় তিনি বসে আছেন একা—প্রকৃত অর্থে সঙ্গীহীন; বাইরে বেলা পড়ে আসছে দ্রুত, রোদ নেই, যে-কোনো সময় ঝুপ্ ক'রে নেমে পড়বে সন্ধ্যা। মনে হতো, ছোট খাটো আপাত-ম্লান এই মানুষটির মধ্যেই রচিত হয় সন্ধ্যা, যাতে তাঁর বিষণ্ণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে আরও। তাঁর মৃদুভাষিতার সঙ্গে মিশে যেত প্রশস্ত কপালের অনেকটা অংশ জুড়ে ছড়ানো নীল দাগ। নীল কি বিষাদেরই বর্ণ নয়! ফরাসী ennui শব্দটির অর্থও বুঝি বিষাদ; এই কথাটির জালে বার বার জড়িয়ে গেছেন তিনি। একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে বিদেশী যেসব কবির অনুবাদে আকৃষ্ট হয়েছিলেন বুদ্ধদেব—বোদলেয়ার, রিল্‌কে, হোল্ডার্লিন প্রভৃতি, তাঁদেরও কবিতার আদর ছিল বিষাদের দিকে।

বাইরের আঘাতও কি তাঁকে টেনে নিত না বিষাদের মধ্যে? সাল-তারিখ ঠিক-ঠিক মনে নেই (বাষট্টি-তেষট্টি হতে পারে), আমেরিকা যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন বুদ্ধদেব। যেদিন যাবেন, তার আগের দিন সন্ধ্যায় আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম তাঁর ২০২-এর ফ্ল্যাটে। তার কিছুদিন আগে পরলোকগত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত একটি রচনা নিয়ে তখনো চলছে তুমুল বিতর্ক; এই প্রসঙ্গের জের টেনেই এখন-বিলুপ্ত তখনকার কোনো একটি মাসিকপত্রে কিছু বা অশালীন ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুকে। সেই সন্ধ্যায় তাঁকে দেখাচ্ছিল অত্যন্ত ম্লান ও বিষাদাচ্ছন্ন। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদেরই মধ্যে কেউ প্রস্তাব করেছিলেন ঐ সমালোচনার প্রতিবাদে আদালতে মানহানির মামলা দায়ের করার জন্যে। তার আগে পর্যন্ত বুদ্ধদেব ছিলেন অত্যন্ত চুপচাপ; ঐ প্রস্তাবের পর হঠাৎ উত্থিত হলেন নিজের মধ্যে থেকে, মৃদু অথচ স্পষ্ট গলায় বললেন, 'তোমরা কি বলছ এই বয়সে কোর্টে গিয়ে বলব, হুজুর, আমি নিরপরাধ! যদি কেউ ক্ষুদ্র হয়ে থাকেন, আমিও কি তাই হবো!'

বুদ্ধদেব বসুর কাছে শুধু ভাষা বা সাহিত্যপ্রীতিই নয়, আমাদের আরও অনেক কিছুরই শিক্ষা নেওয়ার ছিল। তার একটি, দুঃখে ও অপমানে অবিচল থাকা নিজের ধর্মে। সেদিন যখন আমরা ফিরে আসছি, তখনও বিষাদ কাটেনি তাঁর। তবু, বিদায় জানাতে ক্লান্তভাবে এগিয়ে এলেন দরজা পর্যন্ত: 'অনেকদিন দেখা হবে না তোমাদের সঙ্গে—,' বললেন, 'তোমরা ভালো থেকো। যদি বেঁচে থাকি, ফিরে এসে দেখা হবে।'

ছবি বা লেখা অনেক সময়েই প্রকৃত মানুষটিকে আড়াল ক'রে রাখে। ছবিতে তো নেই-ই, তাঁর রচনায়ও বিষাদ ও বিশ্লেষণ যতোটা আছে কৌতুক ঠিক ততোটা নেই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার সুযোগ যাঁদের হয়েছে তাঁরাই জানেন, রসিকতাবোধে প্রায় অদ্বিতীয় ছিলেন বুদ্ধদেব, হাসতেও পারতেন প্রাণ খোলা উচ্চকণ্ঠে। এ-ব্যাপারে কখনোই মানতেন না বয়স বা সম্পর্কের তারতম্য এবং, এমনকি, অভাবিত প্রসঙ্গেও সায় দিতেন স্বচ্ছন্দে। এ-সবের কিছু পরিচয় পেয়েছিলাম আমাদের ছাত্রাবস্থায়; বুদ্ধদেব বসু তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রধান। আমার সহপাঠীদের মধ্যে একজন কালিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু মেধাবী, বুদ্ধিমান ও পড়াশুনোয় উজ্জ্বল বলেই নয়, তার বিচিত্র স্বভাব ও খেয়ালের জন্যেও কালিকা ছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তার কৈশোর ও যৌবন কেটেছিল অত্যন্ত দুর্যোগের মধ্যে, আর্থিক ক্লেশ বাধা করেছিল নানারকম জীবিকাগ্রহণে—কিন্তু এ-সবের কিছুই তাঁর অধ্যাবসায় ও উচ্চাশায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ ক্লাসে ভর্তি হবার সময়ই তার বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ। মেধা ও প্রচেষ্টার জন্যে অধ্যাপকরা সকলেই পছন্দ করতেন তাকে। অন্যদের কথা বলতে পারব না, তবে, ব্যক্তিগতভাবে আমিও ছিলাম তার বিশেষ অনুরাগী।

কালিকার চেহারাও ছিল কিঞ্চিৎ অন্য রকমের; আচরণও। একই নস্যি রঙের জামা পরে দিনের পর দিন ক্লাসে আসত সে, ব্রণর প্রকোপ এড়ানোর জন্যে গালে মাখত খাবলা-খাবলা নিক্সোডার্ম, তার জামায় ছিল ছারপোকার বাসা, লম্বাটে মুখে সারাক্ষণ বিজয়ীর হাসি,—পুরু কাচের চশমার আড়ালেই যা মাঝে-মাঝে ছায়া ফেলত তার অতীত ও দীর্ঘ ক্লেশময় জীবন। তাকে নিয়ে আমাদের নানারকম ঠাট্টায় বিচলিত হতো না এতোটুকু। উপরন্তু, সে ছিল প্রেমিক—প্রচণ্ড রকমের প্রেমিক; এতোই, যে মনে হতো প্রেম-বিষয়ক ধারণায় সে বাস করছে শেক্সপীয়রের যুগে।

এই কালিকাই যখন একতরফাভাবে প্রেমে পড়ল আমাদেরই এক সহপাঠিনীর

সঙ্গে তখন ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল ঘোরালো। একে প্রেম, তায় একতরফা, তায় প্রেমিক স্বয়ং তুলনামূলকভাবে গুলে খেয়েছে রোম্যাণ্টিক কবিতার নানারঙ বড়ি—এতে যে আবেগের আতিশয্য ঘটবে তাতে আর আশ্চর্য কী। কালিকা, হঠাৎই, হয়ে উঠল প্রসব-প্রবণ—লিখতে লাগল রাশি-রাশি কবিতা, অধিকাংশই চতুর্দশপদী।

এ-পর্যন্ত ঠিকই ছিল। বিপর্যয় দেখা দিল, যখন সেই সহপাঠিনী'র খাতার মধ্যে একদিন চালান হয়ে গেল কালিকা-রচিত একগুচ্ছ কবিতা—মেয়েটি রুষ্ট হলো, বিষয়টি গোচরে এলো তার রাশভারি বাবার এবং অনুযোগ পৌঁছল বুদ্ধদেব বসুর কাছে। অভিযোগ যেখানে প্রত্যক্ষ, সেখানে কবিতা বা প্রেমের দোহাই চলে না। দায়িত্ব নিতেই হয় বিভাগীয় প্রধানকে।

বুদ্ধদেব ডেকে পাঠালেন কালিকাপ্রসাদকে। কোনো এক কারণে সেই মুহূর্তে আমিও উপস্থিত ছিলাম সেখানে, সম্ভবত বুদ্ধদেব চেয়েছিলেন কালিকার সহপাঠীরাও তাকে সংযত হতে সাহায্য করে।

তিরস্কারের শুরুতে বুদ্ধদেবের মুখে ছিল গাম্ভীর্য, কিঞ্চিৎ বিরক্তিরও আভাস। কিন্তু, প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতেই তিনি পড়লেন অস্বস্তিতে। কবিতা লেখা ও চালান করার ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করল না কালিকা ; কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে অকপট কণ্ঠে বলল, 'সে তো স্যার আপনার মেয়েকে নিয়েও আমি চল্লিশটা কবিতা লিখেছি—'

'তাই নাকি !' হঠাৎ হাসিতে উদ্ভাসিত হলো বুদ্ধদেবের মুখ, গাম্ভীর্য ধ'রে রাখতে পারলেন না ; 'বলো কী ! চল্লিশটা !'

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল কালিকাপ্রসাদ, বলল, 'ভাবছিলাম, কবিতা'য় সেগুলো পাঠাব কি না !'

বুদ্ধদেব তখনো হাসছেন। হাসতে হাসতেই বললেন, 'নিশ্চয়ই পাঠাবে। গ্যারাণ্টি দিচ্ছি, ভালো হলে ছাপাও হবে। তবে—,' একটু থেমে বললেন, '—কে নিয়ে লেখা কবিতাগুলো আর তার খাতার মধ্যে চালান কোর না। এ নিয়ে আমাকে যেন আর বিব্রত হতে না হয় !'

না, তাঁকে আর বিব্রত হতে হয়নি।

কালিকা তার প্রভূত বিদ্যার অলঙ্কার নিয়ে বহুদিন হলো চ'লে গেছে বিদেশে। আর ফিরবে কি না জানি না। বুদ্ধদেবও আর নেই ; শুধু তাঁর বিষাদ ও কৌতুক নিয়ে মাঝে-মাঝে ফিরে আসেন স্মৃতিতে।

স্যার

দিব্যেন্দু পালিত

শ্রদ্ধেয় অগ্রজের মৃত্যু অনুজ সমজীবীর কাছে সব সময়েই বেদনাদায়ক; বিশেষত সে-মৃত্যু যদি হয় আরো অর্থবহ—একটি আশ্রয়ের মৃত্যুর সমান। বুদ্ধদেব বসুর আকস্মিক মৃত্যু তেমনি একটি ঘটনা—যেন হঠাৎই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল একটি সংযোগের সেতু, বন্ধ হলো আনুকূল্য ও প্রশ্রয়ের মধ্যে অবাধ পরোপকারের সুযোগ। জানি, এই মুহূর্তে আমার মতো আরো অনেকেই এই অনুভূতির অংশীদার হবেন। অন্তত কিছুদিনের জন্যেও একান্তে নির্জন হয়ে যাবো আমরা—বহুমুখিতায় রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যের প্রধান পুরুষ হিসেবে নয়, যাঁরা তাকে পেয়েছিলাম অন্য এক ভূমিকায়, শিক্ষক হিসেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিণত দিনগুলিতে।

সর্বজনের বুদ্ধদেব বসু; অমাদের 'স্যার'। মনে পড়ে না আর কোন সম্বোধনে কোনদিন ডেকেছি তাঁকে। মনে পড়ে সম্বোধনের উত্তরে তাঁর সরল, উদ্ভাসিত মুখ, বিস্তৃত হাসি আর দৃষ্টি সস্নেহ একাগ্রতা—বহু যুদ্ধের বিজয়ী নায়ককে যা এক মুহূর্তেই স্থানান্তরিত করে বয়সে অনেক নবীন, নামযশহীন এক যুবকের হৃদয়রাজ্যে। মনে পড়ে মানুষ বুদ্ধদেবকে—কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, অনুবাদক, সমালোচক, প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু'র চেয়েও যিনি হয়তো আরো অনেক বড়ো। এর সাক্ষ্য হৃদয়ের সেই সন্ধিতে, কৃতজ্ঞতা যেখানে উচ্চারিত হয় নীরব শোকে, সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য পরিণত হয় অহঙ্কারে। ১৮ই মার্চের সেই হতবুদ্ধি সকালে তাঁর নাকতলার বাড়ির সিঁড়িতে ব'সে পুরনো দিনগুলি যতো ভাবছিলাম, দুঃখের মধ্যেও অল্প একটু গর্বে চঞ্চল হয়ে উঠছিল স্নায়ু। ভাবতে ভালো লাগছিল কোনোদিন আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম।

বুদ্ধদেব বসুর দায়িত্ব তখন নতুন খুলেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ। ইচ্ছে হলো পড়বো। ঠিকানা সংগ্রহ করে একদিন সন্ধ্যায় হাজির হলাম তাঁর ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর ফ্ল্যাটে। সদর ঘরে ঢুকতেই লেখার টেবিল ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে যিনি উঠে এলেন, 'বিশ্বাস হচ্ছিল না তিনিই সেই প্রবাদতুল্য ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধদেব বসু। ভয়ে কাঁপছিল হাঁটু, মনে

হচ্ছিল অনধিকার প্রবেশ করেছি। দূর বিহারের এক মফঃস্বল শহর থেকে আগত আমার অসহায় চেহারার দিকে তাকিয়ে সম্ভবত মানসিক অবস্থাটাও আঁচ করতে পারলেন বুদ্ধদেব, পরিবর্তিত মুখে হাসি এনে বললেন, 'দাঁড়িয়ে কেন, ব'সো। তোমার নামটা চেনা-চেনা লাগছে। 'কবিতা'য় লিখেছো বোধহয়?'

বললাম, না। আমি 'কবিতা'র গ্রাহক। 'তাই হবে। তাহ'লে চিঠিপত্রের আদান প্রদান আছে। নিয়মিত কাগজ পাও না বলে অনুযোগ করো তো!'

ভাবতে অবাক লাগে, আমার মতো অখ্যাত একটি মফঃস্বলের ছেলেকে ব্যস্ত, পরিশ্রমশীল লেখক বুদ্ধদেব বসু অক্লেশে আধঘন্টা সময় দিয়েছিলেন সেদিন—হাসি-মুখে, মৃদু গলার আথিথেয়তায়, চায়ের কাপের ওপর নানা কথা চালিয়ে। পরের দিন দেখা করতে বললেন যাদবপুরে। চলে আসার আগে ঝুঁকে প্রণাম করছি, বললেন, 'এ-সব আজকাল উঠে গেছে। কলকাতায় এসো পাকাপাকিভাবে, কলকাতা সকলকেই বদলে দেয়।'

সিঁড়ির নীচের ধাপে পৌঁছে দেখলাম দাঁড়িয়ে আছেন তখনো: কপালের ওপর ঝুঁকে পড়েছে চুল, পরনে পাজামা আর বোতামমুক্ত পাঞ্জাবি—দুই আঙুলের ফাঁকে পুড়ে যাচ্ছে নীল কৌটোর 'মেপোল'।

পিতৃবিয়োগ হেতু সেবার আর ভর্তি হওয়া হলো না। তবে সেই কলকাতাতেই এলাম, চাকরির সন্ধানে। আমার পড়াশুনোর ব্যাপারে তাঁর আগ্রহকে সম্মান জানানোর কোনো প্রয়োজনই বোধ করিনি; ভেবেছিলাম বিখ্যাত মানুষ তাঁর পক্ষে সেদিনের সন্ধ্যার কথা মনে না-রাখাই স্বাভাবিক।

দেখতে দেখতে কেটে গেল দু'টি বছর। ১৯৫৯ সনে পারিবারিক দায়িত্ব একটু কমতেই নতুন ক'রে এম-এ পড়ার বাসনা হলো এবং এবারও সেই তুলনামূলক সাহিত্য। ক'দিন ধরেই মনের মধ্যে নড়াচড়া করলেন বুদ্ধদেব; কিন্তু দু'বছর আগেকার ঘটনা স্মরণ করে কিছুতেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ভরসা হলো না। অনেক ভেবেচিন্তে একটি চিঠি দিলাম তাঁকে; যদিও, মনে মনে ধরেই নিয়েছিলাম আমার আবেদন তাঁকে স্পর্শ করবে না।

আশ্চর্য তৃতীয় দিনেই উত্তর এলো সে-চিঠির; স্পষ্ট, দ্বিধাহীন হস্তাক্ষরে; 'তোমার তুলনামূলক সাহিত্য পড়ার আগ্রহ এখনো স্তিমিত হয়নি জেনে সুখী হলাম। পত্রপাঠ আমার সঙ্গে দেখা করো।' দু' লাইনের চিঠি; কিন্তু মাত্র দু'টি লাইনেই ধরা পড়লো তাঁর দীর্ঘ নিরহঙ্কার, স্নেহ ও অসামান্য ভদ্রতাবোধ—যার তুলনা কমই পেয়েছি।

পরবর্তী দু'টি বছর আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখকর অভিজ্ঞতা। সুধীন্দ্রনাথ

দত্ত, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ডেভিড ম্যাকাচ্চিয়ন, ফাদার ফালোঁ'—সাহিত্যপাঠের অনন্ত অভিজ্ঞতায় ভরে উঠছে প্রতিদিনের ক্লাস; সর্বোপরি বুদ্ধদেব বসু। সর্বজনমান্য কবি ও লেখক হারিয়ে গেলেন কোথায়; পরিবর্তে উন্মোচিত হলেন সেই ব্যক্তি—ক্লাসে যিনি মনস্বী অধ্যাপক ও শিক্ষক, যাদবপুরগামী বাসের সীটে পাশাপাশি যেতে যেতে সহৃদয় বন্ধু এবং ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর সান্ধ্য সমাগমে অফুরন্ত প্রাণ, কিছু বা ক্লান্ত সমবয়সী। যেদিন তাঁর ক্লাস থাকতো না, ছুটির পর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সোজা চলে এসেছি তাঁর ফ্ল্যাটে, কখনো একা, কখনো ক'জন মিলে। আর পেয়েছি তাঁর সহর্ষ অভ্যর্থনা, ঋজু, পরিহাসমিশ্রিত বাক্যবাণ: 'আজ নিশ্চিত সব কটা ক্লাস ফাঁকি দিয়েছ—', বা, 'যাদবপুরের ছাত্রদের একটা দুর্নাম আছে; তারা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে প্রেম করে বেড়ায়—', এমনি আরো কথা।

শিক্ষক হিসেবে বুদ্ধদেব যে শুধু স্নেহশীল ও বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন তা নয়। বরং পড়াশুনোর ব্যাপারে মাঝে মাঝে তাঁকে মনে হতো অত্যন্ত নির্মম ও কঠোর; সামান্য অবহেলায় হয়ে পড়তেন অসন্তুষ্ট। মনে আছে তাঁর কাছে প্রথম টিউটোরিয়াল ক্লাসের অভিজ্ঞতা। আমরা জন চার-পাঁচ যারা তাঁর ক্লাসে ছিলাম, প্রত্যেকের খাতাই কলমের আঁচড়ে হয়ে গেছে ছিন্নভিন্ন; গম্ভীর মুখ লক্ষ্য করেই বুঝলাম, ক্ষুব্ধ হয়েছেন তিনি। তার পরেই মুখ খুললেন। 'তোমরা সাহিত্যের ছাত্র অথচ সামান্যতম ভাষাজ্ঞান হয়নি এখনো। এটা খুবই লজ্জার কথা।' বলেই হঠাৎ তাকালেন আমার দিকে। 'দিব্যেন্দু, তোমাকেও বাদ দিতে চাই না। তুমি ইতিমধ্যেই গ্রন্থকার হয়েছ, কিন্তু গদ্য লিখেছ ক্লাস সিক্সের ছাত্রের মতো। তোমার জানা উচিত ব্যাকরণসম্মত হওয়াই ভাষার একমাত্র গুণ নয়—'

এম-এ পড়ার দু'টি বছরে এ-রকম অনেক তিরস্কারই শুনতে হয়েছিল। আস্তে আস্তে, বুঝতে পারছিলাম, এর মধ্যে দিয়েই ক্রমশ গ্রহান্তরিত হচ্ছি আমরা, তিরস্কার থেকে পুরস্কার—অভ্যাস থেকে বোধের দিকে। অনেকদিন পরে এই বুদ্ধদেব বসুকেই তাঁর ফ্ল্যাটের এক সমাবেশে সগর্বে বলতে শুনেছিলাম, 'আমার ছাত্ররা কেউই খারাপ গদ্য লেখে না—।'

আগে তেমন করে ভাবিনি; তাঁর মৃত্যুর পর যতোই স্মৃতি নির্ভর হচ্ছি, অনুভব করছি, মন্থর স্বভাবের এই মানুষটি যতোটা পেয়েছেন, তার চেয়ে অনেক বেশী দিয়ে গেছেন আমাদের। সে-দান ভালোবাসার, স্নেহের, উদারতার।

কলকাতায় আমার ছাত্রজীবন কেটেছে চরম আর্থিক দুর্দশার মধ্যে; পড়াশুনোর খরচ চালাতে হতো কাগজে ফিচার লিখে, ছাত্র পড়িয়ে। মুখ ফুটে বলিনি কখনো; বুদ্ধদেব নিজেই কী করে জানতে পেরেছিলেন ব্যাপারটা —কর্তৃপক্ষকে বলে কলেজ-ফী মকুব করিয়ে দিলেন। কিন্তু আমার জীবনে তাঁর মহত্তম দান এসেছিল অন্যরূপ ধরে—যে-কথা ভাবলে আজও কোনো নিয়ম খুঁজে পাই না; বিস্ময়ে ভাবি, ছাত্রদের কাছে তিনি কি শুধুই স্নেহশীল শিক্ষক ছিলেন!

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার কয়েক মাস পরেই হঠাৎ এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলাম। কিছুদিন থেকেই চোখ নিয়ে বিব্রত হচ্ছিলাম; এই অবস্থায় একদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পাঠকক্ষে তীব্র ও আকস্মিক যন্ত্রণার মধ্যে হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল দৃষ্টি। সেই মুহূর্তের অভিজ্ঞতা ভাষায় বর্ণনীয় নয়। পাশেই ছিলেন এক সহপাঠি, আমার আর্তি শুনে তৎক্ষণাৎ নিয়ে গেলেন কাছাকাছি এক চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে। ততোক্ষণে ডান চোখে আবার দেখতে পাচ্ছি অস্পষ্টভাবে। ডাক্তার সান্ত্বনা ও ওষুধ দিয়ে দেখা করতে বললেন তিনদিন পরে; বন্ধু আমাকে আমার ভাড়া-করা একলা ঘরটিতে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলেন। থাকি একা, খাই পাইস হোটেলে, আর্থিক সম্বল বলতে ন্যূনতম—প্রায় বন্ধুহীন কলকাতা শহর তখন থেকেই নির্বান্ধব হতে শুরু করেছে আমার কাছে। কেন যেন মনে হচ্ছিল ডান চোখের এই সামান্য জ্যোতিও হারিয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে। সারা রাত হাঁটুতে মুখ গুঁজে অপেক্ষা করতে লাগলাম সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তটির জন্যে। অস্তহিত হলো ক্ষুধা আর পারিপার্শ্ব, স্মৃতি আর সম্ভাবনা—আসন্ন অন্ধতার ভয় আমাকে দ্রষ্টা করে তুললো।

অভিমান থেকে ক্ষুধার তাড়নায় পরদিন সকালে বেরুলাম কোনোরকমে, রাস্তা চিনে কিছু খেয়ে আসতে। উদ্দেশ্যহীন, অনেকক্ষণ বসে থাকলাম রেস্তোরাঁয়। তারপর, ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই যে-বাড়িতে ঘর-ভাড়া করে থাকতাম সেই বাড়ির গৃহকর্ত্রী বললেন, 'একটি ছেলে এসেছিল বুদ্ধদেব বসু'র চিঠি নিয়ে। এই যে, দেখুন—'

বুদ্ধদেব বসু! নতুন কোনো ভাবান্তর হলো না আমার; তখনকার মানসিক অবস্থায় পৃথিবী আমার কাছে পরিচয়হীন হয়ে আছে। বললাম, 'চিঠিটা পড়ে দিন, আমি ভালো দেখতে পাচ্ছি না—'

পরবর্তী কয়েকটি মুহূর্ত আমাকে নিক্ষিপ্ত করল স্বর্গের দিকে। বুদ্ধদেব

লিখেছেন : 'শুনলাম তুমি চোখ নিয়ে কষ্ট পাচ্ছো। কী হয়েছে জানি না। এই চিঠি পেয়েই ১নং ইন্দ্র রায় রোডে ডক্টর অতুলানন্দ দাশগুপ্তের (আনন্দকিশোর মুন্সী) কাছে যাবে ; তাঁকে আমি বলে রেখেছি ফোনে—প্রয়োজনে তিনি তোমাকে ডক্টর অমল সেনের কাছে নিয়ে যাবেন। তোমার চিকিৎসার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা তিনি করবেন। খরচের ব্যাপারে কোনো সঙ্কোচ কোরো না—সে-দায়িত্ব আমার। আশাকরি আমার নির্দেশ অমান্য করবে না। ডক্টর দাশগুপ্তের কাছেই জানতে পারবো 'তুমি কেমন আছো।'

অনেকদিন হয়ে গেল ; আমার স্বভাব খারাপ—অন্যমনস্কতায় সেই মূল্যবান চিঠিটাও হারিয়ে ফেলেছি কোথায়। কিন্তু পারচ্ছন্ন দুই চোখে আজও আমি পড়তে পারি সেই হস্তাক্ষর, প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ ; আর অনুভব করি ভাষার ভিতরের সেই দুঃসহ স্পন্দন !

সাহিত্যবোধ অর্জনের জন্যে একদা তাঁর ছাত্র হতে চেয়েছিলাম। বুদ্ধদেব দিয়ে গেছেন তারও অনেক বেশী ; এবং সবটাই নিজেকে অনুচ্চারিত রেখে !

বিশুদ্ধ শিল্পী বুদ্ধদেব

অম্লান দত্ত

সাধু ও শিল্পীর ভিতর এক জায়গায় একটি গভীর অমিল আছে। সাধু চান চিত্তশুদ্ধি। আরিস্টটল-এর অনুকরণে কেউ-কেউ বলবেন, শিল্পীও তাই চান। কিন্তু এতে শুধু শব্দের অভিন্নতায় অর্থের বিভেদ ঢাকা প'ড়ে যায়।

দিবা ও রাত্রি দুটি অনির্বাণ জ্বলন্ত কাঠ। এতে জীবগণ নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছে। সাধু চান চিত্তকে এমনভাবে তৈরি করতে যাতে এই দাহ তাঁকে স্পর্শ করবে না। শিল্পী চান রাতদিন পুড়তে এবং সেই জ্বালাকে শিল্পে প্রকাশ করতে।

ধরা যাক প্রেম, যে প্রেম পোড়ায়। গান্ধীজী চেয়েছিলেন প্রবৃত্তিকে এমনভাবে সংযত করতে যাতে অন্তরে অন্তরে প্রতিদিন ক্রোধে ও হিংসায় দগ্ধ হতে না হয়। আত্মজীবনীতে তিনি জানিয়েছেন যে, ব্রহ্মচর্যে সাফল্যের পর কস্তুরবার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের মধ্যে অনাস্বাদিতপূর্ব শান্তি ও মাধুর্য স্থাপিত হয়। বুদ্ধদেব কবিতায় যে-প্রেম প্রকাশ করেছেন তা, অন্তপক্ষে, তিক্তমধুর। এর অধিক মাধুর্য বুদ্ধদেবের সাধ্যও নয়, কাম্যও নয়।

গান্ধীজীর শিল্পে প্রয়োজন ছিল না। ভজন ও অনাবিল আকাশ, এই তো যথেষ্ট। রাত্রির তারকাখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে মানুষের শিল্পকে তাঁর নগণ্য মনে হয়েছে। বুদ্ধদেবের কাছে প্রকৃতি তিক্ত ও কদর্য, শিল্পে রূপান্তরিত হ'য়ে তবে সে মধুর ও সুন্দর। শিল্পের জন্যই বাঁচা সার্থক। তার জন্যই তিনি বাঁচতে চেয়েছেন।

ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা জানেন যে, বুদ্ধদেব ও আয়ুবের ভিতর একটি অপ্রকাশিত তর্ক আছে। পত্রালাপে তর্ক। আমার পড়বার সুযোগ হয়নি ; তবে দুজনের মুখেই কিছু কিছু শুনেছি। আইয়ুব প্রগতিতে বিশ্বাসী। অর্থাৎ তিনি বিশ্বাস করেন যে মানুষ ধীরে-ধীরে জ্ঞানের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে, অগণিত অন্যায়কে অতিক্রম ক'রে উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে সমাজ বৃহত্তর ন্যায়ের অভিমুখেই চলেছে। বুদ্ধদেবের মন এমন ধরনের আশাবাদে সায় দেয় না। বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে, মানুষের আয়ু বাড়ছে, ক্রীতদাসপ্রথা আধুনিককালে ধিক্কৃত ও মানুষের অধিকার অন্তত মৌখিকভাবেও স্বীকৃতির পথে, এসব কথা তিনিও জানেন। কিন্তু মানুষের মনে শান্তি কি বেড়েছে? তর্কের ভাষায় এ-কথা বলবার আগ্রহ নেই বুদ্ধদেবের। কবিতাই তাঁর ভাষা।

শান্তি কি সম্ভব মানুষের জীবনে ? এমন কি কাম্য ? কবি বুদ্ধদেব নির্বাণ চান না। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কবিতাও তাঁকে টানে না। যুবতী স্ত্রী যেমন স্বামীর বৈরাগ্যসাধনাকে ভয় করে, বুদ্ধদেবও তেমনি সাধু কবিকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি জানেন যে সাধুত্বের যেখানে পরিণতি কাব্য সেখানে বাহুল্য। জীবনকে যিনি অন্তরে পরম মধুময় বলে লাভ করেছেন, কবিতার মাধুরীতে তাঁর আর প্রয়োজন নেই!

এই সাধুসন্তের দেশে বুদ্ধদেব নির্বাণের চাইতেও সেই তৃষ্ণাকে বরণীয় বলে গ্রহণ করেছেন, কাব্যে যার ফলশ্রুতি।

দর্পণে দুই মুখ

অমিয় দেব

প্রায় ভাবতে বসেছিলাম রবীন্দ্রনাথের পরে আর নাটক লেখা হলো না বাংলা-ভাষায়। কবিতা লেখা হ'লো; উপন্যাস, ছোটগল্প, এমন কি প্রবন্ধও—কিন্তু নাটক? এই সেদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথই ছিলেন আমাদের শেষ এবং আধুনিকতম নাট্যকার; অথচ 'শ্যামা' প্রকাশের পর পঁচিশ বছর কেটে গেছে ততদিনে। নাট্য রচনায় আমাদের এই অনীহা লক্ষ্য করে কেউ-কেউ এমন সন্দেহও পোষণ করতে আরম্ভ করেছিলেন যে নাটক দেখতে ও নাটক করতে ভালোবাসলেও নাটক রচনাপ্রতিভা থেকে আমরা চরিত্রগতভাবেই বঞ্চিত। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এব উজ্জ্বল ব্যতিক্রম, এবং তেমন উজ্জ্বল না-হলেও মধুসূদন-দীনবন্ধুরাও তা-ই। কিন্তু গত তিন বছরে বুদ্ধদেব বসু প্রমাণ করে দিয়েছেন যে নাট্যপ্রতিভা আমাদেরও আছে; এবং যে-বিবর্তন কবিতায় উপন্যাসে ছোটগল্পে প্রবন্ধে সম্ভব, তা সম্ভব নাটকেও। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' থেকে 'কালসন্ধ্যা' পর্যন্ত প'ড়ে আর আমরা বলতে পারি না যে বাংলা নাটক রবীন্দ্রনাথেই থেমে আছে; রবীন্দ্রনাথের এক যথার্থ উত্তরাধিকারীর আবির্ভাব ঘটেছে আকস্মিক।

আকস্মিকই বলবো, কেননা আমরা তো সত্যি ভাবিনি যে বুদ্ধদেব কখনো নাটক লিখবেন। অথচ ভাবতে হয়তো পারতাম, লুপ্ত 'রাবণ' এবং 'মায়া-মালঞ্চ' ও 'দালিয়া'র ভিত্তিতে নয়, গভীরতর অন্য-এক ভিত্তিতে। সুধীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন যে বুদ্ধদেবের পরিণতি ঘটেছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য থেকে বস্তুস্বাতন্ত্র্যে। বাইশ বছর আগে যা সত্য ছিলো দশ বছর আগে তাই সত্যতর হ'লো 'যে-আঁধার আলোর অধিক' প্রকাশে। 'বন্দীর বন্দনা' কিংবা 'কঙ্কাবতী'র সেই অমিত আত্মকথন এখানে নেই, পরিবর্তে লক্ষ্য করলাম আমরা এক তদাত্মতা, যেমন দেখা দিয়েছিলো রিলকের কবিতায়, তাঁর রদ্যাঁর সংস্পর্শে আসবার পর। এলো এক ঘনতা যার ফলে বস্তু আর ব্যক্তির দ্বিমাত্রিক দর্পণমাত্র রইলো না, হয়ে উঠলো এক স্বয়ংভর অস্তিত্ব, ব্যক্তির সঙ্গে যার সম্পর্ক আত্মীয়তার, বন্ধুতার, সমবেদনার। যেন খেয়াল ছেড়ে ধ্রুপদ আরম্ভ করলেন বুদ্ধদেব। এই

তদাত্মতাই কিন্তু নাটকেরও জনক, এরই অন্যতর পরিণতি সেই ত্রিমাত্রিক জগৎ যেখানে বিবিধের সহ অবস্থান শুধু সম্ভবপর নয়, স্বাভাবিকও; যেখানে ব্যক্তি বস্তুকে আড়াল ক'রে থাকে না, ব্যক্তি থাকে বস্তুরই অন্তরালে এক আদর্শ দ্রষ্টার মতো। এবং বুদ্ধদেব, স্বাচ্ছন্দ্যে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে প্রায় অদ্বিতীয় হয়েও যিনি নিরন্তর গতিশীলতায়ও প্রায় অদ্বিতীয়—তিনি যে এই তদাত্মতার পরিণতি অর্জন করে নাটকেও পৌঁছোবেন, তাতে বোধ হয় খুব অবাক হবার কিছু নেই।

কোনো কোনো কবি নাটক লিখতে আরম্ভ করেন গোড়া থেকেই; তাঁদের নাটকের পরিণতি ঘটে তাই ধীরে-ধীরে, কবিতার পরিণতির সঙ্গে-সঙ্গে। আবার কেউ-কেউ আছেন যাঁরা নাটকে হাত দেন তাঁদের পারণতির চূড়ান্ত ধাপে পৌঁছে। বুদ্ধদেব দ্বিতীয় দলের, তাঁর 'রাবণ', 'মায়া মালঞ্চ', 'দালিয়া' সত্ত্বেও (আন্তরিক তাগিদ যদি থাকতো তাহলে কি লুপ্ত পাণ্ডুলিপির স্মৃতি ও প্রতিষ্ঠিত কাহিনীর নাট্যরূপায়ণেই তিনি তৃপ্ত থাকতে পারতেন ?) দ্বিতীয় দলের। ফলত, প্রথম প্রকাশেই তাঁর নাটক ষোলো-আনা শিল্পিত, তাতে এমন দুর্বলতার ছাপ নেই যা, অসামান্য প্রতিভার যাদুস্পর্শ পেয়েও, কোনো 'রাজা ও রাণী' বা কোনো 'কাতিলিন' -এ থাকে। যাকে বলা যায় নাটকের আভ্যন্তরীণ গণিত, যার প্রয়োগগুণে একজন কালিদাস বা রাসীন বা ইবসেন নাট্যকারমাত্রেরই আদর্শস্থানীয় এবং যার একান্ত অভাব বা গুরুতর বিপর্যয় ঘটলে এমনকি একজন সেক্সপিয়রও সত্যি সত্যি 'বর্বর' হয়ে উঠতে পারেন, তা বুদ্ধদেব যেন ভিতরে ভিতরেই রপ্ত করে ফেলেছেন। কাগজ টেনে সে-গণিত তাঁকে শিখতে হ'লো না, আকৈশোর কবিতা লিখে যে বিপুল ছন্দের তিনি অধিকারী হয়েছেন এই কুশলতা তারই অন্যতম এক স্ফূর্তি।

কিন্তু কেবল কলাকৌশল, কেবল গণিতজ্ঞান নয়; তাকে আশ্রয় ক'রে আছে উপলব্ধির সেই গভীরতা যা না-থাকলে এমন কি একজন কালিদাসও 'শকুন্তলা' লিখে উঠতে পারেন না, নেহাতই 'মালবিকাগ্নিমিত্র'-এর রচয়িতা হ'য়ে থাকেন। বুদ্ধদেবের নাটকের উপজীব্য অস্তিত্ববিষয়ক কয়েকটি উদ্ভাস, জীবনের কোনো-কোনো রহস্য। প্রেম কী, বেঁচে থাকবার আদৌ কোনো অর্থ আছে কি না, প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পীর কী সম্পর্ক, আদর্শবাদ আর উন্মাদনার যোগ কোথায়, সত্যের স্বরূপ কী, কাল কী—যেন কোনো ধর্মবকের এই প্রশ্নপরম্পরার উত্তর দেবার চেষ্টা করছেন বুদ্ধদেব, এবং করছেন যুধিষ্ঠিরের মতোই, আবেগের তাড়নায় নয়, প্রজ্ঞার প্রেরণায়। চিরকালীন এই প্রশ্নাবলি এবং সম্ভবত সেই কারণেই এখন পর্যন্ত লেখা বুদ্ধদেবের নাটকগুলির প্রধান তিনটির কাহিনীই পুরাণ থেকে আহৃত। পুরাণের পুনর্ব্যবহার প্রতিযুগই করে, রবীন্দ্রনাথও করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে একমাত্র

বুদ্ধদেবই বোধহয় তা সার্থকভাবে করেছেন। করে তিনি যে কেবল রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার অর্জন করেছেন, তা-ই নয়, এই শতকের অনেক প্রতীচ্য অগ্রজ ও সমবয়সীরও তুল্য হয়ে উঠেছেন। হোফমানষ্টাল কিংবা এলিয়ট, আনুইঁ কিংবা সার্ত্র-এর কথা, বুদ্ধদেবের নাটক পড়তে-পড়তে মনে পড়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ঐতিহ্য ও আধুনিকতা প্রসঙ্গে এলিয়ট যা-বলেছিলেন, বুদ্ধদেবে তা যেন আরেকবার প্রমাণিত হলো। প্রয়োজন ছিলো এই প্রমাণের, কারণ আমরা যেন প্রায় বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিলাম যে সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন তাৎক্ষণিক অনুভূতি-মালা। এই প্রমাণের তাৎপর্য আমরা আরো বুঝতে পারি যখন দেখি প্রমাণ করলেন এমন একজন রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে যাঁর খ্যাতি প্রধানত তাঁর নিরন্তর আধুনিকতার জন্যে।

বলা বাহুল্য, পুরাণই শাশ্বতের একমাত্র দর্পণ নয়; যেমন পুরাণে তেমনি বর্তমানেও বুদ্ধদেব জীবনের শাশ্বত রহস্যের প্রতিবিম্ব খুঁজেছেন। তাঁর তিনটি নাটকের আশ্রয় বর্তমান—আসলে চারটির, যদিও চতুর্থ নাটকটির মূল ভিত্তি পৌরাণিক। কিন্তু প্রতীচ্য অর্থে যাকে 'বাস্তববাদী' (পেশাদারী বাংলা মঞ্চে তাকেই কি অনেক সময় 'সামাজিক' বলা হ'য়ে থাকে?) নাটক বলা যায় বুদ্ধদেব তা লেখেননি—অন্তত এখন পর্যন্ত না। বাস্তবের ভূমিকা তাঁর নাটকে গৌণ, খুবই গৌণ, শুধু বর্তমানকে মূর্ত ক'রে তুলবার জন্যে যেটুকু প্রয়োজন তা-ই, বর্তমানের কোনো 'বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার' প্রচেষ্টা তিনি একেবারেই করেন নি। অর্থাৎ তিনি 'পুতুলখেলা' কিংবা 'প্রেত'—প্রণেতা ইবসেনের সগোত্র নন, সগোত্র নন 'তাঁতিরা'র হাউ পটমানের, এমন কি 'চেরিকুঞ্জ'—'তিনবোন'-এর চেকভেরও না: গোত্রে তাঁর ঈষৎ মিল আছে হয়তো মধ্য-বিশ শতকের কোনো-কোনো প্রতীচ্য নাট্যকারের সঙ্গে, যদিও তাঁদের কারো-কারোর সুচিন্তিত শৃঙ্খলাহীনতা তাঁর নাটকে নেই। জানিনা বুদ্ধদেব আমার সঙ্গে একমত হবেন কিনা, কিন্তু তাঁর অন্তত একটি নাটক প'ড়ে আমার সামুয়েল বেকেটের কথা মনে পড়েছিলো—শুধু বিষয়ের সামান্যতার জন্যে নয়, ভঙ্গির সাদৃশ্যের জন্যেও। আমার ধারণা বুদ্ধদেব 'বাস্তববাদী' নাটক কদাচ লিখবেন না, লিখতে পারেন না; যে-বস্তু-স্বাতন্ত্র্য থেকে তাঁর নাটকের উদ্ভব হয়েছে তার সঙ্গে বাস্তববাদের কোনোই যোগ নেই। বাস্তববাদ ভালো না মন্দ এ-প্রশ্ন এখানে উঠছে না, এবং বাংলাভাষায় 'বাস্তববাদী' নাটক আর কখনো লেখা হবে কি না সেই প্রশ্নও এ-প্রসঙ্গে অবান্তর, আমি আলোচনা করছি বুদ্ধদেবের নাট্যরীতি নিয়ে এবং আমার এই ভবিষ্যদ্‌বাণী—যদি একে ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্যিই বলা যায়—নেহাৎই সেই বিষয়ে।

(২)

এই নিয়ে পাঁচবার পড়লাম ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’। পাঁচবারই সেই পরম তৃপ্তি পেয়েছি যা কেবল মহৎ সাহিত্যেই পাওয়া যায়। এক অতি প্রাচীন পুরাণের এমন আধুনিক রূপায়ণ খুব বেশি দেখিনি। আধুনিক, কিন্তু এ-আধুনিকতা পুরাণে বিধৃত উল্লাসের বিকার ঘটিয়ে নয়, তারই সম্প্রসারণ করে, তাতেই বিশ শতকের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ভাবনার সঞ্চার করে। পুরাণের উল্লাস কামবিষয়ক—কাম কী করে উজ্জীবন আনে, কতটা প্রয়োজনীয় তা জীবনের পক্ষে, সে-ই তার প্রতিপাদ্য। বুদ্ধদেব এর সঙ্গে যোগ করেছেন প্রেম, উদ্‌ঘাটন করেছেন তার স্বরূপ, দেখিয়েছেন কামের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ নেই। সার্থক এই সংযোজন, কেননা এর ফলে একদিকে যেমন কাম তার পরিপূরক পেলো, তেমনি অন্যদিকে প্রেম পেলো তার বাস্তব ভিত্তি—যেমন একদিকে পুরাণ হয়ে উঠলো পূর্ণ, অন্যদিকে তেমনি রোমান্টিকতার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আমাদের প্রায়-বায়বীয় প্রেমাদর্শ ইন্দ্রিয়ের শক্ত মাটি পেলো। পুরাণ দেখেছিলো কেবল দেহকেই, বুদ্ধদেব তাতে প্রতিষ্ঠা করলেন মন, রোমান্টিকতা মনকেই সর্বস্ব জেনেছিলো, বুদ্ধদেব তাকে দিলেন দেহের আশ্রয়। ছত্রিশ বছর আগে বন্দীর বন্দনায় যে দ্বন্দ্বের শুরু হয়েছিলো ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’তে যেন তার সম্পূর্ণ নিরসন ঘটলো, অবশেষে খুলে গেলো সেই আযৌবন নন্দিত দুর্জ্ঞেয় রহস্যের দরজা। অন্তর্লোকে যা-দেখলেন তিনি তা অনেকটা উত্তর-পঞ্চাশে ইয়েট্‌স যা দেখতে পেয়েছিলেন তার মতো, কিংবা মধ্যবয়সেই গ্যেটের কাছে যা প্রতিভাত হয়েছিলো তার সঙ্গে তুলনীয়।

সম্প্রতি এক সমালোচক ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ পাঠের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে ‘চিত্রাঙ্গদা’র উল্লেখ করেছেন। ‘চিত্রাঙ্গদা’র কথা স্বভাবতই মনে পড়ে, তবে নেহাতই অভিঘাতের সমতার জন্যে নয়, বিষয়বস্তুর বহুলাংশ সাদৃশ্যের জন্যেও। চিত্রাঙ্গদাও কাম এবং প্রেমের সংঘাত নিয়ে রচিত, যদিও সে-সংঘাতের রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত নির্বহণ বুদ্ধদেবের নির্বহণ থেকে ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসপন্থী, কাম থেকে যে-প্রেমে উত্তরণ ঘটে তাঁর মতে তা বিবাহনির্ভর, সামাজিক অনুমোদনসাপেক্ষ। সন্তান সে-প্রেমের আশ্রয়। বুদ্ধদেব যে-প্রেমের কথা বলছেন তা মূলত এর বিপরীত, বিবাহ নয়, সন্তান নয়, সমাজ নয়, এক নিঃসঙ্গ জাগরণ। ‘চিত্রাঙ্গদা’য় যবনিকা নামছে অর্জুন আর চিত্রাঙ্গদার দ্বিতীয় ও দৃঢ়তর মিলনের মুহূর্তে, ‘তপস্বী ও ...ী’ শেষ হচ্ছে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর একক নিষ্ক্রমণে। কিন্তু তাই ব’লে

বুদ্ধদেব বিবাহ, সন্তান, সমাজকে অস্বীকার করছেন না—অস্বীকার তো করছেনই না, বরং সেই চক্রের অবিরাম ঘূর্ণনও তার উল্লাসে ধরা পড়েছে। কিন্তু সে-নাটকের নটনটী অঙ্গরাজ্য, শান্তা ও অংশুমান, চন্দ্রকেতু ও লোলাপাঙ্গী —'তপস্বী-যুবরাজ' ঋষ্যশৃঙ্গ ও 'বারাঙ্গনা-প্রেমিকা' তরঙ্গিণী তার বাইরে : 'তাদের ভূমিকা আজ বিচূর্ণিত ঘট, ঘটনার অধীন তারা নয় আর'। এই দ্বিতল নির্বহণে 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' হ'য়ে উঠেছে জীবনরহস্যের এক জটিল, এক উদার, এক পূর্ণ প্রতিভাস। তুলনায় 'চিত্রাঙ্গদা' কিঞ্চিৎ সরল, ঈষৎ একদেশদর্শী।

এই জটিলতা, এই ঔদার্য, এই পূর্ণতা কেবল নাটকের নির্বহণেই পরিস্ফুট নয়, নাটক যেখানে প্রথম আবর্তিত হচ্ছে সেই সন্ধিস্থলেও প্রতিভাত হয়েছে। সেই সন্ধিস্থলে, 'দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে' বুদ্ধদেবের নিজের উক্তিতেই বলছি, 'নায়ক-নায়িকার বিপরীত দিকে পরিবর্তন ঘটলো ; একই মুহূর্তে জেগে উঠলো তরঙ্গিণীর হৃদয় এবং ঋষ্যশৃঙ্গের ইন্দ্রিয়লালসা।' তরঙ্গিণী, বারাঙ্গনা, কাম তার জীবিকা, তার চর্চালব্ধ চরিত্র, সেই কাম থেকে সে যাত্রা করলো প্রেমের পথে।' প্রসঙ্গত বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'র কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানেও কামের প্রভাবে তপস্বীকে জয় করতে এসে বারাঙ্গনার তাই ঘটেছিলো। কিন্তু বুদ্ধদেব ঘটনাটাকে দ্বিগুণ অর্থবহ করে তুললেন ঋষ্যশৃঙ্গের বিপরীত পরিবর্তন দেখিয়ে। তরঙ্গিণী যেমন বারাঙ্গনা, ঋষ্যশৃঙ্গ তেমনি ব্রহ্মচারী (অর্জুনের মতো সাময়িক তাপস নন, আজন্মতপস্বী) ; তিনি কামকলায় অনভিজ্ঞই মাত্র নন, নারী কী তা সুদ্ধ জানেন না। তাঁর দেহে জাগলো কাম, হ'লো 'পতন'। আর কামের এই জাগরণ যে জীবনেরই এক শাশ্বত রহস্য ('পতন' কথাটা নিছক আমাদেরই সংস্কার) তা বুঝিয়ে দিলেন বুদ্ধদেব সংশ্লিষ্ট পুরাণের সাহায্যে। আমি বিভাণ্ডকের কামাবেশের সেই অতীত থেকে উদ্ধৃত ছায়াদৃশ্যের কথা বলছি। পুরাণের ভিতর পুরাণের এই ব্যবহার, প্রতিবিম্বের মধ্যে প্রতিবিম্ব স্থাপনের এই কৌশল, যে কতটা অন্তর্দৃষ্টি-জাত তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যখন দেখি বিভাণ্ডকের এই নিষেধাত্মক স্মৃতিচারণ সত্ত্বেও ঋষ্যশৃঙ্গ সেই পথেই পা বাড়িয়ে দেন। একই ঘটনার ফলে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর এই বিপরীত যাত্রা—একজনের সরলতা থেকে কামে, অন্যজনের কাম থেকে প্রেমে—যেন এক বিন্দুতে দুই বিপরীত শক্তির সংগম, যার আঘাতে নাটকে এলো এক দুর্লভ ঘনতা। পাশাপাশি দাঁড়ানো দুই বিপরীতমুখী জেট প্লেনের মতো কম্পমান তরঙ্গিণী ও ঋষ্যশৃঙ্গ : 'এসো প্রেমিক, এসো দেবতা,—আমাকে উদ্ধার করো', 'এসো দেহিনী, এসো মোহিনী—আমাকে তৃপ্ত করো'। মুহূর্তের আলিঙ্গন। তারপরেই সেই পুরাণোক্ত বৃষ্টি।

নাটকের দ্বিতীয় সন্ধিস্থলেও, অর্থাৎ নাটকের নির্বহণের পূর্বমুহূর্তে, এমনি দুই বিপরীতের সমাবেশ ঘটেছে, যদিও তার সিদ্ধি তার মানে নায়ক-নায়িকার পরিণতি—আর বিপরীত হচ্ছে না, হ'চ্ছে সমান্তর। চতুর্থ অঙ্কের তরঙ্গিণী এক উদ্‌ভ্রান্ত রোমান্টিক প্রেমিকা, তার অন্বিষ্ট সেই তপস্বী যে তাকে সরলতায় দীক্ষিত করেছে। অন্যপক্ষে ঋষ্যশৃঙ্গ এখন এক অভিজ্ঞ প্রণয়ী। প্রথম সাক্ষাতে পরস্পরের যে-ভূমিকা ছিলো তা এখানে উল্টে গিয়েছে—তরঙ্গিণীই যেন খানিকটা 'তপস্বী', আর তপস্বী 'তরঙ্গিণী'। এবার ঋষ্যশৃঙ্গই যেন—বুদ্ধদেব নিজেই ব'লে দিয়েছেন আমাদের—তরঙ্গিণীকে ভ্রষ্ট করতে চাইলেন, কিন্তু তপস্বীর হৃদয় জাগিয়ে দিলো তরঙ্গিণী। যে-তৃষ্ণা তাঁকে, অঙ্গদেশের যুবরাজ ও শান্তার পুত্রের জনক ঋষ্যশৃঙ্গকে, তলায়-তলায় অস্থির করে তুলেছিলো, যার শান্তি তিনি ভেবেছিলেন সেই নারীর সঙ্গে পুনর্মিলনে যে প্রথম তাঁর দেহে কাম জাগিয়েছিলো, সেই তৃষ্ণাই তরঙ্গিণীর প্রভাবে রূপ বদলে হ'য়ে উঠলো এক আত্ম-অন্বেষা। তরঙ্গিণীকে দেখে দৃষ্টি খুলে গেলো তাঁর, বুঝতে পারলেন তাঁর কাঙ্খণায় মুক্তির পথ আত্মনিগ্রহ নয়, কাম নয়, সন্ন্যাস—নিঃসঙ্গ, নিরালম্ব, নিরন্তর তপস্যা। তরঙ্গিণীকে দেখে, কেননা তরঙ্গিণীর চোখে, তপস্বীর দৃষ্টিতে তার এক বছর আগের আত্মদর্শনের স্মৃতি এখনো উজ্জ্বল—সেই স্মৃতি যা তাকে রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকার মতো উদ্‌ভ্রান্ত করে রেখেছে। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের গৃহত্যাগে তরঙ্গিণীও পেলো তার পথ : গৃহত্যাগ, সেই আরেক আমি-র জন্যে অপেক্ষা—একা, তপস্বিনী।

দু-জনেরই পরিণতি ঘটলো এক সত্যিকার তপস্যায় 'পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হ'লো' তারা। এই নিষ্ক্রান্তি, এই তপস্যা বুদ্ধদেবের ভাবনায় নতুন নয়—বুদ্ধদেবের অনুরাগ বোধহয় বরাবরই সম্ভাব্য-তপস্বী কিংবা তপস্বীপ্রতিম সংসার ত্যাগীদের প্রতি বেশি—তবে এতটা স্পষ্ট ও অর্থবহ হ'য়ে ব্যক্ত হয় নি এর আগে। কিন্তু যা ঈষৎ নতুন ঠেকলো তা হ'লো তপস্বী ও সংসারীর সহ-অবস্থান। লোলাপাঙ্গীদের প্রতি এতটা সমবেদনা এর আগে বুদ্ধদেবের চোখে পড়েনি, বিশেষত লোলাপাঙ্গীরা আর তরঙ্গিণীরা যখন একসঙ্গে উপস্থিত। যারা অসাধারণ নয়, জীবনে প্রেয়কেই চূড়ান্ত ব'লে জানে, তারাও যে জীবন রহস্যের দ্যোতনায় অংশ নিতে পারে, এই উপলব্ধি সম্ভবত বেশি দিনের পুরোনো নয়। এবং নেহাত প্রেয়োকামীদের প্রতি এই সহানুভূতি, 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র মতো 'কলকাতার ইলেকট্রা'তেও, আমার মতে, চোখে পড়ে। মনোরমার সঙ্গেও আমরা খানিকটা একাত্মতা অনুভব করি ; মনে হয়, সে নেহাতই পাপী নয়, তারও একটা বলবার কথা আছে। আর সেই সুশ্রী তরুণী কনকলতা, যে তার দিদিকে

ভালবাসে কিন্তু সেই সঙ্গে চায় সুখ চায় গৃহ, তাকে কি আমরা কেবল করুণাই করি? যে গ্রীক পুরাণ অবলম্বনে এই নাটক রচিত সেখানে নায়িকার পাপীয়সী মা বা ভীরু বোনের এই সংসারী মনস্তত্ত্ব অতটা প্রতিভাত হয়নি। এমনকি পুরাণটির যে-সব আধুনিক পুনর্লিখন হয়েছে তাদের সর্বত্রও তা স্পষ্ট নয়।

অবশ্য 'কলকাতার ইলেকট্রা'র প্রধান আকর্ষণ তার নায়িকা। নিছক আগামেম্নন-কন্যা ও আগামেম্ননের করুণ স্মৃতিরক্ষিণী নয় সে, বুদ্ধদেব তাকে ক'রে তুলেছেন এক বিশেষ মানসতার প্রতীক। সে-ও আসলে তপস্বিনী, কিন্তু তার তপস্যার নির্বহন পুণ্যের পথে নয়, ধ্বংসে। তাকে যেমন আমরা শ্রদ্ধা করি, তেমনি ভয়ও করি—শ্রদ্ধা এইজন্য যে সে একনিষ্ঠ আদর্শবাদী, নিঃসঙ্গ, নিষ্কম্প, সেই অন্য গ্রীক-কন্যা আন্তিগোনের মতো; আর ভয়ের কারণ তার প্রায়-উন্মাদনা। আর এই প্রায়—উন্মাদনার উৎস তার সেই আদর্শবাদই। আদর্শবাদ মাত্রেরই প্রান্তে আছে এক উম্মাদনা, যে-আদর্শবাদই হোক না তা—ব্যক্তিগত, নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনীতিক। ইতিহাসে বারবার আমরা এর প্রমাণ পেয়েছি: একজন সাভোনারোলা আর একজন রবস্পিয়েরের মধ্যে বোধহয় কোনো মৌল প্রভেদ নেই। টোমাস মান তাঁর 'ফিওরেন্ৎসা'য় এই উন্মাদনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে চেষ্টা করেছেন, রবীন্দ্রনাথও করেছেন তাঁর 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে। প্রাচীন গ্রীকরা এই উন্মাদনার কথা জানতো, সেইজন্যই সম্ভবত তারা পরিমিতিধর্ম প্রচার করেছিলো। উপরন্তু, আদর্শবাদমাত্রেই একদেশদর্শী। আদর্শবাদীর কাছে সত্য শুধু তার নিজের, ফলত অন্যকে দ'লে-পিষে এগিয়ে যেতে তার বিবেকে বাধে না। কিন্তু আদর্শবাদে উন্মাদনা ও একদেশদর্শিতা যেমন আছে, তেমনি তো আছে মহত্ত্বও। শত হ'লেও তার প্রাথমিক ভিত্তি তো শ্লাঘণীয়, তার যাত্রারম্ভ অনিন্দ্য। সুন্দর ও ভয়ংকরের এই অনিবার্য একাত্মতায় নিহিত রয়েছে জীবনের এক বিস্ময়োদ্রেকী রহস্য। বুদ্ধদেবের শম্পা সেই রহস্যেরই প্রতিবিম্ব।

সেইজন্যই বোধকরি শম্পা তাঁর নাটকের নায়িকা। এস্কিলসে ইলেকট্রা-চরিত্র উজ্জ্বল, কিন্তু মাতৃহন্তার ভূমিকা পুরোপুরি অরিস্টিসেরই। সফোক্লিস ইলেকট্রাকে উজ্জ্বলতর করেছেন, বিশেষত বিসদৃশ চরিত্র ক্রিসোথেমিসকে এনে এবং ক্লিটেম্নেস্ট্রার সঙ্গে ইলেকট্রার সংঘাত দেখিয়ে, কিন্তু তাঁর নাটকেও আরব্ধ কর্মে অরিস্টিস আগে থেকেই কৃতসংকল্প। ইউরিপিডিসে ইলেকট্রার ভূমিকা আরেকটু বাড়লো—মাতৃহত্যার পূর্বমুহূর্তে ঈষৎ দুর্বল-হ'য়ে-আসা অরিস্টিসকে খানিকটা উদ্বুদ্ধ করতে হচ্ছে তাকে—কিন্তু এই চরিত্রচিত্রণের পেছনে ইউরিপিডিসের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো পুরাণের সমালোচনা। পক্ষান্তরে, 'কলকাতার ইলেকট্রা'তে

অদ্রিনাথ বলতে গেলে নেহাতই যন্ত্র, যন্ত্রী আসলে শম্পা। শম্পাই বুঝিয়ে-বুঝিয়ে তাকে রাজি করালো, স্বহস্তে মাকে হত্যা না করলেও হন্তা আসলে সে-ই। ইলেক্‌ট্রাকে এই প্রাধান্যদানে বুদ্ধদেব ও'নীল কিংবা জিরোদু কিংবা সার্ত্র-এর সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু শম্পার পাশাপাশি, আগেই বলেছি, বুদ্ধদেব আরেকটি প্রতিবিম্ব সংস্থাপিত করেছেন—মনোরমা। (জিরোদুর ইগিসথাস প্রশংসনীয় হ'লেও আমার মতে কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস্য, ও'নীলের ক্রিস্টীন সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বটে, কিন্তু মনোরমার মতো স্বচ্ছ নয়।) মনোরমা পুরাণের সেই ক্লিটেম্‌নেস্ট্রা থেকে বেশ খানিকটা ভিন্ন; পুরাণে ক্লিটেম্‌নেস্ট্রাও ভয়ংকরী—অন্তত, তার আর যাই থাক, পুত্রস্নেহ নেই। অরিষ্টিস তার শত্রু, সেই বিষধর সর্প যে তাকে একদিন দংশন করতে আসবে; অরিষ্টিসের বিলোপই তার কাম্য। কিন্তু মনোরমা অদ্রিকে ভালোবাসে; শুধু যে ভালোবাসে তা-ই নয়, তার সুখের স্বপ্ন প্রধানত অদ্রিকে ঘিরেই। ও'নীলের মতো বুদ্ধদেব কোনো ফ্রয়েডীয় জটিলতা নিয়ে আসেন নি এখানে, মনোরমাকে একান্তই এক সুখকামী মাতা হিসেবে দেখিয়েছেন।

মনোরমা আর শম্পা—দুই বিসংবাদী প্রতিবিম্ব, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মানসতা। একজন চায় সুখ, অন্যজন ন্যায়। সুখের জন্য একজন ন্যায়ের দাবি অগ্রাহ্য করতে রাজি, ন্যায়ের জন্য অন্যজন সুখ বিসর্জন দিতে বদ্ধপরিকর। এবং দু-জনেই চায় অদ্রিকে—একজনকে তার দুঃসহ স্মৃতি ভুলিয়ে অদ্রি সুখী করবে, অন্যজনকে তার সংকল্প সিদ্ধ ক'রে শান্তি দেবে অদ্রি। নাটকটা যেন এক অর্থে অদ্রিকে নিয়ে মনোরমা আর শম্পার মধ্যে সংগ্রাম। জয় অবশ্য হ'লো শম্পারই—মনোরমা সুখের বদলে উপহার পেলো মৃত্যু, এবং সে-মৃত্যু এলো অদ্রিরই হাত থেকে। আর শম্পা পেলো শান্তি। যদিও সে-শান্তির রূপ মৃত্যু, তবু সে-মৃত্যু তার সিদ্ধিরই নামান্তর, কেননা তার একনিষ্ঠ সাধনা আসলে ছিলো মৃত্যুরই, পাপাশ্রিত সুখলিপ্সু জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আসলে তার পিতার মৃত্যুর উদ্ভাসে শম্পার মনে হয়েছিলো বেঁচে-থাকা ব্যাপারটা ঘৃণ্য, কারণ বেঁচে থাকতে হ'লে পাপাচরণ অনিবার্য, বেঁচে থাকতে হ'লে বিবেককে চোখ ঠারতেই হয়। সেইজন্যে কাম, বিবাহ, সন্তান—সংসারী অস্তিত্বের যা তুঙ্গতম অভিজ্ঞতা—তার কাছে বিবমিষার কারণ। পক্ষান্তরে, মৃত্যুই সেই অঙ্গন যেখানে পবিত্রতা সম্ভব। কিন্তু শম্পার এই মৃত্যুপ্রেম কোনো একক সাধনামাত্র নয়, কোনো জৈন সন্তের প্রায়োপবেশন বা খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসীর মরুযাপন নয়, এ বিদ্রোহ, এ পরিপার্শ্বে বিপ্লব আনে, ঘটায় বিস্ফোরণ। এর পরিণাম ধ্বংস, আর তার প্রধান সাক্ষ্য, না মনোরমা নয়, অদ্রিনাথ—সেই প্রায়-কিশোর তরুণ যে তার দিদিকে

যেমন ভালোবাসে তেমনি বাসে মাকেও, যে একুশ বছর বয়সে এক রাত্রিতেই পাগল হ'য়ে গেলো।

(৩)

তপস্যারই দুই ভিন্ন দর্পণ 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' এবং 'কলকাতার ইলেক্‌ট্রা'। এক তপস্যা সংসার ধর্মেরই সম্পূরক, তার সিদ্ধিতে বিন্দুমাত্র স্বাস্থ্যহানি ঘটে না সংসারের; অন্য তপস্যা সংসার বিরোধী, সংসারের বিনাশ ঘটিয়েই তার সিদ্ধি। এই দুই মুখ্য প্রতিবিম্ব ছাড়াও তপস্যার রূপ আরো আছে বুদ্ধদেবের নাটকে—আমি 'বাবু ও বিবি' এবং 'সত্যসন্ধ'র কথা বলছি। এবং সেই সঙ্গে আছে সংসার কী সেই রহস্যেরও দু-টি দর্পণ: 'পাতা ঝ'রে যায়' ও 'কালসন্ধ্যা'। 'বাবু ও বিবি'র বিষয় শিল্প, এই প্রকৃতিশাসিত জগতে শিল্পী কী-ক'রে এক স্বেচ্ছানির্বাসনের সাহায্যে রক্ষা করে সেই অতিপ্রয়োজনীয় স্বাধীনতা যা ব্যতিরেকে সৃষ্টিকর্ম অসম্ভব —তা-ই এ-নাটকের উপজীব্য। 'সত্যসন্ধ'র উপজীব্য অন্য-এক তপস্যা; সত্য ব'লে শেষ পর্যন্ত কিছু আছে কি না তার এই সন্ধান যেন এই আর্ত বিশ শতকের ঈশ্বর-অন্বেষারই অনুরূপ। 'পাতা ঝ'রে যায়'-এর উদ্ভাস অস্তিত্ববিষয়ক এক নির্বেদের, এক গভীর শূন্যতার, যেন কিছুরই কোনো মানে নেই জীবনে, যেন বেঁচে-থাকা আসলে মৃত্যুরই নামান্তর। কিন্তু এই শূন্যতার উত্তর মিললো 'কালসন্ধ্যা'য়—যেন 'পাতা ঝ'রে যায়' ও 'কালসন্ধ্যা' এক দ্বৈত সংলাপ—মিললো মৌষল পর্বের সেই আশ্চর্য পুরাণের এই আধুনিক পুনর্লিখনে। কিন্তু না, 'বাবু ও বিবি' বা 'সত্যসন্ধ', 'পাতা ঝ'রে যায়' কিংবা 'কালসন্ধ্যা'র কোনো বিশ্লেষণের চেষ্টা এখানে করবো না--পরিসরের অভাব। অদূর ভবিষ্যতে সংসার ও তপস্যার এই দর্পণ-চতুষ্টয় নিয়েও আলোচনা করবার ইচ্ছে রইলো।

সাদৃশ্যের সন্ধানে : 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' এবং 'রাত ভ'রে বৃষ্টি'

সুবীর রায়চৌধুরী

প্রবন্ধের শিরোনাম দেখে পাঠকের ধাঁধা লাগতে পারে। দুটি বইয়ের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়?—একটি হ'লো নাটক, তা-ও আধুনিক জীবনের নয়, পুরাণের পটভূমিতে লেখা। অন্যটি উপন্যাস এবং তার বিষয় হ'লো একালের বিবাহ ও পরকীয়া প্রেম। তাছাড়া পাঠক হিসেবে এ-তথ্যও আমাদের সবারই জানা যে, 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকটি অকাদেমী পুরস্কার পেয়েছিলো, অন্যদিকে 'রাত ভ'রে বৃষ্টি' অভিযুক্ত হয়েছিলো অশ্লীল ব'লে। সমকালের পুরস্কার বা তিরস্কারের তাৎপর্য যদি উপেক্ষা করি, তাহ'লে দেখতে পাবো 'রাত ভ'রে বৃষ্টি'র চেয়ে 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র বক্তব্য অনেক বেশি 'বৈপ্লবিক', মধ্যবিত্ত মানসিকতার পক্ষে অনেক বেশি অস্বস্তিকর শেষোক্ত গ্রন্থটি। প্রেমহীন দাম্পত্য-জীবনকে শুধু অভ্যেসের বশে আঁকড়ে ধরবার কোনো চেষ্টাই নাটকটিতে নেই। ঋষ্যশৃঙ্গ সন্তানের পিতা হ'য়েও পারেন এক মুহূর্তে বিবাহ ভেঙে ফেলতে, নিজের স্ত্রীর পুনর্বিবাহ দিতে পারেন পত্নীর প্রাক্তন প্রেমিকের সঙ্গে। কোনো সামাজিক অনুশাসন বা অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁকে পীড়িত করেনি। আর নয়নাংশু-মালতীর প্রেমহীন দাম্পত্য-জীবনের পরিণতি কী?

> এটা ফরাসি বিপ্লব নয়, রুশ বিপ্লব নয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নয়—পঞ্চাশ বছর পরে এর কী চিহ্ন থাকবে? দশ বছর পরে এর কি চিহ্ন থাকবে? পাঁচ বছর পরে এর কী চিহ্ন থাকবে? জীবন—স্টিম-রোলার, ভীষণ, ক্ষমাহীন, দয়াময়। এমনি চলবে। একদিন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠবে ওরা—মালতী আর জয়ন্ত। আর নয়নাংশু। কষ্ট ম'রে যাবে, ইচ্ছে ম'রে যাবে, শরীর ধ্ব'সে যাবে, গনগনে রাগের উনুনে প'ড়ে থাকবে শুধু একমুঠো ছাই।...ছেঁ ড়া তা র আ র জো ড়া লা গ বে না, হা রা নো সু'র ফি রে পা'বে না ক খ নো—যে তোমাকে ভালবাসে না তার সঙ্গে, যাকে তুমি ভালোবাসতে ভুলে যাবে তার সঙ্গে—এমনি ক'রে বাঁচবে, এমনি ক'রে সুস্থ শরীর বুড়ো হবে। কিন্তু কী এসে যায়, বলো—ভালোবাসা জরুরি নয়। স্বামী-স্ত্রী জরুরি, বেঁচে থাকাটা জরুরি (২য় সং, পৃঃ ১০৪)।

এর সঙ্গে সহজেই মনে আসে শান্তা এবং অংশুমানের প্রতি ঋষ্যশৃঙ্গের শেষ সম্ভাষণ :

> "ঋষ্যশৃঙ্গ।...শান্তা, এতদিনে সত্য বলার সময় হ'লো। রাত্রে, অন্ধকারে—তুমি যখন আমার বাহুবন্ধে ধরা দিতে, আমি কল্পনা করতাম তুমি শান্তা নও—সেই অন্য নারী। কিন্তু অন্ধকারেও সমতা নেই, শান্তা, অন্ধকারেও লুপ্ত হয় না স্মৃতি। আমি তাই অতৃপ্ত।
>
> (৪র্থ মুদ্রণ, ৪র্থ অঙ্ক, পৃ ৮৩)
>
> * * * *
>
> শান্তা, অংশুমান, তোমরা আমার শৃঙ্খল ছিন্ন করলে। আমি তোমাদের নমস্কার জানাই। শান্তা, আজ থেকে তুমি নিজেকে স্বতন্ত্রা ব'লে গণ্য কোরো, কুমারী ব'লে গণ্য কোরো। আমি তোমাকে কৌমার্য প্রত্যর্পণ করলাম, আর অংশুমানকে—তাঁর রাজত্ব। (ঐ পৃ: ৮৬)

শান্তাকে কৌমার্য প্রত্যর্পণ অথবা ঋষ্যশৃঙ্গের সন্ন্যাসে প্রত্যাবর্তন, আধুনিক পাঠকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হ'তে পারে। কিন্তু আমি আপাতত ঘটনাবলির সম্ভাব্যতা বিচার করছি না, আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই ঋষ্যশৃঙ্গের স্বভাবের ঋজুতার দিকে—প্রেমিক ব'লেই তিনি পারেন নির্মম হ'তে। বিবাহরূপ প্রতিষ্ঠান যখন সেই শুদ্ধ প্রেমের বাধাস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়ায়, তখন তিনি তা অনায়াসেই ভেঙে দিতে পারেন।

এই বিদ্রোহ বুদ্ধদেব বসুর কোনো সামাজিক উপন্যাসের নায়কের মধ্যে কদাচিৎ পাই—তাদের কেউ-কেউ শেষ পর্যন্ত অহংমগ্নতায় বিবাহকেই এড়িয়ে চলে, কেউ আত্মহত্যা করে, কেউ পাগল হ'য়ে যায়, কেউ বা সংসার থেকে সাহিত্যে খোঁজে মুক্তি। কিন্তু তাঁর যুধিষ্ঠির-স্বভাবী নায়কেরা বিষাদ বা বিতর্ক ছাড়িয়ে বিদ্রোহে অপটু। বুদ্ধদেব বসুর একটি প্রিয় থীম হ'লো দাম্পত্য-জীবন ও বিবাহোত্তর প্রেম। 'সাড়া' থেকে 'রাত ভ'রে বৃষ্টি'-র ব্যবধান চল্লিশ বছরের কিছু কম। এই দীর্ঘ সময়ে ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব বসুর প্রধান আগ্রহ কিন্তু এই সমস্যাতেই নিবদ্ধ। তিনি যখন গ্রীক পুরাণকাহিনী ইলেকট্রাকেও কলকাতায় নিয়ে আসেন, তখনও তাঁর বেশি মনোযোগ ইলেকট্রা নয়, ইলেকট্রার মায়ের অবৈধ প্রেমের জন্য পাপবোধ। আসলে বলা যায়, বুদ্ধদেব বসু তাঁর পরিচিত ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে চেয়েছেন পৌরাণিক প্রসঙ্গের মধ্যে। এই পটভূমি-পরিবর্তনের পেছনে আছে তাঁর মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের সঙ্গে বোঝাপড়া। ঋষ্যশৃঙ্গ চরিত্রটি সেদিক

দিয়ে তাঁর ইচ্ছা পূরণের প্রকল্পন। পুরাণ-প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর আগ্রহ তাঁর সাহিত্য-জীবনের শুরু থেকেই লক্ষ্য করা যায়।* কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের পুনঃসৃষ্টিতে তিনি অতীতচারী নন, অতীতকে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

'তপস্বী ও তরঙ্গিণী': রচনাকাল এপ্রিল ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ: একই বছরে কোনো একটি শারদীয় সংখ্যায় 'রাত ভ'রে বৃষ্টি' প্রথম প্রকাশিত হয়। এটা খুবই স্বাভাবিক যে প্রায় একই সময়ে লেখা রচনায় চিন্তা-ভাবনার মধ্যে একটা সাযুজ্য থাকবে। নাটকটির ভূমিকায় বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন:

> ...একটি পুরাণকাহিনীকে আমি নিজের মনোমতো ক'রে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা।...আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী পুরাকালের অধিবাসী হ'য়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন।

পুরাণের পুনর্জন্মে নাট্যকার গুরুত্ব দিয়েছেন প্রেম, বিবাহ এবং বিবাহোত্তর প্রেমের ওপর। বলা বাহুল্য মূল পুরাণে ঝোঁকটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে। ঋষ্যশৃঙ্গের দাম্পত্য-জীবনের কোনো সমস্যার ইঙ্গিত রামায়ণ, মহাভারতে নেই। বরং রামায়ণে দেখতে পাই দশরথের পুত্রকামনায় যজ্ঞানুষ্ঠানে ঋষ্যশৃঙ্গ সস্ত্রীক এসেছেন প্রধান যাজকরূপে।

আরেকটি জিনিষ লক্ষ্য করবার মতো। ঋষ্যশৃঙ্গের মূল আখ্যানে বারাঙ্গনারা বহু এবং নাম-পরিচয় হীন। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর নাটকে কৌমার্যহারিণীরূপে একজন বারবণিতার কথাই বর্ণিত। রতিমঞ্জুরী, বামাক্ষী, অঙ্গনা, জবানা প্রমুখ বারাঙ্গণার উল্লেখমাত্র আছে কিন্তু নাটকে তাদের কোনো ভূমিকা নেই। সে শুধু বিশেষ নয়, বিশিষ্ট। বারাঙ্গনা চরিত্র 'রাত ভ'রে বৃষ্টি'তেও আছে। কিন্তু নায়কের জীবনে অথবা সমগ্র উপন্যাসে তার প্রভাব খুবই অল্প—সে নামহীন, ব্যক্তিত্ব-ক্ষমতা-প্রতিপত্তিহীন। নয়নাংশু ঋষ্যশৃঙ্গ নয়।

তা সত্ত্বেও সে নয়নাংশুকে seduce পর্যন্ত করতে পারে না। মর্যাদা এবং বৃত্তির দিক দিয়ে তরঙ্গিণীর স্থান শেষ পর্যন্ত হয়তো ঐ নামহীন বেশ্যা বা মপাসরি কোনো পতিতা চরিত্রের মতোই। সমাজ রাষ্ট্র রাজা মন্ত্রী সবাই তাকে প্রয়োজনে ব্যবহার করে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লে তাকে ভুলে যায়। সেখানে ব্যক্তিরূপে

* এ-বিষয়ে উৎসাহী পাঠক 'যাদবপুর জর্নাল অব কম্পারেটিভ লিটারেচার'-এ প্রকাশিত আমার লেখা ক্যালিওপে-র সীমানা পেরিয়ে: 'মহাভারতের কথা' প্রবন্ধটি দেখতে পারেন।

তরঙ্গিণী অনুপস্থিত। তরঙ্গিণী ব্যক্তি হ'য়ে উঠলো ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে। বুদ্ধদেব বসুর প্রথম উপন্যাস 'সাড়া'তেও গণিকা চরিত্র আছে। কিন্তু নির্মলা রাজলক্ষ্মীদেরই উত্তরসাধিকা—একনিষ্ঠ প্রেমের প্রতিমূর্তি। অনেকে বলতে পারেন তরঙ্গিণীও তো তাই। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, নির্মলা এবং তরঙ্গিণীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হ'লো প্রথমজন পরিবেশ-বিচ্ছিন্ন, জীবিকার প্রভাবশূন্য, দ্বিতীয়জন তার স্বধর্ম গণিকাবৃত্তিতে সুপটু। তরঙ্গিণী ঋষ্যশৃঙ্গকে বলে, 'তুমি আমার মৃগয়া। তুমি আমার ঈশ্বর (পৃ ৪৫)।' মৃগয়া থেকে ঈশ্বরত্বে পৌছনোর এই কঠিন অভিজ্ঞতার আরেকটি নজির আছে টলস্টয়ের 'ফাদার সার্জিয়াস' গল্পের মাকোভ্‌কিনা-র। মাকোভ্‌কিনা অবশ্য পেশাদার গণিকা নয়, প্রেমবিলাসিনী।

রূপ থেকে অরূপে, মোহ থেকে মুক্তিতে পৌছনোর সাধনা ছিলো বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণিরও। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিণীকে নিয়ে বুদ্ধদেব বসু আরেকটি ভক্তিরসাশ্রিত নাটক লিখতে চান নি। অবশ্য আপাতভাবে মনে হয় 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকের পরিণতিও তো তাই—ঋষ্যশৃঙ্গ সন্ন্যাসে ফিরে গেলেন, তরঙ্গিণীও ভোগবিলাসের পথ ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করলো। দুজনের লক্ষ্য এক, কিন্তু পথ আলাদা। প্রসঙ্গত ঋষ্যশৃঙ্গ-তরঙ্গিণীর কথোপকথন থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

> ঋষ্যশৃঙ্গ। কেউ কি কোথাও ফিরে যেতে পারে, তরঙ্গিণী? আমরা যখনই যেখানে যাই, সেই দেশই নূতন। আমার সেই আশ্রম আজ লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে। সেই আমি লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছি। আমাকে সব নূতন ক'রে ফিরে পেতে হবে। আমার গন্তব্য আমি জানি না, কিন্তু হয়তো তা তোমারও গন্তব্য। যার সন্ধানে তুমি এখানে এসেছিলে, হয়তো তা আমারও সন্ধান। কিন্তু তোমার পথ তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে, তরঙ্গিণী।
>
> তরঙ্গিণী। প্রিয়, আমার প্রিয়তম, আমি কি আর কোনোদিন তোমাকে দেখবো না?
>
> ঋষ্যশৃঙ্গ। আমাকে বাধা দিয়ো না, তরঙ্গিণী। তুমি তোমার পথে যাও। হয়তো জন্মান্তরে আবার দেখা হবে।
>
> (৪র্থ মুদ্রণ, ৪র্থ অঙ্ক, পৃ ৮৮)

কোন্‌ পথের নির্দেশ দিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ? তোমার পথের অর্থ কি বারাঙ্গনার স্বধর্মবৃত্তি? না, ঋষ্যশৃঙ্গ শুধু মুক্তি দিলেন—সে-মুক্তি ভক্তির পথে আসবে না কি

স্বধর্মাচরণের মধ্যে নিহিত আছে, তা একমাত্র স্থির করতে পারে তরঙ্গিণী নিজেই। কেউই আমরা অতীতে ফিরে যেতে পারি না—জীবন চলমান ব'লেই প্রবাহমান। অপাপবিদ্ধ ঋষ্যশৃঙ্গ আর নেই। তিনি সন্ন্যাসে প্রত্যাবর্তন করলেও বিভাণ্ডক মুনির আশ্রমে ব্রহ্মচারী হ'য়ে আর ফিরে যেতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে রাজপুরোহিতের শেষ উক্তি স্মরণীয় :

> কিন্তু এই চক্র থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'লো দু-জনে,
> অলক্ষ্য পথে, আত্মবশ, নিঃসঙ্গ :
> তাদের ভূমিকা আজ বিচূর্ণিত ঘট, ঘটনার অধীন তারা নয় আর—
> এক তপস্বী-যুবরাজ, এক বারাঙ্গণা-প্রেমিকা।
>
> * * * *
>
> যেমন রজ্জু থেকে গাভীরা, তেমনি কর্ম থেকে তারা নিঃসৃত।
> --এই ফলাফল, এই চরম : এরই জন্য তোমরা।

(৪র্থ মুদ্রণ, ৪র্থ অঙ্ক, পৃ ৯১-২)

আর শান্তা ও অংশুমান রাজমন্ত্রীকে 'করযোড়ে, একসঙ্গে' বলেন :

'পিতা, আমরা ধন্য।' আজকের সামাজিক জীবনে শান্তা-অংশুমানকে তরঙ্গিণী-ঋষ্যশৃঙ্গের তুলনায় অনেক বেশি পরিচিত মনে হয়। 'রাত ভ'রে বৃষ্টি'র শেষ অনুচ্ছেদে আমরা যেন আমরা শান্তা-অংশুমানের জীবনদর্শনের প্রতিধ্বনি শুনি :

> একটা হাত কাটা গেলেও বেঁচে থাকে মানুষ, একটা ফুশফুশ নষ্ট হ'লেও বেঁচে থাকে—সে-তুলনায় কত ছোটো এই ক্ষতি, কত তুচ্ছ এই ঘটনা! ধূসর-কালো নয়, উজ্জ্বলও নয়, হিংস্র সুন্দর মহৎ নিষ্ঠুর ভোগী ত্যাগী কোনোটাই নয়—কোটি-কোটি মানুষ—জীবন-অফুরন্ত, মূর্খ, অন্তহীন। (পৃ ১০৪)

সেই কলঙ্কের নিন্দাপক্ষে

নিরঞ্জন হালদার

[বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য বিষয়ে কোনো আলোচনা নয়, বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যিক জীবন নিয়ে কিছু ভাবনা চিন্তার খসড়া]

বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে কারও না কারও কাছে নিন্দা শোনেননি, এমন শিক্ষিত বাঙালী একজনও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। আমি জানিনা, কেবল সাহিত্যকে ভালবাসার জন্য পৃথিবীর আর কোনও কবি, ঔপন্যাসিক বা প্রবন্ধকারের উপর সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে এত বেশী নিন্দা বর্ষিত হয়েছে কিনা। অনেকের সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে কিছু না বলা গেলেও তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন হয়তো সমালোচনার উর্দ্ধে নয়! কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তো ওই জাতীয় কিছুই বলার সুযোগ ছিল না! বরং তার ব্যক্তিগত জীবন, দিন যাপনের কাহিনী শুনলে তো তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আপনা-থেকেই মাথা নত হয়ে আসে। জন্ম মুহূর্তে যাঁর মা মারা যান এবং বাবা কখনও ছেলের খোঁজ নেননি, মানুষ হয়েছেন দিদিমা—দাদা মশাইয়ের কাছে, এবং দাদা মশাই মারা যাওয়ার পর কী দারিদ্র্যের মধ্যে সাহিত্য চর্চা করেছেন, তা জানতে পারা যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা তাঁর চিঠিতে। টাকা ধার করে ঢাকায় পত্রিকা বের করেছেন, কিন্তু বন্ধু অচিন্ত্যকে নিয়মিত চিঠি লিখতে বা তাঁর কাছে লেখা পাঠাতে পারছেন না, কারণ খাম বা টিকিট কোনটাই ডাকঘর থেকে ধারে পাওয়া যায় না। আধুনিক কবিতাকে জনপ্রিয় করার জন্য প্রথমে "প্রগতি" এবং তারপর "কবিতা" পত্রিকা এবং "এক পয়সায় একটা" সিরিজে এক এক জন কবির ছোট ছোট বই বের করেছেন কিন্তু নিজের আর্থিক সামর্থ্যের কথা কখনও গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নি। সাহিত্য চর্চার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই তিনি রিপন কলেজে পড়ানোর চাকরি ছেড়ে দেন! চাকরি পেয়ে কেবল সাহিত্যের জন্য তা ত্যাগ করার ঘটনা ভারতে এই প্রথম। কেবল লেখার উপর নির্ভর করে সংসার চালানোর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুই প্রথম নয়, এ ব্যাপারে শরৎচন্দ্র তাঁর পথিকৃৎ।

অবশ্য বুদ্ধদেব বসু শরৎচন্দ্রের মতো জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হতে চান নি, প্রধানত কবি হিসাবেই বাংলা সাহিত্যে তিনি স্থান চেয়েছিলেন। পরে বাংলা সাহিত্যের

প্রতিটি শাখাতেই বুদ্ধদেব বসু কিছু না কিছু অবদান রেখে গিয়েছেন। তিনি কি ক্যাকেলের মূলধন বিনিয়োগের তত্ত্ব জানতেন? কেবল একটা শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করলে আর্থিক মন্দা, বা অন্য কোনও কারণে গোটা মুলধনটাই ডুবে যেতে পারে। তাই সাবধানী বিনিয়োগকারীর উচিত একই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করা। বুদ্ধদেব একটা ঝুড়িতে সওদা রাখেন নি, রেখেছেন একসঙ্গে অনেক ঝুড়িতে। না, বু. ব. ক্যাকেলের তত্ত্ব পড়েন নি, সাহিত্যকে ভালবেসেই তার নানা শাখায় তিনি বিচরণ করেছেন। কোন্ লেখক না চান জনপ্রিয়তা অর্জন করতে? কিন্তু বু. ব. নিছক জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য লেখেন নি। আর ওই জাতীয় জনপ্রিয়তার মোহ ছিল না বলেই, রাজনৈতিক দল বা অন্য কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি যুক্ত হন নি। তাঁকে দেখা যেত কেবল কবিতা-ভবনে, আর কোনো আড্ডায় নয়, আর কারও বাড়িতে নয়। হয়তো আইয়ুবের বাড়িতে গিয়েছেন, কিন্তু গিয়েছেন উৎসর্গীত বইটি পাওয়ার পর এ কথা জানাতে যে "আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ" বইটির প্রতিটি বক্তব্যের সঙ্গে তিনি ভিন্ন মত পোষণ করেন। বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর মতো দ্বিতীয় কোনো পড়ুয়া ছিল না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি সাহিত্যের জন্য ব্যয় করেছেন। তিনি কখনও দুপুরে ঘুমোতেন না, সারা দিন লিখতেন আর পড়তেন। সন্ধ্যায় আমার মতো আরও অনেকে যখন আড্ডা দিতে গিয়েছে, বু. ব. সেই সময়ে হয়তো টেবিলে বসে কাজ করছেন,—চিঠির জবাব দিচ্ছেন বা প্রুফ দেখছেন কিংবা লেখা শেষ করছেন। কাজ শেষ হলেই আমাদের সামনে এসে বসতেন। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এই জাতীয় নিষ্ঠা, এই জাতীয় একাগ্রতা—আর কারও মধ্যে দেখা গিয়েছে বলে শুনি নি। আর্থিক লাভের কথা ভেবে কখনও তিনি কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির দ্বারস্থ হন নি। তিনি কম্যুনিষ্ট বিরোধী হিসাবে নিন্দিত। কিন্তু কেন কম্যুনিষ্ট বিরোধী, এবং তা কতটা তাঁর সাহিত্যকে ভালোবাসার জন্য, এই জরুরী প্রশ্নটা আজও আলোচিত হয় নি। একজন সুস্থ, যুক্তি-বুদ্ধির সম্পন্ন মানুষ হিসাবে তিনি কম্যুনিজমের মতো, হিন্দু রিভাইভ্যালইজম, সাম্প্রদায়িকতা, ফ্যাসিবাদ ও এক-নায়কত্বের বিরুদ্ধে প্রয়োজনের সময় কলম ধরেছেন, সভায় এসে বক্তৃতা করেছেন দিনের পর দিন সন্ধ্যায় আলোচনা করেছেন। তাঁর কবিতায় এইসব বিরোধিতার কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না, এইসব পাওয়া যাবে তাঁর অজস্র প্রবন্ধে। আর কবিতাকে রাজনৈতিক স্লোগানের চারিসীমানার বাইরে রাখতে চেয়েছেন বলেই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্নে তিনি কলম ধরেছেন। তাঁর কম্যুনিষ্ট-বিরোধিতা ছিল তাঁর সামগ্রিক একনায়কত্ব-বিরোধিতারই অঙ্গ। তাঁর সাহিত্যিক চিন্তা-ভাবনা

ছিল সমকালীন অন্য কবিদের চিন্তা-ভাবনা থেকে ভিন্ন। লেখক লিখবে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে। এই অভিজ্ঞতা অর্জনে সব চেয়ে বড় সহায়ক হচ্ছে অধীত বিদ্যা। তাঁর জীবনযাত্রা থেকে মনে হত, সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে পড়াশুনার কোন বিকল্প নেই। এই পড়াশুনা ও লেখার ব্যাপারে কোনো রকম প্রতিবন্ধক, কোনো গোষ্ঠী, রাজনৈতিক দল বা রাষ্ট্রীয় নির্দেশ তিনি মানতে রাজী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন, কারও নির্দেশমত সাহিত্য চর্চা ও রচনা সামগ্রিকভাবে সাহিত্যকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। তবে তিনি বিশ্বাস নিয়েই বসে থাকেন নি, বাধাহীন সাহিত্যচর্চার পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে সারা জীবন কলম ধরেছেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও আমেরিকায় অধ্যাপনা করার কয়েক বছর ছাড়া বুদ্ধদেব বসুকে লেখার উপরেই নির্ভর করতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও লেখক হিসাবে তাঁর মর্যাদা অনুসারে টাকা না দেওয়ায় তিনি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকাগুলির শারদীয়া সংখ্যাগুলিতে দীর্ঘকাল লেখেন নি। কবিতার জন্য পত্র পত্রিকায় পৃথক পাতার ব্যবস্থা না হলে সেই পত্রিকায় কবিতাই পাঠান নি। শেষ জীবনে, বিশেষ করে প্রতিভা বসু পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ার পর বু. ব. আর্থিক কষ্টে ছিলেন। কিন্তু তিনি তখনও অর্থের জন্য কারও দ্বারস্থ হন নি, বাজারে বেশী বিক্রির কথা ভেবে কোনো বই-ও লেখেন নি।

বুদ্ধদেব বসুর বিরুদ্ধে সমস্ত নিন্দা তাঁর সাহিত্যকে কেন্দ্র করে। সে যুগে নিছক সাহিত্যচর্চাকে ভাল চোখে দেখা হত না। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছেন না, এমন ব্যক্তি যদি দেশের সব কিছু ভালো বলার বদলে বিদেশী চিন্তা ভাবনা, তা সে যে বিষয়েই হোক না কেন, তাঁর লেখার মাধ্যমে প্রচারে সচেষ্ট হন, তা হলে তো তাঁর দেশপ্রেম নিয়েই প্রশ্ন উঠতে পারে। স্যার সি-পি-স্নো বিজ্ঞানী ও অ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে দুই ধরনের কালচারের কথা বলেছেন। কিন্তু অ-বিভক্ত বাংলায় ভিন্ন ধরনের "দুই কালচারের" অস্তিত্ব ছিল। রাজনীতি নিয়ে এই দুই কালচারের সীমারেখা নির্ধারিত হত। এই রাজনীতিকদের কালচারে রবীন্দ্রনাথের কোনো স্থান ছিল না, তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে নজরুল ছিলেন বড় কবি। আর রবীন্দ্রনাথ গ্রামের কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে হাত দিচ্ছেন, শ্রীনিকেতন স্থাপন করছেন, ছেলেকে আমেরিকায় পাঠাচ্ছেন কৃষি বিষয়ে পড়াশুনা করতে, আমেরিকা থেকে উন্নত জাতের গমের বীজ আনাতেন, এসব বাংলার রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের জানাই ছিল না। এই রাজ-নৈতিকদের মধ্যে আবার নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃতি পেত না। মেয়েরাও যে পুরুষের মতো একজন মানুষ এবং তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষমতা তাদের

হাতেই থাকা উচিত—এইসব চিন্তা-ভাবনা রাজনীতিকরা কল্পনাই করতে পারতেন না। বাঙলার সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে ব্রহ্মচর্যই আদর্শ ছিল এবং মেয়েদের পায়ের দিকে তাকানোর প্রতিজ্ঞা নিতে হত। সম্প্রতি প্রকাশিত একটা বই থেকে আমরা জানতে পারি যে, সন্ত্রাসবাদী দলে আগে মেয়েদের নেওয়াই হত না, শ্রীসঙ্ঘ গোষ্ঠী মেয়েদের সন্ত্রাসবাদী কাজের সঙ্গে যুক্ত করার পর অন্যান্য গোষ্ঠীতেও মেয়েদের রিক্রুট আরম্ভ হয়। কিন্তু মেয়ে-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মানসিকতা একই পর্যায়ে থেকে যায়। ফলে তাঁরা বুদ্ধদেব বসু জাতীয় লেখকদের রচনা সহ্য করতে পারেন নি। আর বুদ্ধদেব বসুর ছোট গল্প ও উপন্যাসের চরিত্রগুলি আমাদের চেনাশোনা, কবিতায় যে প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হচ্ছে, সে-প্রেমিকাও হয়তো বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। কিন্তু বয়স্ক পাঠক কি এসব বিষয় সহ্য করতে পারে? মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "পদ্মানদীর মাঝি"তে স্বামী-পরিত্যক্তা শালিকা কপিলার সঙ্গে কুবের মাঝি'র বাইরে গিয়ে রাত্রি বাস করা এবং অন্যত্র স্নান করতে গিয়ে কুবের কর্তৃক কপিলাকে জড়িয়ে ধরা অশ্লীলতার অপরাধে অপরাধী হয়নি। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর সমাজের মেয়েদের নিয়ে অচিন্ত্যকুমার এবং তারাশঙ্করের অনেক কাহিনী আছে কিন্তু সে-সব সাহিত্য হিসাবে গণ্য হয়েছে, ও গুলির জন্য অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠেনি। বুদ্ধদেব তো ওইসব শ্রেণীর নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে লেখেন নি! তাই সমাজের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর জীবনযাত্রা নিয়ে যে-সব ঘটনা লিখলে মহৎ সাহিত্য হিসাবে সার্টিফিকেট পাওয়া যায়, নিজেদের ঘরের মেয়েদের নিয়ে সেই জাতীয় ঘটনা লিখলে ঘরের মেয়েদের চরিত্র খারাপ করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। বুদ্ধদেব বসুকে "কেন আঁতুড় ঘরেই মেরে ফেলা হয়নি", সমাজের অভিভাবকদের এ-জাতীয় প্রশ্নের পটভূমিকা এটাই। বুদ্ধদেব যাদের ভালো করে জানেন না, সেই চাষী-মজুরদের জীবন নিয়ে যদি সাহিত্য রচনা করতেন, তা হলে এখন আমাদের সে-সব লেখা পড়ার দরকার হত না, যদিও ওইসব লেখার জন্য বুদ্ধদেব বসুর ভাগ্যে নিন্দার বদলে জুটত বিরামহীন প্রশংসা।

বুদ্ধদেব বসু 'গজদন্ত মিনার'-নিবাসী। কিন্তু সত্যিই কি তাই? তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র কি আমাদের চেনা-জানা মনে হয় না। তিথিডোরের, স্বাতী, সত্যেন, হরীত. প্রবীর মজুমদার, শাশ্বতী—সকলেই তো চল্লিশ দশকের গোড়ায় পরিচিত কোনো না কোনো বাড়ির বাসিন্দা। অবশ্য তাঁর সৃষ্ট চরিত্র রাস্তায় ব্যারিকেড রচনা করে পুলিসের সঙ্গে লড়াই করে না, কারণ তিনি তো সেই জীবনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। সম-সাময়িক সমস্যা তিনি এড়িয়ে যান নি,

তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসেই তার প্রমাণ মিলবে। তার প্রমাণ মিলবে তার অজস্র প্রবন্ধে। আমি জানিনা, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন, এমন আর কোন্ বাঙালী কবি এত বেশী সমসাময়িক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এত বেশী বিচলিত হয়েছেন। "'উত্তর-তিরিশ" নামে যে-বইটির গন্ধ পড়বার জন্য আমরা ছাত্রজীবনে বইটি নিয়ে কাড়াকাড়ি করতাম, সেই বইটার বিষয় কি সমকালীন ঘটনা নয়? সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য গান্ধীজী যখন নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে তখন কি বুদ্ধদেব বসু চুপ করে থাকতে পেরেছেন? তিনি দেশপ্রেমের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন নি বটে, কিন্তু ডায়াসেশন স্কুলে কালো-চামড়ার মিস ক্লাসে গান্ধীজীকে মিঃ গান্ধী, নেতাজীকে সুভাষ বসু বলে অভিহিত করলে নিজের মেয়েকে ওই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন, যদিও তিনি নেতাজীর রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না, গান্ধীজীর ধর্ম-মিশ্রিত রাজনীতি তাঁর খুবই অপছন্দ ছিল। হিন্দিকে ভারতের একমাত্র সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিরুদ্ধে ভারতে যে-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সেই আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসু। এই আন্দোলনকে ইংরেজী প্রীতির আন্দোলন বলে "'পরিচয়" পত্রিকায় যিনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তিনি কিন্তু নিজের ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়িয়েছেন। কোনো সত্যিকারের কবি ভাষার প্রশ্নে নীরব থাকতে পারেন? বুদ্ধদেব বসুও পারেন নি। হিন্দীকে সরকারী ভাষা ও উচ্চ-শিক্ষার মাধ্যম করার বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল ইংরেজীর আসন বজায় রাখার জন্য নয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য। সমৃদ্ধ ভাষা যে আমাদের উচ্চতর চিন্তা-ভাবনার জগতে নিয়ে যায় এবং সেজন্য আধুনিক মানসিকতা গঠনে আধুনিক সমৃদ্ধ ভাষা যে কত প্রয়োজনীয়, এই জাতীয় অনেক দরকারী কথা বুদ্ধদেব বসু আমাদের শুনিয়েছিলেন ভাষা-আন্দোলনের সময় বিভিন্ন সভায়, আর তাঁর "ভাষা, সাহিত্য ও মনুষ্যত্ব" নামে পুস্তিকাটিতে। সেদিন রাজনৈতিক নেতা বর্ষীয়ান চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারির সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুকে দেখেছি ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটহলের মঞ্চে, মহাবোধি সোসাইটি হলে সম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটীর অধিবেশনে। ভাষা আন্দোলনের আগে সকলেই ধরে নিয়েছিলেন হিন্দীই হবে ভারতের একমাত্র সরকারী ভাষা। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু, জ্যোতির্ময় দত্ত এবং কল্যাণকুমার সিংহ সরকারী ভাষা কমিশনের রিপোর্ট বের হওয়ার পর কলকাতায় যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, রাজাগোপাল আচারি সেই আন্দোলনের ঢেউ পৌছে দেন মাদ্রাজে। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আমলে হিন্দীকে সরকারের একমাত্র ভাষা হিসাবে গ্রহণের পর গোটা মাদ্রাজ

রাজ্যে যে আন্দোলনের ঢেউ বয়ে যায়, সেই আন্দোলনের সূত্রপাত যে কলকাতাতেই এবং আবু সয়ীদ আইয়ুবের বাসায়, কবিতা-ভবনে এবং ক্রীডম হাউসে তা অনেকেরই জানা নেই। ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে গো-হত্যা বন্ধের আন্দোলন যখন উত্তর ভারতে যথেষ্ট জোরদার, সেকুলার রাজনৈতিক দলগুলিও যখন হিন্দু ভোট হারানোর ভয়ে এই মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা পরিচালিত আন্দোলনের বিরোধিতা করতে অ-রাজী, তখন বুদ্ধদেব বসু, নরেশ গুহ, অম্লান দত্ত প্রভৃতি এগিয়ে এসেছিলেন গো-হত্যা বন্ধের আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য। কলেজ স্ট্রীটের সেই সভায় আর-এস-এস কর্মীরা এসেছিল হামলা করতে, সভার পর কলেজ স্ট্রীটে ছোট মারামারিও হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু অল্পের জন্য হামলাকারীদের হাত থেকে রক্ষা পান। কিন্তু তাতে তিনি দমলেন না, গো-মাংস খাওয়া যে অন্যায় নয় এবং হিন্দু শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নয়, সে কথাও সকলকে লিখে জানালেন।

বুদ্ধদেব বসুর মতো আর কোনো লেখক এত নিন্দার শিকার হন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আরও কোনও লেখক তো তরুণ লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের নিকট থেকে এত বেশী ভালবাসা পান নি। কবিতা ভবনে বছরের পর বছর কেন বিকেল থেকে রাত দশটা—সাড়ে দশটা পর্যন্ত জোর আড্ডা বসত? কেন আমার মতো অনেকে দুই নম্বর বাসের দোতলায় বসে গড়িয়াহাটে পৌঁছানোর আগে উঁকি মেরে দুশো দুইয়ের দোতলার জানালা দিয়ে দেখতেন, জানালার পাশের টেবিলে বসে টেবিল ল্যাম্পের সামনে বু. ব. কিছু করছেন কিনা। জানালা দিয়ে যদি তাঁকে দেখা না যায় তবে নিশ্চিত বুঝতে হবে আড্ডা জমে উঠেছে, সুতরাং বাসায় না গিয়ে বাস থেকে নেমে কবিতা-ভবনের আড্ডায় যোগ দেওয়াই শ্রেয়। তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসা কেবল বইয়ের জগতে সীমাবদ্ধ থাকত না, সব বয়সের লোকদের নিকট থেকে গ্রহণ করার এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। অপরের কেসকে নিজের কেস হিসাবে লড়ে যাওয়া তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

বুদ্ধদেব বসুর মৃত্যুর দিনে নাকতলার বাড়িতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাই জানেন গোটা বাড়িটা, দোতলার সিঁড়ি—সর্বত্র এ যুগের লেখকেরা হয় নীরবে বসে আছেন, নতুবা কাঁদছেন। অনেকেরই মনে হয়েছিল, তাদের পিতৃবিয়োগ হয়েছে, তাদের মাথার উপর অভিভাবক হিসাবে যিনি এতদিন বিরাজ করছিলেন সহসা তিনি বিদায় নিয়েছেন! কী করে ভুলতে পারি শান্তি লাহিড়ীর সেই কান্না। তাঁর হাতে 'কবিতা'-র প্রথম সংখ্যা পুনর্মুদ্রণের প্রুফ। কবিতার সেই প্রথম সংখ্যায় তিনটি ভুল ছিল। বুদ্ধদেব নিজে প্রুফ দেখতে চেয়েছিলেন যাতে একটা ভুলও না থাকে। তিনদিন যাবৎ শান্তি রোজই ভেবেছে ফেরার পথে বু. ব.-কে প্রুফ দিয়ে

যাবে। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক ওর সেটা দেওয়া হয়নি। শাস্তির হাতে সেই প্রুফ আর তাঁর অঝোরে কান্না, "এই প্রুফ নিয়ে আমি কী করব।" বুদ্ধদেবকে যারা বার বার নিন্দাপঙ্কে নিমজ্জিত করতে চেয়েছিল, তাদের আজ আর বড় একটা হদিস পাওয়া যায় না, অনেক আগেই বিস্মৃতির অন্তরালে তারা হারিয়ে গিয়েছে। জানিনা, বুদ্ধদেবের প্রতি তাদের নিন্দাবৃষ্টি আমার মতো আরও অনেকের মনে বুদ্ধদেব বসুকে জানার আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছিল কিনা।

পাতালস্বর্গে বহুবার

সুনীল বসু

একটা লক্ষ্মীছাড়া বেধড়ক কাশি হয়েছে। বিরক্তিকর। দুপুর থেকে। কাল ট্রেনে বাড়ি ফেরবার সময় স্যুঁচ ফোটানো হাওয়া বিঁধিয়েছিলুম। উড়ো ঝড় গুঁড়ো বৃষ্টি ভিজিয়ে দিচ্ছিল। এই ফল। আগামীকাল বু-ব-র উপর লেখাটা অবশ্যই দিতে হবে। বু-ব। সে কতকাল। বেশ অনেক কয়েক বছর। ২০২, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। সবচেয়ে স্থায়ী ছাপ। কবিতাভবনের চিহ্ন সেই নৌকো। কে এঁকেছিল? সৌরেন সেন? নাকি অনিল ভট্টাচার্য। নাকি যামিনী রায়। না। যামিনী রায় নিশ্চয় নয়। বহু স্মৃতি আছে বলেই কোনটা ফেলে কোনটা লিখব—তাই ভাবি। সেই যৌবনের প্রথম দিক্কার লালের আভা বয়স। মেরি ওয়ালেসকায় পাগল হয়ে গিয়েছি। গ্রীটা গার্বো! গার্বো মাথায় ঘুরছে। সেই রকমই একটা নারী পেয়েছিলুম। প্রেম। নিমজ্জমান। আমার চেয়ে বয়সে বড়ো। সেই মারাত্মক বয়স। সেই সময় বু-ব-য় সম্পৃক্ত হয়েছিলুম। আমার নিয়তি আমি নিজে গড়েছিলুম। নাকি এও এক অদৃশ্য স্বর্গীয় লীলা। আমার নির্বাচন ঠিক, না বেঠিক, তা এখনও জানি না। তবে বিভোর হয়েছি। এখনও ঘোর বলবৎ।

চিন্তা ভাবনা কল্পনা স্বপ্ন ফুটিয়ে তোলবার যে মন্ত্রপুত ভাষা তা যাদের ধরা দিয়েছে,—দিয়েছিল,—তার মধ্যে অস্কার ওয়াইল্ড, ডি, এচ্, লরেন্স, অবনীন্দ্র নাথ, বুদ্ধদেব বসু,—আরও অনেক আছেন যাদুকরী গদ্যশিল্পী। এখন হাতের বা কলমের নখের গোড়ায় এই ক'জনকেই পেলুম। বহুবার মনের গভীরে গোপন সুখ যুগিয়েছেন বু-ব.। রমেশ বাঁড়ুজ্জের পুত্র অজিত ব্যানার্জি আমার ইশ্‌কুলের বন্ধু, বাঙুরে থাকে, গ্রামোফোনের রেকর্ড দেওয়া-নেওয়া করতুম, গল্পের বইও, সেই কলেজ জীবনে "আচমকা হাতে এসে গেল সেই গ্রন্থটি—'রেখাচিত্র' বুদ্ধদেব রচিত ছোট গল্পের সংকলন। সমস্ত গল্পগুলোই নতুন ধাঁচের,—তার মধ্যে 'মেজাজ' বিশিষ্ট। ও বই তো আর পাওয়া যাবে না। এখন গ্রন্থাবলী বেরুচ্ছে।

এক সময় আমি ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এ যেতুম। সন্ধেবেলায় ওখানে সাহিত্যের আড্ডা বসত। সে সময়ে যাদের মনে পড়ে, নিরুপম চট্টো., তরুনকুমার সরকার, নরেশ গুহ, সৌরেন সেন। বহু স্মৃতিবহ সন্ধ্যা মনে গাঁথা।

বু.ব. একদিন নরেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পর্কে বলেছিলেন, 'উনি গল্প ভাবেন ;' তখন নরেন্দ্রনাথ মিত্র সবে নাম করেছেন এবং তাঁর লেখনী তখন অজস্র প্রসূ। ১৯৫০-৫১ সালে আমি বুদ্ধদেবের খুঁজে খুঁজে সমস্ত ছাপা না-ছাপা বই সংগ্রহ করছি—ডুবে ডুবে পড়ছি—আর মনে হচ্ছে ওই নাতিদীর্ঘ সুদর্শন মানুষটি যা কিছু লিখেছেন সমস্তই রাক্ষসের মত গোগ্রাসে গিলে শেষ করব—এবং এই রকম যখন আমার অবস্থা তখন একদিন দুপুর শেষ—বিকেল শুরু লগ্নে ২০২-এ গিয়েছিলুম মনে আছে এবং বু.ব. সাহিত্য পাঠের অঙ্কের নমুনা দেখে উনি বলেছিলেন, ঐ বইগুলোও তুমি পড়েছ ?—ওগুলো না পড়লেও এমন কি ! তাঁর অনুরাগীর এ-হেন ক্ষুধায় তিনি একটু অবাক হয়েছিলেন।

ইদানীং আমার ভালো লাগা কিছু কিছু এমন লেখা আছে যাঁরা জানেন আমি বু.-ব-র সম্মোহনে এখনো আচ্ছন্ন এবং ফাঁক পেলেই তাঁরা স্নেহপ্রীতি বিজড়িত খোঁচা খুঁচি উপহার দেন। আমি সহজেই তা গায়ে মাখি না। এবং কোনো কোনো নাকউঁচু সাহিত্য-বোদ্ধা বুদ্ধদেবের কবিত্বেও নিঃসন্দেহ আজও অবধি নন। আমার কিন্তু হৃদয় কহে, তাঁর সৃষ্ট সমস্ত শস্য-উচ্ছ্বসিত রাজ্যব্যাপী তিনি মূলত কবি। আর কিছু নয়। গদ্যেও তিনি শুধু কবিত্বেরই ঐন্দ্রজালিক। এই বোধটিই চিরকাল আমার মধ্যে জাগরূক রয়েছে।

চতুরঙ্গে তিথিডোর-এর গোড়াকার কিছু অংশ বেরিয়েছিল—পরবর্তীকালে নিউ এজ পাবলিশার্স বার করেন আট টাকা মূল্যের 'তিথিডোর'। পূর্বাশায় সঞ্জয় ভট্টাচার্য অঢেল প্রশংসা করেছিলেন—বিশেষ করে একেবারে শেষাংশের। তখন জেমস জয়সের 'য়ুলিসিস্'-এর অব্যর্থতা আমরা উপভোগ করেছি। তিথিডোর কি সেইরকমই উপন্যাসের ক্ষেত্রে কোনোরকম পরীক্ষা ! ধূসর গোধূলি-র প্রকাশকও নিউ এজ। কিন্তু ঐ উপন্যাসটিও নিবিড় তন্ময় নির্বোধ করে দেয় নাকি ? কি যেন হয়ে যায়। হৃদয়ের অন্তস্থলে যেন ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ে। স্বপ্নের তন্দ্র র মধ্যে দিয়ে যেন অনুভূতি নীলার পদ্মের মত দল মেলতে থাকে। সে-সব অতীতের দিনে, যখন বয়স-কম বেলায় বুদ্ধদেবের কাছে যেতুম,—কখন মনে ভাবতুম,—আমি আমার লক্ষ্য পেয়ে গিয়েছি—ভুল হবে না। কবিতা ভবনে-র প্রকাশিত বই আমার ভালবাসার ভাল লাগার সুবাসে ভরা থাকত। বইগুলোর মূল্য ছাড়াও যে ক্রয় মূল্য তা চোরের মত লজ্জিত ভঙ্গিতে রাখতুম তাঁর সামনের টেবিলে। বাইরে এসেই ওগুলোয় ছোঁয়াতুম সাদর করস্পর্শ।

ঠিক এই সময়টাতেই একটা ব্যাপার ঘটালুম যা বুদ্ধদেব সকৌতুকে অপরের

কাছে গল্প করেছিলেন,—এবং সেই গল্পের শ্রোতা আবার আমার কাছে সেই ব্যাপারটাই স্মৃতি উদ্ধার করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর যে-বই আমি তাঁর কাছ থেকে কিনতুম,—তাঁকে দিয়েই সে-বইটাতে গ্রন্থকারের স্বহস্তে স্বাক্ষর করিয়ে নিতুম। বুদ্ধদেব এই ঘটনাটাই একজনেব কাছে গল্পচ্ছলে বলেছিলেন। কিন্তু সেই হস্তাক্ষর আজও আমার বইগুলোয়। এতোকাল পরে কখনো-কখনো যখন কঙ্কাবতী, দময়ন্তী, দ্রৌপদীর শাড়ি মেলে ধরি প্রৌঢ় দৃষ্টিতে তখন অতীতের সেই দিনগুলোর সঙ্গে 'বুদ্ধদেব বসু'-র দস্তখৎ-এর মোচড় কায়দা হ্রস্ব যুকারের টান আমায় কোথায় টেনে নিয়ে যায়। জানি না সেই জন্যই তখনকার দিনের বালক পাপ্পা তার পিতার লেখাব টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলত কিনা,—ও-ঘরে সুনীল স্বাক্ষর এসেছে। ঐ নামেই তখন কিছুকাল পরিচিত হয়েছিলুম।

বুদ্ধদেবের চিঠির উপর আমাব লুব্ধতা, লোভ, লোলুপতা তখন একদিন যখন আকস্মিকভাবে আমার ভিতরে উপজাত হয়েছিল তখন আমি খুব দামী প্যাড আর ঘি রঙেব এক গোছা খাম তাঁকে এক রোদমাখা বিকেলে লাজুকতায় উপহার দিলুম। বলেছিলেন, 'তোমার চিঠি পেয়েছি। সুন্দর চিঠি লেখ তুমি। কিন্তু বানানে একটু কাঁচা আছো। ঠিক করে নিও'। এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে সে-বছর পূজোর বোধ হয় সপ্তমীর দিন সেই আশ্চর্য প্রথম চিঠি পেলাম, যা আমাব শারদীয় পোশাক,– নানাবিধ উপহার ইত্যাদিকে সহজেই তুচ্ছ ম্লান করে দিল, যা আমার কাছে অসাধারণ প্রেমের চিঠির চেয়েও অধিক দামী। তারপর তার জীবৎকালে মাঝে-মাঝে তাঁর এই অধম অনুরাগীকে কখনো-কখনো চিঠি লিখেছেন। যখন হতাশায় মুষড়ে পড়েছি, জীবনের কিছুই ভাল দেখতে পাচ্ছি না,—তখন তিনি যে-সব চিঠি লিখেছেন তাতে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে আমার মধ্যে। জীবন যে খুবই সুন্দর, তাজা, রোদ ঝলমল, শুধুই ছাতাকুড়ো আব ছাইমাখা নয়—তা ভাবতে পেবেছি। মনে আছে, আমার ভালবাসাই হোক বা আনুগত্যই আমি মাঝে-মাঝে এক আধখানা বিদেশী কবিতার বই তাঁকে উপহার দিয়ে আত্মতৃপ্তি পেতাম, তিনি হাসি মুখে গ্রহণ করতেন,—সেই কবি সম্পর্কে আমার জ্ঞানের পারধি আরও বাড়িয়ে দিতেন,—তখন ছেলে-মানুষিতায় এ সবে লজ্জা পেতুম না—এখন সেই সব ছেলেমানুষি স্মৃতি খোঁচা দেয়—কার কাছে যেতুম আমার পাঠাভ্যাসের অহংকার নিয়ে!

ছুটকো-ছাটকা হাজার স্মৃতি আমার আয়ত্বে। কোনটা লিখব কোনটা লিখব না। মনে পড়ছে বড়ুয়া কলার পাঞ্জাবী আর পায়জামা পরিধানে। অবাধ্য দীর্ঘ চুল কেবল কপালের উপর এসে পড়ছে। তিরিশের যুগের অন্তেনের

কপালের চুলের ব্যাপারটায় কি এরকম বেয়াদপি ছিল। সে সময় সকালে যাচ্ছি কবিতা ভবনে। উনি স্নান সেরে ফিটফাট ঘরে ঢুকতেন। 'চা খাবে তো?' 'অসুবিধে না থাকলে খেতে পারি।' পেয়ালাটা খুব একটা বাহারি বা জাপানী হত না। আমরা দুজনে, দুই বৈসাদৃশ্য, এক প্রখ্যাততম আর এক বালখিল্য চূড়ান্ত অখ্যাততম বসে চা পান করছি, মানে করতুম, মেরুপ্রমাণ দূরত্ব রূপী বৈপরীত্যের মজা লাগত। এই সময়টায় আমি প্রতিভা বসুরও পরিচিত-বৃত্তের মধ্যে রয়েছি। বুদ্ধদেব একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলেন, বাড়িতে এসে পড়তে চায় একশ টাকায়—আমি ইংরিজি পড়াতে পারি,- যদি কেউ রাজী থাকে দেখো। ১৯৭৬-এ এসে একথাটা ভাবলে কেমন আশ্চর্য লাগে। বুদ্ধদেব,— ভাবতে অবাক লাগে, অর্থাভাবে রয়েছেন,—ইংরিজি পড়াতে চান—এবং যে দিদিমাকে মা বলতেন,—তখন তিনি খুব সম্ভব ২০২-এ। সেই সকাল ন-টা দশ-টায় সে-বছর হয় ঘরের এককোণে চা-য়ের জল ফুটে যাচ্ছিল, অথবা কড়াইতে শুধু জল—পাতলা উড়ছিল,—আমার কেমন কষ্ট হয়েছিল,—সমস্ত দোতলার ফ্ল্যাটটি খুব নির্জন নৈঃশব্দ্যে ডুবে ছিল।

আর একদিন। সে-ও বেলা বারোটা নাগাদ। অসময়। ঘরের দরজা জানলা গ্রীষ্মতাপ ঠেকাবার জন্য খুব সম্ভব বন্ধ ছিল। উনি এলেন। একটু পরে প্রতিভা বসু। হঠাৎ বললেন কি একটা প্রসঙ্গের মাঝখানে,- দেখ, ও যদি পারে, সস্তায় ভাল জায়গা জমি দেখে দিতে। আমার দ্বারা তো কিছুই হল না…।' কথাগুলো বেঁধানো বা বিঁধে আছে। প্রতিভা বসুর 'মনের ময়ূর' তখন সিনেমায় উঠছে। এবং প্রতিভা বসুর নিটোল 'লেখার' তখন রীতিমতো কদর। এবং কোনো কোনো কুমতলবী লক্ষ্মীছাড়া পাগল বলে থাকেন—ও-সব বুদ্ধদেবেরই লেখা।

আমি আজও বুঝতে পারি না বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে একদলের এতো আগ্রহ এবং আর একদলের এতো জাতক্রোধ কেন। শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র দেব এককালে তাঁর এক শরৎ প্রশস্তির নিবন্ধে বুদ্ধদেবকে অতো অমানবিক গালাগাল কেন দিয়েছিলেন,—কেন স্বর্গীয় মহানুভব সজনীকান্ত অত পিছনে লেগেছিলেন,—কেন এই সেদিনও রবীন্দ্রনাথের উপর বক্তৃতা নিয়ে অত গুলজার তর্কাতর্কির ছুঁয়ার মারামারি। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যেমন বঙ্গসাহিত্যের সর্বত্র প্রভাববিস্তারী; বাংলা ভাষার সৌন্দর্য প্রস্তুতকরণে বুদ্ধদেবের স্থান তাঁর পরেই। যাঁরাই এখন সুন্দর চোখা অথচ শিল্প কারুময় গদ্য রচয়িতা তাঁরাই বুদ্ধদেব বসুর লুকিয়ে হলেও অনুরাগী পাঠক।

প্রমথ চৌধুরীর গদ্য তাঁর নিজস্ব—তাঁর থেকে অন্যাশক্য—কিন্তু আর কেউ কি তার পরেও। বোধহয় না। বুদ্ধদেবের ভাষা কেউ গ্রহণ করেছেন—আমার বক্তব্য তা নয়। কিন্তু এখনকার বাংলা গদ্যের সাবলীলতায় বুদ্ধদেবের দান অসীম। অত্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে হলেও তাঁর গদ্যের আমেজ বা মেজাজ অনেকের লেখায়। নাম করা অনুচিত। এ কথাও ভাবি—আধুনিক বাংলা কবিতায় তাঁর ভূমিকার মূল্যায়ন। রবীন্দ্রনাথের সর্বনাশা সর্বগ্রাসী বাঙালী মানসভূমি দখলের পর যদি বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্তির গতিবেগকে এমন সুনিপুনভাবে সংহত করে বাঙালী পাঠক-সাধারণের হৃদয়ে সঞ্চার না করতেন, তা হলে আজকের কবিতার চেহারা—চরিত্র কি এমন হত। সাহিত্যে দেবদৈত্যাকার প্রতিভা মাঝে-মাঝে দেখা দেয়,—তখন আর কারোরই সেখানে নাক গলাবার অধিকার থাকে না। এই একচ্ছত্র সম্রাটত্ব সেই সম্রাটের পক্ষে যতোই আদরনীয় হোক অন্যের পক্ষে ক্ষতিকর। রবীন্দ্রনাথ গণেশ ঠিকই—কিন্তু তারও অন্তরাগ প্রয়োজন ছিল। যাই হোক, এই এক রাশ স্মৃতিময় গদ্যের ঐসব বিচার মূল লক্ষ্য নয়।

তোমার সময়ের তোমার সমবয়সী বন্ধুরা তোমার কবিতায় যদি আনন্দ পায় সেটাই তোমার কবিতার পুরস্কার—এই কথাটাই একদা বলেছিলেন বুদ্ধদেব। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম, মম বড়ো না হেমিংওয়ে বড়ো। তখন মম ভীষণ ভাল লাগত। কিন্তু ওঁর তারিফের ঝোঁক দেখলুম হেমিংওয়ের দিকে। যেবার নিরুপমের সঙ্গে ওরা চাইবাসায় গেলেন সেবার মনে আছে উনি মশ্‌গুল হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রে'। এখন দেখছি বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ বেরুচ্ছে। কিন্তু আমরা তাঁর জীবিতকালে আলাদা আলাদা যে-সব বই সংগ্রহ করেছি,—রচনাসংগ্রহ তার তুলনায় স্বাদে ব্যবহারে সান্নিধ্যে অনেক দূরের।

কলেজ স্ট্রীটের প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং থেকে আমি অনেক অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করেছি—তখন করা যেত—এখন ঐ বই-হাটের চেহারা চরিত্র একেবারে পাল্টে গিয়েছে। 'কবিতা' পত্রিকার অনেক পুরনো সংখ্যা ওখানে পেয়েছি। একদিন ঠিক বিকেলে দেখলুম,—বইওলাদের অনেকের কাছেই বুদ্ধদেব বসুর নিজের স্বাক্ষরিত 'রূপান্তর' কাব্য গ্রন্থটি। সেই সময়ে তারও একটি বই-ওই পুস্তক-হাটে বেশ কিছু সংখ্যক বিক্রি হতে এসেছিল—সেটি 'গল্প সংকলন'। দুটি বইয়েরই দাম ছিল পাঁচ টাকা করে। তখন সেই বেকার জীবনে আজকের মতো দশটা টাকা মাত্র একটাকা ছিল না। কবিতা ভবনের গল্প

সংকলনের সেই সংগ্রহ আজও আমার সংগ্রহে অনুপস্থিত। ভাবতে গেলেই মনোকষ্টে পড়ি পুরনো বই সংগ্রহের সেই উজ্জ্বলতম দিনগুলির কথা। 'অ্যান একর অব গ্রীণ গ্র্যাস' নিজে কিনেছি, ডেকে ডেকে বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খবর দিয়েছি - বইটা আনকোরা অবস্থায় হাটে হাজির হয়েছে। 'কালের পুতুল' আমি কবিতা ভবন থেকেই নিয়েছিলুম—দেখলুম সেও একাধিক প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং-এ। নিজে কিনলুম আরও একখানা। কয়েকজন অনিচ্ছুক বন্ধুকে জোর করে কেনালুম। তারা বললে, এতো উপন্যাস-টুপন্যাস নয় হে, তবে···? আমি বোধহয় বলেছিলুম, উপন্যাসের চেয়ে অনেক বেশী বহুমূল্য, —কোনোদিন যদি বোঝার মত তাগিদ বোধ করো সেদিন, পড়ো। এইভাবে কখনো 'কবিতাভবন' কখনও কলেজ ষ্ট্রীট, কখনও ঢাকার ছেলে আমার বন্ধুর বাড়ি থেকে কত ভাবে কত বই এসে পড়েছে আমার কাছে আমার হয়ে চিরকালের জন্য—যেগুলোর প্রণেতা বুদ্ধদেব বসু। 'বারো মাসের ছড়া' বেরুল। 'পত্রবাহক শ্রীসুনীল বসুকে এক কপি বারো মাসের ছড়া আপনাদের উপযুক্ত কমিশনে দিলে বাধিত হব। বুদ্ধদেব বসু।' এই ক্ষুদ্র চিঠিটুকু আর কোনোদিনই প্রকাশকের হাতে পৌঁছয় নি,—আজও রয়েছে সযত্নে আমার কাছে। এইরকম কত টুকরো ঘটনার সঙ্গে প্রবাল কণিকার দানা বেঁধেছে আমার স্মৃতি। একটা ছোট্ট কাগজে একবার বুদ্ধদেব অনেক কলকাতাবাসী কবিদের নাম ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন তাঁদের বই তাঁদের বাড়িতে পাওয়া যেত, কোনো বইয়ের দোকানে নয়। তখন সিগনেট বুক শপের জন্ম হয় নি। সময়টা তখনকার। বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিটের সিগনেট বুকশপই প্রথম আধুনিক কবিদের বই মজুত করতে শুরু করে। বেরিয়েও ছিল বেশ কিছু প্রতীক্ষার পর হলুদ মলাটে রূপালি রেখার টানে সত্যজিৎ রায়ের হাতে আঁকা মেয়ের তৃষ্ণার্ত মুখ নিয়ে 'দুরন্ত দুপুর'। বইয়ের পশ্চাৎ মলাটে বুদ্ধদেব-এর নিখুঁত মন্তব্য।

কবিতার রাজ্যের মরকত নীল আকাশের নীচে আমাদের সময় ঠাণ্ডা জলস্রোতের মত বয়ে যাচ্ছিল—বছরগুলো ফাঁকি দিয়ে হারাচ্ছিল, আমরা যে যার ঢুকে পড়লুম কাজের জগতে—কয়েকজন নতুন কবিকে স্থান করে দিতে দিতেই একদিন বন্ধ হ'য়ে গেল আমাদের বহু হৃৎস্পন্দনে প্রতীক্ষিত কাগজ 'কবিতা'। যেন আর কিছু রইল না আমাদের মত মনোময় সবকিছু গা বাঁচিয়ে চলা মানুষগুলোর জন্য। একটা গোপন নিভৃত নিবিড় লুকনো স্বপ্নের সাধ ছিল তা-ও গেল। থাক। সব থাক। সবই যাবে। আমরাও যাব। পৃথিবীতে

একটু স্বপ্ন ফুটেছিল। একজন ভাষার বাজি পুড়িয়েছিল, রঙমশাল, আমাদের পৃথিবীর শেষ মহাকবির পায়ের কাছে বসবার ভাগ্য হয় নি,—তবু তাঁরই নির্ভুল প্রতিনিধি যার কাছে পৌঁছবার সৌভাগ্য নিয়তি আমায় দিয়েছিল তাতেই এ জীবনের পরম প্রাপ্তি।

মনের ভিতর যাতায়াত ছোঁয়াছুঁয়ি প্রতি নিয়ত চিন্তাভাবনা কখনোই বন্ধ হয় নি তবে কাজের দৌরাত্ম্যে টালিগঞ্জের সে বাড়িতে আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি। জানি না সেখানে গেলে আমার ২০২-এর স্বপ্ন ভেঙে যেত কি না। আমি নিজের জীবনকে কখনো ভাল চোখে দেখি না, খুব একটা বিশ্বাসও করি না, ভালর চেহারা চরিত্র আমার অচেনা, দুঃখ নিত্যসঙ্গী, আর তিনি ছিলেন জীবন পূজারী, উৎসাহী, সব বিষয়ে অক্লান্তকর্মী। কবিতার ব্যাপারটা আমার মত করে আমার সঙ্গে বসবাস করছে,—কিন্তু পঁচিশ বছরের যে যুবকের সঙ্গে একদা বুদ্ধদেব পারবারের যে সান্নিধ্য সম্পর্ক ছিল এখন আব তা নেই। শেষ দিকের চিঠিতে তাঁরও গোধুলির রঙ, ধূসরতার ছায়া লেগেছিল এটাই কেমন একটা বেদনাবোধ জাগায়। কিন্তু বুঝতে পারি নি তিনি চলে যাবেন—তাহলে হয়ত তাঁর ডাকে তাঁর কাছে না পৌঁছে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারতুম না। চিঠি পেয়েছি—তবু যাই নি —কি করে পারলুম সেটা নিজেই জানি না!

স্মৃতিশস্য

সুনীল বসু

জীবনানন্দের মৃত্যুর দিন
তোমাকে দেখেছিলাম অশ্রু-ভেজা চোখে—
তোমাকে দেখেছিলাম
মনে পড়ে
তোমার ২০২ কবিতা ভবনে
কতবার কতদিন কত সান্ধ্য-মজলিসে
সে-সব কি ভোলা যায়
ধূসর গোধূলির অপর্ণাদিকে
বা তিথিডোরে-র রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর—
ব্রহ্মাণ্ড দুলে ওঠা
সেই পরিচ্ছেদ
সে-ও কি বিস্মরণযোগ্য
তোমাকে ঘিরে কখনো নিন্দার দুন্দুভি
কখনো স্তুতির অর্ঘ্য
কত কবির পরিচয়
কত সাহিত্যের তর্ক
কত আইনের ঘূর্ণি
অবশেষে
স্তব্ধ
এতো অবিশ্বাস্য সহজে
কেউ হারায়
দুর্মর যৌবনেই তুমি চলে গেলে, দুর্নিবার
জরা তোমাকে ছোঁয় নি
এটাই আশ্চর্য !

চিত্র-ভাস্কর্য প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু

—সন্দীপ সরকার

বুদ্ধদেব বসুকে কৈশোরের শেষে এবং যৌবনের সুরুতে আবিষ্কার করার একটা উত্তেজনার কথা কোনোদিন ভুলতে পারব না। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় দরজা খুলে যাবার একটা অভিজ্ঞতা। বাইরে শীতের নরম এবং উজ্জ্বল রোদ, ঘাসের আগায় বিন্দু বিন্দু শিশির চিকচিক করছে, উত্তুরে হাওয়ায় গাছের পাতা দুলছে। এমন একটা বয়সে আবিষ্কার করেছিলাম তাঁকে যখন মেয়েমাত্রকেই রাণীর মতো মনে হতো। কোনো সুন্দরীদের পাশ দিয়ে যাবার সময় দীর্ঘশ্বাস পড়তো নেহাৎ অকারণে। মনে মনে বলেছি, কঙ্কা-কঙ্কাবতী-কঙ্কাবতী গো........ তোমার নামের শব্দ আমার কানে আর প্রাণে গানের মতো। সতেরো আঠারো বছর বয়সে—কী দারুণ উন্মাদনা আর দুঃখবোধের সেই সময়। এই বয়সে বুদ্ধদেবের কবিতা ও উপন্যাস যাঁদের দিন রাত্রির সঙ্গী হতে পারেনি, তাঁদের বেশ দীন বলেই মনে হতো তখন।

এর অনেক আগেই বুদ্ধদেব বসুকে দেখেছি। আমার মামা এবং মামী যুদ্ধের সেই বছরগুলোতে ২০২ রাসবিহারীর কবিতা ভবনে প্রায় রোজ আড্ডা দিতে যেতেন। তাঁদের হাত ধরে গেছি অস্পষ্ট ছেলেবেলায়। মামী ফিসফিস করে বলতেন, উনি সমর সেন। ঐদিকে কামাক্ষীপ্রসাদ। ঐ ঝাঁকড়া চুলো লোকটি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এক কোণে ব'সে ছোটখাটো সুন্দর যুবক, ওঁর নাম বুঝি নরেশ গুহ। আর এই আসরের যিনি রাণী তাঁর নাম প্রতিভা বসু। সকালের হালকা রোদের মতো তাঁর হাসি। সহজ আর আন্তরিক তাঁর কথা-বার্তা। কিন্তু আলাপ আলোচনার মধ্যে যাঁকে স্বতন্ত্র ও গম্ভীর বলে মনে হতো তিনি বুদ্ধদেব নিজে। প্রদীপ্ত, উজ্জ্বল এবং রহস্যময়। কণ্ঠস্বর নমনীয়, কিন্তু স্পষ্ট পরিশীলিত উচ্চারণ। নানান পরিস্থিতিতে যিনি অকস্মাৎ হেসে উঠে পরিবেশকেই সলজ্জ করতে পারেন। যে বয়সে তাঁর ছোটদের লেখা পড়েছি অবশ্যই। 'হাউই' কী বেরিয়েছে? এখন স্পষ্ট মনে নেই।

বেরিয়ে আসার সময় মনে হয়েছে এঁরা লেখক। অন্য ধরণের মানুষ। আশ্চর্য এক লোকের বাসিন্দা। তখনকার সেই বিস্ময়ের ঘোর পরবর্তীকালেও

কাটেনি। বাবা কাজ করতেন পালামৌ জেলার জাপলায় সিমেণ্ট কারখানায়। সেখানে অন্য পত্রিকার সঙ্গে 'কবিতা'ও যেতো। শেষের দিকের শীর্ণ 'কবিতা' নয় সে আমলের বেশ নধর 'কবিতা'। আমার কাছে নিষিদ্ধ পত্রিকা তবুও লুকিয়ে পাতা ওলটাতাম। এর বহু পরে যখন 'কবিতায়' আমার কবিতা প্রকাশিত হলো তখনকার আনন্দ ভাষায় বুঝিয়ে বলা যাবে না। বড় পত্রিকাগুলোতে ঠাঁই না পেয়ে নিজের লেখার সম্বন্ধে সন্দেহ হচ্ছিল। নিজেকে ভীষণ সমাদৃত মনে হলো। মনে হলো বুদ্ধদেব আমাকে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিলেন।

হয়তো এই স্মৃতিচারণ বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর এবং একটা বয়স ও মুগ্ধবোধের বিবরণের কোনো অর্থই হয় না কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে আরেক বুদ্ধদেবকে আবিষ্কার করলাম তিনি কবি বা কথাশিল্পী নন, কিন্তু প্রাবন্ধিক। অসাধারণ বিচ্ছুরিত তাঁর গদ্য, হৃদ্য কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত তাঁর শব্দচয়ন। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক সৃজন প্রধান ও অবিসংবাদী গদ্যলেখক প্রমথ চৌধুরী ও অবনীন্দ্রনাথ। তারপর বহু-কালের খরার পর বুদ্ধদেবের অঝর ধারাবর্ষণ। আকাশে কালো মেঘ, হাওয়ার দুরন্তপনা, মাঠঘাট জল থৈ থৈ করছে, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের ঝলকানি, গুরুগুরু গর্জন।

মধ্য যৌবনে আজ বুদ্ধদেবের উপন্যাসের বিষয় মোহভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী এবং তাঁর কবিতার নেশাও ক্রমে অনেক পরিমাণে ফিকে হয়ে যায়। হঠাৎ আবিষ্কার করি অন্য এক কালের পাঠকের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যু স্বাভাবিক, তাই সে বিষয় বিলাপ করব না। কিন্তু বয়স যত বাড়তে থাকে, ততো তাঁর প্রবন্ধের আকর্ষণ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। আসলে এক এক বয়সের জন্যে এক এক বুদ্ধদেব আছেন। পরে একসময় তাঁর প্রবন্ধের জগতে এসে পৌঁছবার পর হঠাৎ একটা উপলব্ধি ঘটে, বুদ্ধদেবের রচনাকে বার্ধক্য বা জরা কখনও স্পর্শ করবে না। তিনি চিরকাল যৌবনের আলিঙ্গনের মধ্যে থেকে যাবেন।

প্রবন্ধ এই চির যুবক রাজকুমারের রচিত আশ্চর্য নন্দন উদ্যান। একপাশে রয়েছে তাঁর অসি চালনার শিবির। অন্যদিকে তীর-ধনুক অনুশীলনের আয়োজন। আমাদের চোখের সামনে তাঁর কতো প্রবন্ধ দিনের আলোয় চোখ মেলল। ''কবিতা'-র পেছনে রবীন্দ্র রচনাবলীর সমালোচনা, 'মেঘদূতের' ভূমিকা, বদলেয়ার এবং পাস্তারনক সম্বন্ধে আলোচনা, অন্যান্য নানা প্রসঙ্গ কথা। মনে পড়ে নামী পত্রিকায় কোনো কোনো প্রবন্ধ প্রকাশের উত্তেজনা যেমন 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক' বা 'যে আঁধার আলোর অধিক'। পরে মহাভারত সম্বন্ধে তাঁর নিবন্ধমালা বা অনন্ত স্মৃতিচারণ। অনুসন্ধানে দু একজন প্রাজ্ঞ প্রবন্ধকার

মিললেও মিলতে পারে, কিন্তু তাঁর সমতুল্য গদ্যশিল্পী আছে ব'লে মনে করি না। আর কেউ আমাদের রুচিকে এমন ক'রে তৈরী করতে পারবেন না। সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী তিনি প্রস্তুত করেছেন। ভালবাসতে শিখিয়েছেন কবিতাকে। তুলনামূলক সাহিত্য সম্বন্ধে সচেতন করেছেন। সাহিত্য আলোচনাকে বিশ্ববিদ্যালয়ী নিরস অন্ধকার থেকে বাইরে টেনে এনেছেন। অনুপুঙ্খ বিচারে হয়তো তাঁকে বড় সমালোচক বলা চলবে না। এলিঅটদের চেয়ে লিভিসরা চিরকাল বড় সমালোচক। কিন্তু লিভিসদের পাণ্ডিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে যায় শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এলিঅটদের চিন্তা ভাবনা সাহিত্য পিপাসুদের আন্দোলিত ও প্রভাবিত করে। বুদ্ধদেবের সঙ্গে বহুক্ষেত্রে একমত হওয়া যায় না। অনেক সময় তাঁর একদেশদর্শিতা অসহনীয় মনে হয়। কয়েকটা বিষয়—যেমন রাজনীতি—তাঁর অজ্ঞতা অভাবনীয়। তবু তাঁকে ভাল লাগে। কবি সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে তাঁর অগাধ মমত্ববোধ ও সৃজনশীলতার বিষয়ে শ্রদ্ধা ও অন্তর্দৃষ্টি আমাদের বিস্মিত করে। আসলে তিনি হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে আমাদের রক্তের ভিতরে সাহিত্যের প্রতি তাঁর ভালবাসাকে সংক্রামিত করতে পেরেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক আর কেউ তেমন ক'রে পারেন নি। সুধীন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য এবং বিষ্ণুদের পাণ্ডিত্যাভিমান আমাদের মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করলেও, হৃদয়ের জাগরণ ঘটাতে পারেনি। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার প্লাবন তাঁর কাছে প্রশ্রয় না-পেলে সম্ভব হতো না।

সাহিত্য ছাড়াও বুদ্ধদেব সিনেমা এবং চিত্রকলা সম্বন্ধে মাঝে মধ্যে আলোচনা করেছেন। ঠিক মুখ বদলাবার জন্যে নয়। হয়তো সাহিত্যের সঙ্গে অন্যান্য মাধ্যমের মিল, বা সৃজনশীলতা বিষয় তাঁর কৌতূহল, বা নিছক ভালবাসা থেকেই এসব লেখা। অবশ্য তাঁর সমস্ত প্রবন্ধের ক্ষুদ্র ভগ্ন অংশ হলো এইসব লেখা। শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল, যামিনী রায়ের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন, কিন্তু তুলনায় লেখা সামান্যই। এর কারণ অনুমান করার চেষ্টা করা যেতে পারে। এক হতে পারে শিল্পকলা আলোচনার বঙ্কিমচন্দ্র থেকে সুরু ক'রে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কোনো ঐতিহ্য তৈরী হয় নি। নিজে অতো বড় চিত্রকর হওয়া সত্ত্বেও শিল্পকলা সম্বন্ধে রবীনাথের কোনো উল্লেখযোগ্য রচনার কথা মনে পড়ে না। এক অর্থে আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার জন্ম জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। অন্যদিকে কলাভবন ও নন্দলালের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অন্তরঙ্গ। ক্রামারেশ বিবির সঙ্গে শান্তিনিকেতনের যোগাযোগ এবং ক্যানভিনস্কির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব ছিল। তবু রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য নীরবতা বিস্ময়কর।

প্রধানত বিষ্ণু দে ও বুদ্ধদেবই সমকালীন শিল্পকলা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ও বিচ্ছিন্ন আলোচনা করেছেন। তুলনায় বিষ্ণু দে-ই অধিক। কিন্তু সে আলোচনা প্রধানত যামিনী রায়কে কেন্দ্র ক'রেই। বিষ্ণু দে-র সঙ্গে 'ক্যালকাটা গ্রুপের' বন্ধুত্বের কথা প্রবাদ বিশেষ। কিন্তু বুদ্ধদেব সে কৌতূহল পর্যন্ত দেখাননি। বিষ্ণু দে-ও ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীদের পর আর অগ্রসর হননি। এসব দেখেশুনে মনে হয় এই মাধ্যম সম্বন্ধে তাঁদের একটা শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয় ছিল। এঁরা দুজনেই পণ্ডিত ছিলেন। সাহিত্যের যে কোনো বিভাগে অধিকারের সঙ্গে তাঁরা বলতে পারতেন। সেক্ষেত্রে শিল্প সম্বন্ধে তাঁদের মনে কিছু সংকোচ ছিল। অথচ তাঁরা যদি তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা না ক'রে তাঁদের ছবি ও মূর্তি ভালো বা মন্দ লাগার কথা আরো বেশি বলতেন, তাহলে শিল্প সমালোচনার আখেরে ভালই হতো।

বুদ্ধদেব নিজেকে অধিকারী মনে করতেন না এটা আমার স্থির বিশ্বাস। তবুও তিনি যে কৌতূহলী এমন তাঁর রচনার মধ্যে থেকে সহজেই দেওয়া যায়। এ ব্যাপারে যামিনী রায়ের ব্যক্তিত্বের অবদান ছিল। রবীন্দ্র পরবর্তী সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীরা 'বঙ্গীয় কলমের' প্রতি সর্বভারতীয় উষ্মার জন্যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, তা পূরণ করার জন্যে যামিনী রায়ের ছবি ও ব্যক্তিত্ব খুব কাজে দিয়েছিল। যামিনী রায় উপরন্তু বড় মাপের শিল্পীও ছিলেন। অন্যদিকে নগর সভ্যতার দুর্গ কলকাতার ওপর গ্রামীণ ও লৌকিক শিল্পের পতাকা উড়িয়েছিলেন তিনি, সেই-জন্যে তাঁর প্রতিভাকে বিস্ময়কর মনে হওয়া স্বাভাবিক। বিস্ময়কর ও স্ববিরোধী। যামিনী রায়ের ব্যক্তিত্বের এই স্ববিরোধ ও সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে এটা কী ধরণের অনুপ্রেরণা—এ সবই অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বুদ্ধদেবের আলোচ্য। যামিনী রায়ের ছবি বোঝার পক্ষে সেটা সহায়ক হয়েছে।

মেঘদূতের ভূমিকায় বুদ্ধদেব ভারতশিল্পে নগ্নমূর্তি না থাকা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন ইউরোপীয় নান্দনিক দৃষ্টির সঙ্গে আমাদের প্রভেদ। কিন্তু ভারতশিল্পকে শুচিবায়ুগ্রস্ত বলেন নি। একটা মাত্র অনুচ্ছেদ কিন্তু স্বচ্ছ ও সাবলীল লেখা।

তুলনায় 'যে আঁধার আলোর অধিক' অধিকতর পূর্ণাঙ্গ রচনা। রেমব্রান্টের জীবনের সঙ্গে ছবির বিষয়বস্তু এবং শিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। কলাকৌশল সম্বন্ধে কথা সামান্যই রয়েছে। বরং 'নৈশ পাহারা' ও 'শব ব্যবচ্ছেদ' তুলনা খুবই মনোজ্ঞ। বুদ্ধদেব, ছবি তাঁর নিজস্ব ধরণে বুঝতেন। কিন্তু তাঁর সংযম ও বিনয় তাঁকে সমকালীন চিত্রকলার আলোচনা থেকে বিরত রেখেছে।

কবি বুদ্ধদেব

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

বুদ্ধদেব বসুর সমকালীন কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, সমর সেন, অমিয় চক্রবর্তী ও বিষ্ণু দে নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বমহিমায় অধিষ্ঠান করছেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের কবিতা ও কবিত্ব বিষয়ে মাঝে মধ্যেই কোনো কোনো মহলে প্রশ্ন ওঠে, সত্যিই কি কবি হিসেবে তিনি পূর্বোক্ত কবিকুলের সমকক্ষ? অথবা সাহিত্যের সব শাখাতেই সাবলীলভাবে বিচরণ করেছেন বলে কবিতার প্রতি তিনি অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারেন নি, যা দিয়েছিলেন তাঁর ওই উজ্জ্বল বন্ধুবর্গ? একথা ঠিক যে শুধুমাত্র কবি পরিচয়ই বুদ্ধদেবের একমাত্র পরিচয় নয়। কিন্তু তা বলে কবি হিসেবে তাঁকে উন করে দেখাটাও যথার্থ সাহিত্যবোধ-বুদ্ধির পরিচায়ক হবে না। 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদনাকালে তিনি যেমন জীবনানন্দকে আবিষ্কার করেছিলেন, তেমনিই আবার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে তাঁকে গড়েপিটে মানুষ করতে হয়েছিল। নিজে সার্থক কবি ছিলেন বলেই নানা মেজাজের, বিভিন্ন সুরের কবিতা চিনতে বা সে সবের প্রকৃত মূল্যায়নে তিনি কখনোই ভুল করেন নি। মনে রাখতে হবে 'কবিতা' পত্রিকা কোনো সস্তা চটকদার সাহিত্য পত্রিকা ছিলো না। সাহিত্যের ছদ্মবেশে ভুলক্রমেও কোনো মেকি জিনিস এই কাগজে স্থান পায় নি। প্রচণ্ড মনোযোগ, মমতা ও অধ্যবসায় সহকারে এক একটি সংখ্যা তিনি একের পর এক বের করে গেছেন। জননীসুলভ যত্ন ও অক্লান্ত নিষ্ঠা ছিল তাঁর সহজাত। একটি পত্রিকা যার মধ্য দিয়ে বাংলা কবিতার আধুনিকতা নামক ব্যাপারটি অল্পে অল্পে রূপ পরিগ্রহণ করেছিল—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অখ্যাত অজ্ঞাত কবির জন্য উত্তপ্ত, আন্তরিক আহ্বান ছিল যেখানে সদাপ্রসারিত—সেই পত্রিকাটির তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। নিজে অসাধারণ জহুরী ছিলেন বলেই যাচাই করে রত্ন চিনে নেবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কাব্যালোচনা ও কবিতা বিষয়ক গ্রন্থগুলি তাঁর এতটা উতরেছে তার কারণই হলো এই যে কবিতা রচনাকার্যে তাঁর জীবনের অনেকখানিই অতিবাহিত হয়েছিল, ফলে কিভাবে কত যত্ন ও প্রস্তুতির পর এক একটি কবিতা হয়ে ওঠে, তিনি জানতেন। জানতেন বলেই নিজ অভিজ্ঞতা ও অর্জিত অধিকারকে সমালোচনায় সম্যক্ কাজে লাগাতেন। কবি হিসেবে বুদ্ধদেব এভাবেই আধুনিক বাংলা কবিতার সুনিয়োজিত

প্রতিপালকের কাজ করেছেন। তাছাড়াও ছিলো তাঁর নিজস্ব কবিতাগ্রন্থ, সংখ্যায় যা কম নয়। এগুলির সামগ্রিক নিরপেক্ষ মূল্যায়ন হলে আমরা দেখব বুদ্ধদেবের কবিকৃতি কোনো অর্থেই তাঁর সমকালীন কবিদের রচনাকার্যের তুলনায় নিকৃষ্টতর ছিলো না। রূপমগ্নতার আর্তি ও ইতিহাসবোধ যখন জীবনানন্দের কবিতায় আশ্রয় পেয়েছিলো, সুধীন্দ্রনাথে পরিশীলিত ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগ পেয়েছিল নূতন রূপকল্প, অমিয় চক্রবর্তী তখন কবিতায় জীবনের চলমানতাকেই অবলম্বন করেছিলেন। বহুগুঞ্জনকভাবে মার্ক্সবাদের কথা ঘোষণা করলেও বিষ্ণু দে-র কবিতা জনজীবনাশ্রিত না হয়ে বরাবরই চাতুর্য ও বুদ্ধির দ্বারস্থ হয়েছে। এবং সমর সেনের উপজীব্য ছিলো মধ্যবিত্ত জীবনের মর্মান্তিক অবক্ষয় ও আপাত তুচ্ছতার দিক। বুদ্ধদেবের কবিতায় উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যাবলীর সুসম বণ্টনই আমরা দেখতে পাই। এতটুকুও অতিরঞ্জিত হবে না যদি বলি তাঁর কবিতায় একাধিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনো একটি অপর একটিকে ছাপিয়ে বা দুর্বল করে বড় হয়ে ওঠে নি। অর্থাৎ তাঁর কবিতা ও কবিচরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যই হলো এই, যে তাকে কোনো একটি পরিচয়জ্ঞাপক বিশেষ সূত্রে বাঁধা যাবে না। কেউ তাঁর কবিতায় পান দেহবাদ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার লক্ষণ, অন্য আর একজন আবিষ্কার করেন শুদ্ধ রোমান্টিকতা ও মন্ময়তার অন্তর্লীন কারুকাজ এবং এরই সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তি কর্তৃক পরিলক্ষিত হয় বৈদগ্ধ্য ও ছান্দসিকতা। কিন্তু এখনো পর্যন্ত বুদ্ধদেবের কবিতা ঠিক কি বা কোন্ ধরণের তার যথাযথ মীমাংসা হয় নি। বা এ বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কেউ মনোযোগী হন নি বলা চলে। এই ঘটনাটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে বুদ্ধদেবের কবিতার আসল তাৎপর্য। এক লহমায়, অনায়াস পটুত্বে বুদ্ধদেবের কবিতাকে চিহ্নিত করা যায় না, যেমনটি করা যায় জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে ও সমর সেনের কবিতাকে। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর কবিতা সহজ, সুখপাঠ্য ও ছন্দোময়, কিন্তু প্রতারক। সহজের ছদ্মবেশে সে লুকিয়ে রাখে নিজেকে, বিভিন্ন বিবর্তন, টানাপোড়েন ও পরীক্ষানিরীক্ষার জটিল আবর্তগুলি এই জন্যেই অনেকের চোখে পড়ে না। অথবা ক্ষেত্রবিশেষে সুর ও সুনির্বাচিত সুললিত শব্দের মোহে আকৃষ্ট ও আবদ্ধ হয়ে কবিতার মর্মার্থ ও কবিকে অনেকে হারিয়ে ফেলেন, খুঁজে পান না। আর তখনই বুদ্ধদেবকে তাঁরা চিনতে ভুল করেন। এই ঘটনা বুদ্ধদেবের কবিতারচনা সুরু হওয়ার সময় থেকেই অপরিবর্তিতভাবে চলে আসছে (তাঁর 'বন্দীর বন্দনা' ও 'শাপভ্রষ্ট' প্রভৃতি কবিতা প্রথম 'কল্লোলে' প্রকাশিত হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ বছর।) তবু তিনি কবিতা লিখেছেন। যেহেতু না লিখে তাঁর উপায় ছিলো না। কেন না কবিতা ছিলো

তাঁর প্রাণ, এবং প্রাণ ধারণের আনন্দটুকু উদ্‌যাপিত হয়েছিল নির্যাসতুল্য কবিতার মাধ্যমেই।

কবিতা কি শুধু তা'ই যা কাব্যগ্রন্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ ? এ প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই নঙর্থক হবে। কবিতা বুদ্ধদেবের সত্তা ও অস্তিত্ব জুড়ে ছিলো বলেই গদ্যগ্রন্থগুলিও তাঁর কম কবিত্বময় নয়। এবং ভাষার প্রসাদগুণ সেখানে উপলক্ষ্য মাত্র। তাঁর গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও রম্যরচনার ছত্রে ছত্রে গুপ্তধনের মতো আমরা আবিষ্কার করি আহৃত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বোধি, সুকুমার অনুভূতি, সর্বোপরি মমতা ও সহানুভূতি, দুঃখিতের জন্য সান্ত্বনা, ব্যর্থ ভগ্নোদ্যম মানুষের জন্য আশ্বাস ও অন্যের নিরুদ্ধ দুঃখের ভারবহনের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অভিলাষ। এ সব কিছুই সম্ভব হয়েছিলো বোধ, বুদ্ধি, স্বভাব ও মননে তিনি কবি ছিলেন বলেই। তাই অবাক হই না যখন দেখি একটি গল্প এভাবে শুরু হয় :

> মাঠের বুক চিরে পথ চ'লে গেছে অদৃষ্টের মতো এঁকে-বেঁকে। দ্রুত হাঁটছিলো সে···তার স্যাণ্ডেল-পরা পা থেকে থেকে পড়ছিলো পথের বাইরে, কখনো ডাইনে, কখনো বাঁয়ে, কখনো ভিজে-ভিজে ঘাসের মেয়েলি শরীরে, কখনো চোর কাঁটার পুরুষালি চুমোয়। দু-শো, চারশো, হাজার বার এ-পথ দিয়ে সে হেঁটেছে, জলজলে রোদ্দুরে, যাই-যাই বিকেলে, থমথমে মস্ত কালো রাত্তিরে, কখনো দলবল নিয়ে হৈ-চৈ ক'রে, কখনো ভাবতে-ভাবতে একা ; কত ভালো লেগেছে, আবার ভালো লাগেও নি, কিন্তু আজকের মতো লাগেনি আর কখনো। কী ক'রে লাগবে—এমন রাত আর কি এসেছে তার জীবনে! আকাশে চাঁদ, মাঠে কুয়াশা, ঘাসে শিশির, তার সুস্থ তরুণ শরীরে অল্প শীতের সুখ, আর মনে—তার মনে আনন্দের সমুদ্র। আজকের এই রাত্রিটি যেন তার, একান্তই তার ; পৃথিবীর মানুষ যখন ঘুমের ঘোরে অচেতন, তখন এই আশ্চর্য রাত্রির হৃদয়ের মধ্যে বেঁচে আছে সে একা। সারা রাত ধ'রে এমনি যদি হাঁটতে পারতো সে, যদি কোনোখানে পৌঁছবার না-থাকতো কোথাও, থাকতো শুধু মাঠের পরে মাঠ, আর ঘাস, গাছ, চাঁদ, আর শিশির। আর তার হৃৎস্পন্দনে কবিতার ছন্দ, তার একটু-খোলা ঠোঁটে কবিতার উষ্ণ কম্পন, আর ছন্দের উৎসুক কুঁড়ি তার মনের অন্তহীন নির্জনতায়! আর···তাকে ঘিরে, তাকে ভ'রে, এই রাত্রির মধ্যে তাকে ছড়িয়ে দিয়ে, ঘাসের গন্ধে তাকে জড়িয়ে ধ'রে একটি মুখ, একটি নাম, একটি···কিন্তু সেই মুখ, সেই নাম, সেই আশ্চর্য শব্দহীন

উপলব্ধি, সেই তো তার কবিতা, তার কবিতার হৃদয়, তার হৃদয়ের হৃৎপিণ্ড—সেই নামই তো সে পৃথিবী ভ'রে রটাবে লক্ষ-লক্ষ অক্ষরে, সেই মুখ এঁকে দেবে ঝড়ে, ঝরণায়, রোদ্দুরে, মানুষের ধ্বংসহীন স্বপ্নে, কল্পনার চিরন্তনতায়) এ কী আজ উন্মীলিত হ'লো তার মধ্যে—একি প্রেম? একি যৌবন? একি কবিতা?

(দুই কবিতার কাহিনী, বুদ্ধদেব বসুর স্ব-নির্বাচিত গল্প, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোম্পানি সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬২ ; পৃষ্ঠা ১৭৮)

প্রয়োজন হলে বুদ্ধদেবের গদ্য কতখানি সম্প্রসারণশীল হতে পারে বোঝাতে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম। রাবীন্দ্রিক না হয়েও রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসূরি বুদ্ধদেব—অর্থাৎ সম্পূর্ণতার সাধক, কোনো আংশিক সাফল্যে তুষ্ট নন; জীবন ও সাহিত্যকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখেছেন, নানাভাবে দেখেছেন—তার জন্য যখন যা প্রয়োজন হয়েছে লিখেছেন, কোনো একটি বিশেষ শাখার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখার দুর্বার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। অন্তর্দৃষ্টি ও মমতা যা একজন কবির সার্থকতার চাবিকাঠি তা ছিলো তাঁর আয়ত্তে। এবং এই দুটি গুণের সার্থক ব্যবহার তাঁর বিভিন্ন সাহিত্য কর্মে দেখতে পাই বলেই তাঁকে প্রধানতঃ কবি বলেই মানি, যেমন রবীন্দ্রনাথ—মূলতঃ কবিই, তেমনিই বুদ্ধদেব। তাঁর তিরোধানের পর বাংলা সাহিত্যে তৃতীয় সার্থক চৌকশ ব্যক্তির আবার কবে আবির্ভাব হবে জানি না।

চিরযৌবনের কথা

অমিতাভ গুপ্ত

১৮৬০ সনের মে মাসে মধুসূদন দত্ত 'ভগবতী বাগ্‌দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন' করলেন। কলকাতার ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস থেকে ছাপা তাঁর 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' প্রকাশের সনতারিখ সকলেই নির্ভুলভাবে মনে রেখেছেন। কিন্তু অনেকেরই হয়ত' খেয়াল নেই যে, ঠিক ওই একই সময়ে অর্থাৎ ১৮৬০ সনের মে মাসে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম কবিতা পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিলো। ঢাকা থেকে এই পত্রিকাটি বের করেছিলেন হরিশ্চন্দ্র মিত্র। 'বঙ্গীয় কবিতার উৎকর্ষসাধন ও বিশুদ্ধ কাব্যকলা প্রচার দ্বারা জনমণ্ডলীর কল্যাণবর্দ্ধনই এতৎ পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য'—এই বিজ্ঞপ্তি নিয়ে প্রচারিত 'কবিতা কুসুমাবলী' নাম্নী এই 'পদ্যময়ী মাসিক পত্রিকা'র প্রথম সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

কলকাতা থেকে প্রথম কবিতা পত্রিকা বোধ হয় প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮৭৮ সনের এপ্রিল মাসে। আলবার্ট প্রেসে মুদ্রিত, রাজকৃষ্ণ রায় কর্তৃক সম্পাদিত 'নানাবিষয়িনী কবিতা প্রসবিনী' এই পত্রিকাটির নাম ছিলো 'বীণা'। সম্ভবতঃ ১৮৮৭ সালে পত্রিকাটি প্রকাশ রহিত হয়।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন, 'আমার ধারনা ছিলো নিখিল ভারতে 'কবিতা'ই প্রথম কবিতা-পত্রিকা (আহমেদাবাদ থেকে একটি গুজরাতি 'কবিতা' বেরোয় খুব সম্ভব তার পরের বছর ও আমাদেরই দৃষ্টান্তে)—কিন্তু অনেককাল পরে, ব্রজেন বাঁড়ুয্যে বা অন্য কোনো গবেষকের লেখায় পড়েছিলাম ঢাকা থেকে এক মহিলা একটি কবিতা-পত্রিকা বের করেন উনিশ-শতকের কোনো এক সময়ে। একজন মহিলা, তার উপর অগ্রসর ঢাকা শহরে অতকাল আগে—ঘটনাটা চমকপ্রদ, সন্দেহ নেই, কিন্তু এ-বিষয়ে অন্য কোনো তথ্য আমি কখনোই জানতে পারিনি।'

পূর্বোল্লিখিত 'কবিতা কুসুমাবলী'র সঙ্গে কোনো মহিলার অবদান সংযুক্ত ছিলো কিনা কিংবা ঢাকা থেকে সত্যিই কোনো মহিলা স্বতন্ত্রভাবে কবিতা-পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন কিনা যা নাকি বাংলাভাষার প্রথম কবিতা পত্রিকা হওয়ার গৌরব দাবি করতে পারে—সে সম্পর্কে কিছু অবগত হওয়া যায় নি। তবে

এখন, অন্তত 'কবিতাকুসুমাবলী' ও 'বীণা' পত্রিকা দু'টির সন্ধান পেয়ে 'কবিতা'-কে এ'দেশের কিংবা বাংলাভাষার প্রথম কবিতা-পত্রিকা বলে গন্য করা যায় না।

কিন্তু কোনো কাজ সর্বপ্রথম করাটাই সবচেয়ে কৃতিত্বের নয়, নির্ভুলভাবে করাটাই আসল। যে তাৎপর্যটির দিকে আমি ইঙ্গিত করতে চাইছি তা' হলো, বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা'র গৌরব কেবলমাত্র কোনো বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভরশীল নয়। ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম অনুসারে 'কবিতা' বাংলাভাষায় প্রথম কবিতা-পত্রিকা নয়, তবু তার ফলে আমাদের কোনো অস্বস্তি জাগে না এবং 'কবিতা'র মুকুট থেকে একটি পালকও খসে পড়ে না।

১৯৩৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সহকারি সম্পাদক ছিলেন সমর সেন। বুদ্ধদেব বসুর যে অভিলাষ এই পত্রিকার প্রকাশের জন্য প্রেরণা দিয়েছিলো, যে অস্থিরতা নিয়ে তিনি 'কবিতা'র জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন তার কথা নিজেই বলেছেন তিনি: 'কবিতার জন্য পরিচ্ছন্ন আর নিভৃত একটু স্থান করে দেবো, যাতে তাকে ক্রমপ্রকাশ্য উপন্যাসের পদপ্রান্তে বসতে না হয়, কুন্ঠিত হয়ে থাকতে না হয় রঙ্‌-বেরঙের পসরার মধ্যে।' এই প্রসঙ্গে প্রতিভা বসু লিখেছেন, 'এই পত্রিকা বার করবার পরিকল্পনা বুদ্ধদেব অনেকদিন যাবতই করছিলেন। গল্প উপন্যাসের তলায় জায়গা থাকলে তার পাদদেশেই কবিতার আশ্রয় এটা বুদ্ধদেবের পক্ষে কোনো ক্রমেই সহনীয় ছিলো না। অসহিষ্ণু হয়ে কতো সময় কাগজ ছুঁড়ে ফেলতে দেখেছি, তারপরেই বলেছেন, 'থাই, না থাই, এটার জন্য একটা বিহিত আমাদের করতেই হবে।' অনুমান করতে আমাদের কষ্ট হয় না যে, একজন যথার্থ প্রেমিকের জেদ ও অহংকার নিয়ে, অপরিসীম মমত্ব নিয়ে বুদ্ধদেব বসু বাংলা কবিতার কথা ভেবেছিলেন; সেই ভাবনার যন্ত্রণাবিদ্ধ হতে হতে 'কবিতা' না প্রকাশ করে তাঁর উপায় ছিলো না।

আমরা জানি, এই ভাবনার সুরু হয়েছিলো আরো আট বছর আগে, কোনো এক গ্রীষ্মের আরক্ত প্রহরে যখন ঢাকা শহরের দু'জন কাব্য-উৎসুক যুবক, বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত, তাঁদের 'প্রগতি' ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করলেন। আমরা জানি, 'কবিতা'র মতো 'প্রগতি'রও উদ্দেশ্য ছিলো নতুন সাহিত্য শুধু প্রকাশ করা নয়, প্রচারও করা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত আর নজরুল ইসলাম ছাড়া 'প্রগতি'র অন্যান্য সকলেই ছিলেন 'আসন্ন, অত্যাসন্ন, উপক্রমণিক'। 'প্রগতি'র পৃষ্ঠায়ই জীবনানন্দ দাশের কবিতা প্রথম আলোচিত হয়।

ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে আসবার পর বুদ্ধদেব বসুর জীবনে আর একটি ছোটো ঘটনা ঘটেছিলো যা এখানে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। 'পরিচয়'—এর কোনো এক বৈঠকে অন্নদাশঙ্কর রায়ের হাতে তিনি 'পোইট্রি' নামক একটি ক্ষীণাঙ্গ ইংরেজি পত্রিকার সংখ্যা দেখতে পেয়েছিলেন—হয়তো তা' ছিলো শিকাগো থেকে প্রকাশিত হ্যারয়েট মনরোর বিখ্যাত 'পোইট্রি' পত্রিকারই একটি সংখ্যা। তখনই তাঁর মনে জেগেছিলো সেই অসম্ভব আশা, কিন্তু সেই অঙ্কুর থেকেই ফল ফললো প্রায় চার বছর পরে'. সঙ্গী হলেন তাঁর সেসময়কার ঘনিষ্ঠতম সাহিত্যিক বন্ধু প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রধান উৎসাহদাতা বিষ্ণু দে ও সমর সেন।

'হলুদে মলাটে চল্লিশ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনহীন' এই পত্রিকাটি জন্মমাত্রই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করলেন, এডওয়ার্ড টমসন 'টাইমস্ লিটারেরি সাপ্লিমেণ্ট'-এর সম্পাদকীয়তে 'কবিতা' পত্রিকাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

'কবিতা'র প্রথম সংখ্যায় এগারোজন কবির মোট সতেরোটি কবিতা সংকলিত হয়েছিলো।

বর্তমান লেখক সেইসব সৌভাগ্যবঞ্চিতদেরই একজন, আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতি যাদের আকর্ষণ প্রস্তুত হওয়ার আগেই বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। খুবই সম্প্রতি, অনেক চেষ্টার শেষে. 'কবিতা'র একুশটি সংকলন আমি অর্জন করতে পেরেছি : শতাধিক সংখ্যার মধ্যে মাত্র একুশটি—কিন্তু প্রাপ্তি আমার মাত্রাতিরিক্ত। কত সন্ধ্যায়, কত অবসরহীন মধ্যাহ্নের প্রহরে আমার যেন অজস্র জন্মান্তর ঘটেছে এই পত্রিকার কালো হয়ে ওঠা, স্খলিত হয়ে আসা পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে সঞ্চরণ করে। এ'কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আমার মতো আরো অনেক ভাগ্যহীন আছেন : তাদের কারো জন্যে বুদ্ধদেব বসু অপেক্ষা করেননি, তিনি ইতিহাস নির্দিষ্ট নির্ভুল সময়ে সমস্ত কৃত্যের অনুষ্ঠান করে গিয়েছেন। তিনি কারো জন্যে, কোনো কিছুর জন্যেই অপেক্ষা করে থাকেন নি, বাংলা কবিতাই তাঁর জন্যে পথ চেয়ে বসেছিলো।

তাঁর প্রথম কয়েকটি বৎসরের কাজ ছিলো, যে নবীন কবিতা ও কাব্য চেতনা ইতোমধ্যেই জন্মলাভ করেছে তার প্রতিষ্ঠা দান করা। প্রথম সংখ্যাগুলিতে সেকালের সব আধুনিক কবিরাই এসে উপস্থিত হয়েছেন, রয়েছেন আধুনিকদের মধ্যে প্রথম—রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে বাস্তবিক-পক্ষে যাঁর রচনা থেকেই শুরু

হয়েছিলো—সেই কবি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মনে রাখা দরকার, বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক প্রকাশিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র প্রথম সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সংকলিত কবিদের পুরোভাগে এবং তিনিই ছিলেন সর্বাধিক সংখ্যক কবিতার লেখক। 'কবিতা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' প্রকাশিত হয় এবং তারপর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত—এমন কী মৃত্যুর পরেও, 'কবিতা'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক গভীরভাবে জড়িয়ে ছিলো।

কবি রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর মনে সংশয়ের কোনো অবকাশ ছিলো না, এ'কথা বলাই কিন্তু যথেষ্ট নয়। উল্লেখনীয় যে, বুদ্ধদেব তাঁর নিজের প্রতীতির যথার্থতা প্রমাণ করবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। একদিকে যেমন তিনি রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাসগুলিকে প্রবন্ধ—নিবন্ধ—সমালোচনার মধ্যে দিয়ে আধুনিক মানসের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, 'কবিতা'র পাতায় নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধুনিকতার দীপ্ত প্রমাণগুলি হাজির করেছেন—অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথকে ও তরুণদের আধুনিক কাব্যচর্চার বিষয়ে অবহিত করার দায়িত্বও অনেকখানি গ্রহণ করেছিলেন তিনি স্বেচ্ছায়। 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যাটি রবীন্দ্রনাথকে নিবেদন করে যে চিঠি লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু, সেখানেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন সমর সেনের কথা, সমর সেনের সম্বন্ধে তাঁর 'মস্ত আশা পোষণ' করবার কথা : সমর সেনের কাব্যচর্চার দৃষ্টান্ত 'কবিতা'য়ই প্রথম দেখা যায়।

কেবলমাত্র সমর সেন নয়, ছিলেন আরো অনেক। কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, 'জীবনানন্দ দাশ, অজিত দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে··· এঁদের কবিতা আগে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু কবির সম্মান তাঁরা পাননি। তাঁদের কবিতা নিয়ে ভালো করে আলোচনাও হয়নি "কবিতা" পত্রিকাই প্রথম তাঁদের কবি-সম্মান দেয়, তাঁদের কবিতা নিয়ে নিষ্ঠাভরে আলোচনা করে।' প্রথম দশ বছর যাঁরা সবচেয়ে বেশী প্রকাশিত ও আলোচিত হয়েছেন, তাদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নাম। আর, কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় আমরা পাই প্রথম বছরে 'কবিতা'য় প্রকাশিত বিখ্যাত কবিতাগুলির একটি তালিকা, যার মধ্যে রয়েছে জীবনানন্দ দাশ রচিত 'বনলতা সেন'।

দ্বিতীয় বছরে বুদ্ধদেব বসু 'নবযৌবনের কবিতা' শিরোনামায়, সমর সেনের সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কয়েকটি কবিতা' অবলম্বন করে, এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ

রচনা করেন। এরপর আরেকটি প্রবন্ধ তিনি লিখলেন জীবনানন্দ দাসের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'কে নিয়ে। তারপর, 'কবিতা'য় উপর্যুপরি তাঁর আরো কয়েকটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো, যাদের উপলক্ষ্য কখনো সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'ক্রন্দসী' কখনো অমিয় চক্রবর্তীর 'খসড়া,' কখনো বা অজিত দত্তের 'পাতালকন্যা'। ষষ্ঠ বছরের 'কবিতা'র একটি সংখ্যায় আরেকটি প্রবন্ধ তিনি রচনা করলেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থ নিয়ে।

আবার আমাদের মনে পড়ে যায় তাঁর নিজের কয়েকটি কথা যা এখানে নিশ্চিতভাবেই উদ্ধৃতিযোগ্য : 'প্রগতি'র সময়েই টের পেয়েছিলাম আমার মধ্যে একটি অংশ আছে প্রচারকের : সাহিত্যে আমাকে যা আনন্দ দেয় তাতে অন্যেরাও আনন্দিত হোক এই ইচ্ছার বেগ আমি সামলাতে পারিনা ; তার তাড়নায় এমন অনেক কাজ করে থাকি যাকে চলতি বাংলায় বলে 'বনের মোষ তাড়ানো' আমার এই বৃত্তিটি নির্বাধ ছাড়া পেলো 'কবিতা' বেরোবার পর, কেননা তখনই একের পর এক দেখা দিচ্ছেন নানা বয়সের নতুন ধরনের কবিরা, দেখা দিচ্ছেন বা প্রাপ্ত হচ্ছেন পরিণতি — বাংলাভাষায় কবিতালেখা কাজটি হয়ে উঠছে শুধু ব্যক্তিগত উচ্চাশা পূরণের উপায় নয়, রীতিমতো একটি আন্দোলন যার মুখপাত্ররূপে চিহ্নিত হয়েছে 'কবিতা' পত্রিকা।'

শুধু সেই ক'টি দিনের জন্য নয়, আরো বহুদিন ধরে, বহু বছর, বুদ্ধদেব বসু এই কর্ম সম্পাদন করে গিয়েছেন। তাঁর নিজস্ব কাজও ছিলো অনেক — 'কল্লোল'-এর আমল থেকেই তো তিনি প্রথিতযশা সাহিত্যিক। এরমধ্যে তাঁকে সংসারীও হতে হয়েছে, বেড়েছে দায়িত্ব তাঁর ঘরের সদস্য ও বাইরের পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে। তবু, তিনি কখনো পরাঙ্মুখ হননি। এমন কি, ষষ্ঠ বছর থেকে সম্পাদক হিসেবে যখন শুধু তাঁর নামই ছাপা হতে লাগলো—তখনও নয়।

আমি যে কয়েকটি 'কবিতা' দেখেছি, তার মধ্যে নব্যতর কাব্যের সূচনার ইতিহাসটিও খুব অস্পষ্ট নয়। নব্যতর, অর্থাৎ যে কবিতা আজকের পাঠকের কাছে আরো বেশী আধুনিক—আরো স্বচ্ছভাবে বলতে গেলে বলা উচিৎ পঞ্চাশের দশকের কবিদের কাব্যচর্চায় আধুনিকতার যে ধারাটি প্রস্তুত হয়েছে তার প্রথম তরঙ্গরেখা ধরা পড়ে 'কবিতা'র কয়েকটি সংখ্যায়।

'কবিতা' পত্রিকা উঠে যেতে যেতেও উঠে গেল না, বুদ্ধদেব বসু প্রৌঢ়তার দরজা থেকে কী করে একদিন আবার যৌবনে ফিরে এলেন। বিচিত্র স্বাদ,

বিচিত্র মেজাজের 'কবিতা' পত্রিকায় নতুন সব কবির মুখ দেখা গেল—' লিখেছেন তারাপদ রায়। 'কবিতা' পত্রিকার সঙ্গে আধুনিক ও আধুনিকতর বাংলা কবিতার যোগসূত্রটি এইভাবে বারবারই মনে পড়ে যায়। বিংশবর্ষের (১৯৫৫—'৫৬) 'কবিতা'র সম্পূর্ণ সূচীপত্রটি পরীক্ষা করে যে কেউ দেখতে পাবেন, আজকের প্রথিতযশা আধুনিক কবিরাই —তখন তাঁদের কারো বয়েস বোধহয় পঁচিশের বেশী নয়—রয়েছেন সেখানে সবচেয়ে বেশী মর্যাদা নিয়ে।

বয়েস বাড়ার সাথে সাথে কবিতা তার যৌবন হারায়নি, বরং অন্য এক নবীন যৌবনের আসঙ্গলিপ্সা গ্রহণ করেছে। 'কবিতা'র শেষ কয়েক বছরের পাতায় অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অলোক সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কবির রচিত কোনো গ্রন্থের বহির্ভূত ও ইতপূর্বে আমার অপঠিত কয়েকটি কবিতা আবিষ্কার করে পুলকিত হয়েছি। জ্যোতির্ময় দত্ত তো নিয়মিতভাবে উপস্থিত ছিলেন। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, ফনীভূষণ আচার্য, কবিতা সিংহ এবং নমিতা মুখোপাধ্যায়ের রচনা অন্ততঃ একটি করে দেখেছি। • উল্লেখ করা যেতে পারে, কবি নমিতা মুখোপাধ্যায় পরবর্তীকালে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় নামে নবজন্ম গ্রহন করেন।

এ'কথা সত্য, আমার স্বল্পসংগ্রহের মধ্যে 'কবিতা' পত্রিকায় আমি অনেকের লেখা পেলাম না, যেমন শঙ্খ ঘোষ কিংবা উৎপল কুমার বসু। তথাপি এ'রকম ধারণা করা বোধহয় খুব অন্যায় হবে না যে, শততম সংখ্যায় পৌঁছনোর আগেই 'কবিতা' পত্রিকার প্রায় সব পৃষ্ঠায় অধিকার বিস্তার করেছিলেন তরুণতম কবিরা এবং তাঁদের কবিতা শুধু যে প্রকাশিত হয়েছে তা-ই নয়, তাঁদের কাব্যগ্রন্থগুলিও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে 'কবিতা'য়—প্রায় সবক্ষেত্রেই এই কাব্যগ্রন্থগুলি সংশ্লিষ্ট কবিব প্রথম কাব্যগ্রন্থ—যেমন হয়েছিলো অমিয় চক্রবর্তী বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বেলায়। 'কবিতা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত সমর সেনের 'কয়েকটি কবিতার সমালোচনা থেকে একশ চার সংখ্যার 'যৌবন বাউল' ও 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্যে'র সমালোচনা স্তম্ভে এই বহুবিচিত্র বর্ণময় রূপান্তর বাংলা কাব্যধারার বিবর্তনের ইতিহাসটিকেই যেন প্রতিফলিত করে রেখেছে।

বাংলা কবিতার প্রতি বুদ্ধদেব বসুর আন্তরিক টানের আরো অজস্র প্রমাণ নিশ্চয়ই 'কবিতা' পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। কোনো উৎসাহী গবেষক একদিন সেগুলিকে খুঁজে বের করে বুদ্ধদেব বসুকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেবেন, সন্দেহ নেই। বর্তমান লেখক কয়েকটি সূত্রের দিকে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন, এই নিবন্ধে।

যেমন, আমার একথাও মনে হয়েছে যে, নিতান্ত ব্যবহারিক অর্থেও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তাই, আধুনিক কবিতার যথাযথ অনুবাদ করার বিষয়ে তাঁকে বারংবার স্বতঃপ্রণোদিত হতে দেখি। রবীন্দ্রনাথের পরেও বাংলা কবিতা যে থেমে যায় নি, একটা নতুন কিছু করার চেষ্টা চলেছে, আধুনিকতার অনুপ্রবেশ বাংলা কবিতায়ও যে ঘটেছে—এ সব খবর ভিন্ন ভাষাভাষী পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জরুরী তাগিদ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলো।

শততম, 'আন্তর্জাতিক' সংখ্যার আগেও 'কবিতা'র একটি সংকলনে আমরা দেখতে পাই কিছু আধুনিক বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ (সংখ্যা চুয়াত্তর, জুন—১৯৫৩)। বোঝা যায়, বুদ্ধদেব বসুর একটি দীর্ঘলালিত ইচ্ছে ছিলো যাঁরা বাংলা ভাষা বোঝেন না এমন পাঠকদের কাছে আধুনিক বাংলা কবিতার রূপটি তুলে ধরা। একটি বিজ্ঞপ্তিতে বুদ্ধদেব বসু স্পষ্টভাবে তাঁর অভিমত জানিয়েছেন : 'রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলাকাব্যের প্রচার এখন সর্বতোভাবেই বাঞ্ছনীয়।' আধুনিক বাংলা কবিতাকে তিনি যেন সর্বপ্রকার দীনতা থেকে উদ্ধার করতে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন। সলজ্জ বঙ্গমৃত্তিকা থেকে তুলে এনে তাকে সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত সচেতন পাঠকের সামনে উপস্থিত করিয়ে দিতে যে সাহস বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছিলেন, এবং এ' সাহস বাংলা কবিতাকে যে সঞ্জীবনী দান করেছিলো, তার তুলনা মেলা ভার। যথার্থ প্রেমিকের মতোই তাঁর এ'রূপ প্রত্যয় ছিলো যে আধুনিক বাংলা কবিতা ও ষড়ৈশ্বর্যশালিনী—বিশ্বসাহিত্যের মন্দিরে তারও ঠাঁই পাওয়ার সময় হয়েছে।

মন্দিরের অন্যান্য বিগ্রহগুলির সঙ্গে বাঙ্গালী কবিতা পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়ও তাঁরই : আজ, এই আলস্যের যুগে ভাবতে গেলেও অবিশ্বাস্য লাগে যে, একই সংখ্যায় (ডিসেম্বর, ১৯৫৬) 'কবিতা'র জন্য বুদ্ধদেব বসু অনুবাদ করেছেন বোদলেয়ারের দশটি কবিতা, হেল্ডারলিনের সুদীর্ঘ রচনা 'দিওতিমার জন্য মেনন-এর বিলাপ' এবং কালিদাসের 'মেঘদূত' থেকে সম্পূর্ণ উত্তর মেঘ-খণ্ড! আজ আমাদের কাছে এ'যেন মনে হয় কিংবদন্তীশ্রুত কোনো নায়কের অলৌকিক কীর্তিকলাপ। বুদ্ধদেব বসু-কৃত আরো অজস্র অনুবাদের সঙ্গে 'কবিতা'র পাতায় অনূদিত হয়ে চলেছে আর্তুর র‍্যাঁবো, পোল এলুয়ারের কবিতা—আমরা লক্ষ্য করি, তরুণ লেখকেরাও উৎসাহী হয়ে উঠেছেন এই কাজে, ৮৭তম সংখ্যায় হাইনে সম্পর্কে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন জ্যোতির্ময় দত্ত; পাস্টেরনাককে উপলক্ষ্য করে অমিয় চক্রবর্তী ও বুদ্ধদেব বসুর মতবিনিময় পত্রাকারে প্রকাশিত হলো; সর্বোপরি,

দেখেছি বুদ্ধদেব বসুর সেই সুবিখ্যাত প্রবন্ধ 'আর্ল বোদলেয়ার ও আধুনিক কবিতা'। অনুমান করতে পারি আমরা, এখন সংহত হয়ে উঠছে সেই মেঘ তরুণ কবিদের চিত্তাকাশে, যা অবশেষে জলবিদ্যুৎবজ্র হয়ে ঝড়ে ও হাহাকারে পঞ্চাশের দশকের কবিদের রচনায় নেমে এসেছিলো।

এ'ভাবেই, নানা আয়োজনে, সেদিনের তরুণতম কবিদের জন্যে দ্বার খুলে দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু, সেই খোলা দরজা দিয়ে তরুণ কবিরা প্রবেশ করেছিলেন কাব্যের স্বর্গবিশ্বে—একটি প্রতীকের মতো 'কবিতা' পত্রিকা তাঁদের শুধু মায়াবী চাবিটি দিয়েই ফুরিয়ে যায়নি, সমগ্র ইন্দ্রজালের কিছু অংশও দিয়েছিলো।

এইসব কবিদের অনেকেই আজ খ্যাতিলাভ করেছেন। যাঁরা বিখ্যাত হননি, তাঁদের সম্পর্কেও আমরা বলতে পারি যে, তাঁরা অমরতার স্বাদ গ্রহন করেছিলেন। অধুনাবিস্মৃত কোনো কোনো কবির উজ্জ্বল কিছু কবিতা আজ শুধু এই পত্রিকার পৃষ্ঠায়ই অমরতার সহচর হয়ে রয়েছে. সেইসব কবিরা সাহিত্য জগত থেকে হয়ত' একেবারেই বিদায় নিয়েছেন, হয়তো তাঁদের রচনার পাণ্ডুলিপিগুলিও নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কিন্তু 'কবিতা'র পাতায় আজো তাঁদের রচনাগুলি জীবিত—যেন মনে হয় এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় যা'কিছু মুদ্রিত হয়েছে, যাঁরাই এসেছেন 'কবিতা'র সান্নিধ্যে—সেই সব কিছু, তাঁরা প্রত্যেকেই ক্ষণমুহূর্তের জন্যে হলেও চিরজীবনের সাক্ষাৎলাভ করেছিলেন।

তাঁদের কথা বুদ্ধদেব বসু কী অপরিসীম প্রীতির সঙ্গে মনে রেখেছেন তা' আমরা লক্ষ্য করি তাঁর আত্মজীবনীতে। কাব্যচর্চার সূত্রে তাঁদের সঙ্গে তাঁর এমন একটি ব্যক্তিগত সম্পর্কও গড়ে উঠেছিলো যা কখনো বিনষ্ট হওয়ার নয়। এই ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রতি তাঁর মোহের প্রমাণ আরো অনেকবার আমরা পেয়েছি; হৃদয়বিনিময়ে তিনি ছিলেন নিত্যউৎসুক; বন্ধুদের সম্পর্কে, প্রিয়জনের প্রতি বিশেষভাবে আবেগপ্রবণ তিনি কতবার নিজের বন্ধুপ্রীতির কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা বুঝতে পারি, রাজশেখর বসুর সঙ্গে তাঁর যে আত্মীয়তা ছিলো তা' শুধু শ্রদ্ধা ও স্নেহবিনিময়ের সম্পর্কের অভিধায় আঁটা যায় না, তা' শুধু দু'জন নিষ্ঠাবান সাহিত্যিকের পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক মোহ নয়—তা' আমাদের অনুমানের অতিরিক্ত গভীরতর কোনো বন্ধন (চৈত্র, ১৩৬৬)। তাঁর আবেগ যখন সংহত হয় অপারসীম শোকের ছোঁয়া লেগে, তখনই প্রস্তুত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে বিরলদৃষ্ট অপরূপ কয়েকটি স্মৃতি-সংখ্যা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশ কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে স্মরণ করে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। প্রিয়দের মধ্যেও প্রিয়তম মানুষটির বিচ্ছেদ বুঝি বড়ো বেশী মর্মান্তিক হয়েছিলো তাঁর কাছে। আমরা দেখতে পাই, সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে আর বেশীদিন চলেনি 'কবিতা' পত্রিকা। আমাদের যেন মনে হয়, এই দু'টি ঘটনার মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে: কর্মী হিসেবে তিনি সম্পূর্ণ একাকী হলেও তাঁর ছবি কখনও ম্লান হয় না, কিন্তু হৃদয়াবেগমুগ্ধ এই মানুষটির নিঃসঙ্গতার ভার এবার বুঝি দুর্বহ হয়ে উঠলো, হয়ত' 'কবিতা' পত্রিকার জন্য—যে পত্রিকা একদা তাঁদের দু'জনের মধ্যে একটি সোনার সেতু তৈরী করেছিলো—সুধীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতি আরো অসহনীয় হলো তাঁর কাছে। বাংলা ১৩৬৭ সনে আশ্বিন—পৌষ সংখ্যাটি সুধীন্দ্রনাথের স্মৃতি-সংখ্যা; এর পরে প্রকাশিত 'কবিতা' পত্রিকার আর একটিমাত্র সংকলন আমার হাতে এসেছে, ওই বছরেই চৈত্রমাসে সেটি প্রকাশিত। আমার যতখানি জানা আছে, কয়েকবছর পরে 'কবিতা'র আরেকটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিলো, বুদ্ধদেব বসুর জীবিতকালেই, কিন্তু সে-সংখ্যাটি সম্পাদনা করেছিলেন সম্ভবতঃ বয়োকনিষ্ঠ কবিরা।

'কবিতা' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আরো কিছু কারণ হয়ত' গবেষণালব্ধ হতে পারে। হয়তো তরুণ কবিদের পত্রিকাগুলি, 'কৃত্তিবাস' 'শতভিষা' 'সীমান্ত' প্রভৃতি, ততদিনে হয়ে উঠেছে তরুণতম কবিদের মুখপত্র। হয়তো একজন প্রবীন, প্রতিষ্ঠিত কবির সম্পাদনায় তরুণদের মুখপত্র প্রকাশিত হওয়ার ঘটনা এতবেশী অস্বাভাবিক, এমন চূড়ান্তরূপে অভূতপূর্ব যে তরুণদের পক্ষে 'কবিতা' পত্রিকার অস্তিত্ব সত্ত্বেও অন্য পত্রিকার প্রয়োজন হয়েছিলো। 'কবিতা'র প্রয়োজন তাই ফুরোলো, যদিও যৌবন তার ফুরোয়নি তখনো।

বুদ্ধদেব বসু স্মরণে

রঞ্জন ভাদুড়ী

আমার যখন বছর-বারো বয়েস, তখন বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। সে-পরিচয় অবশ্য চাক্ষুষ ছিল না, ঐ সময় একখানা বই আমি প্রায় এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলেছিলাম—বইখানার নাম 'ছায়া কালো-কালো'—রহস্য-সিরিজের কিশোর-উপন্যাস। বইটিতে একটি চরিত্রের, সম্ভবত প্রধান চরিত্রের নাম ছিল পরীক্ষিৎ মজুমদার; আর লেখকের নাম বুদ্ধদেব বসু—ব্যস, এ ছাড়া বালক-বয়সে পড়া সেই উপন্যাসের ঘটনাক্রম বিশেষ কিছুই মনে নেই, শুধু এইটুকু মনে আছে যে ঐ বয়েসেই তাঁর ভাষায় সম্মোহিত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, এঁর লেখায় এক আশ্চর্য জাদু আছে। এইভাবে আমার সঙ্গে তাঁর, অর্থাৎ তাঁর নামের প্রথম পরিচয় ঘটে। চাক্ষুষ পরিচয় তাঁর সঙ্গে জীবনে একবারই হয়েছিল—তাও কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তার আগে এবং পরে টেলিফোন বা চিঠি মারফত তাঁর সঙ্গে কতবার বাক্যালাপ করেছি। সেইসব চিঠি বা দূরভাষ অবশ্য তাঁর রচনার গুণগ্রাহিতা-প্রসঙ্গে নয়, নিতান্তই নীরস ব্যাপারে—তাঁর কয়েকখানি গ্রন্থের প্রুফ-দেখা প্রসঙ্গে। লেখক বুদ্ধদেব বসুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা-সমীহা ছিল নীরব, কিন্তু তাঁর একাধিক গ্রন্থের প্রুফ দেখার সময় আমাকে সরব হতেই হত।

তাঁর মৃত্যুর পর প্রখ্যাত ছড়াকার সাংবাদিক শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী লিখেছিলেন—যত লিখেছেন বেশী দেখেছেন প্রুফ। বাস্তবিক, নিজের লেখার প্রতি তো বটেই, তাঁর সম্পাদিত বিভিন্ন গ্রন্থের এবং 'কবিতা' পত্রিকার নবীন লেখকদের লেখার প্রতি তাঁর মমতা ছিল অপরিসীম। তাই তিনি নিজের তো বটেই, বহু পরস্মৈপদী প্রুফও দেখতেন সযত্ন সতর্কতার সঙ্গে। লেখার মতোই, প্রুফ-দেখাও তাঁর কাছে একটা আর্ট। নিজের লেখার বানান ও যতিচিহ্ন সম্বন্ধে তিনি ছিলেন যেমন তন্নিষ্ঠ পরিশীলিত, প্রুফ-দেখাতেও ছিলেন অনুরূপ সিদ্ধহস্ত। এমন-কি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভুল তথা অসঙ্গতিও তাঁর নজর এড়াত না। তাঁর নিজস্ব বানান সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সেই বানানের সংগতি যাতে ছাপার পরেও অটুট থাকে তার জন্যে তিনি ছিলেন সদা সতর্ক। প্রত্যেকটি প্রুফ তিনি খুঁটিয়ে দেখতেন, প্রুফের ওপর পরিমার্জন

পরিবর্তন করতেন। শুধু বানান নয়, প্রুফ দেখার প্রযুক্তি-গত বিদ্যাও তাঁর: বিলক্ষণ অধিগত ছিল—যা অনেক বৃত্তিভোগী প্রুফরীডারের কাছেও শ্লাঘনীয়। এ-ব্যাপারে তাঁর প্রযুক্ত একটি পদ্ধতির উল্লেখ করা যেতে পারে। ধরুন কোনো কবিতা-পুস্তকে একটি কবিতার নতুন স্তবক পরের পৃষ্ঠা থেকে শুরু হচ্ছে, সেক্ষেত্রে দুই স্তবকের মাঝখানের স্পেস দেওয়া হচ্ছে না—দিলেও আগের পৃষ্ঠার নিচে বা পরের পৃষ্ঠার উপরে, যা প্রথমত পাঠকের নজরেই আসবে না, দ্বিতীয়ত নান্দনিক দিক থেকেও সেটা হবে অসুন্দর। অধিকাংশ কবিতার বইতে এক্ষেত্রে দেখা যায় পাঠককে নতুন স্তবক বোঝানোর কোনো নিশানাই থাকে না। কিন্তু বুদ্ধদেব সেক্ষেত্রে নতুন স্তবকের প্রথম পংক্তিটি একটু ভিতরে ঢুকিয়ে দিতেন—ছাপাখানার পরিভাষায় যাকে বলে 'ইনডেন্ট' ক'রে দেওয়া। প্রুফ দেখার প্রযুক্তিগত খুঁটিনাটি নিয়ে তিনি এত বেশী খুঁতখুঁতে ছিলেন যে অনেক সময় প্রেসের কর্মীরা হিমশিম খেয়ে যেত; অনেক সময় তাঁর প্রচলিত-ধারা-বিরোধী সংশোধন-চিহ্ন বুঝেই উঠতে পারত না। একবার তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার একটি প্রুফে দুটি পংক্তিকে চিহ্নিত ক'রে পাশে লিখেছিলেন—Shift right. অর্থাৎ পংক্তি দুটিকে ডান দিকে সরাতে হবে। কিন্তু সংশোধিত প্রুফ যখন পাওয়া গেল, তখন দেখা গেল ঐ ইংরিজি শব্দযুগল শিরোনাম হিসেবে কমপোজ হয়ে গেছে।

হাতের লেখার মতোই প্রুফে তাঁর সংশোধন-চিহ্নগুলো হ'ত ঋজু, বলিষ্ঠ, বুদ্ধিদীপ্ত। প্রেসে বহুল ব্যবহৃত বা অল্পব্যবহৃত অনেক হরফের নাম জানতেন তিনি। বাংলায় বাঁকা হরফ (italics) নেই, তাই বিকল্প হিসেবে হরফের মাঝখানে 'থিন স্পেস' ব্যবহার করতেন। লেখার মাঝখানে মোটা হরফ ব্যবহারের আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। তাঁর প্রিয় হরফ ছিল বর্জাইস। পাদটীকা ছাড়াও কবিতার উপ-শিরোনাম, নিচে উল্লিখিত রচনাকাল ইত্যাদি বর্জাইসে কমপোজ করার নির্দেশ দিতেন। এমন-কি ভূমিকার নিচে নিজের সংক্ষিপ্ত নাম (বু, ব,) বর্জাইসে পছন্দ করতেন। তিনিই বোধ করি সেইসব অঙ্গুলিমেয় বিরল লেখকদের অন্যতম যিনি লেখার নিচে নিজের নামটি ছোট হরফে দেখতে ভালোবাসতেন।

নিজস্ব বানান-প্রকরণে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর বানানের সঙ্গে অন্য লেখকের বানানের তফাত অনায়াসেই চোখে পড়ে। অ-তৎসম শব্দে, বিশেষ ক'রে আরবী-ফারসী শব্দে, তিনি নির্বিচারে 'শ' ব্যবহার করতেন। অসমাপিকা ক্রিয়ায়, এবং ক্ষেত্রবিশেষে সমাপিকা ক্রিয়ার ঊর্ধ্বকমা প্রয়োগের ব্যাপারে

তিনি ছিলেন অব্যর্থসন্ধানী। সমাপিকা 'করে'-র সঙ্গে অসমাপিকা 'ক'রে'-র তফাত বোঝানোর জন্যে পরেরটায় ঊর্ধ্বকমা ব্যবহার আবশ্যিক—এই যুক্তি সর্বাংশে মেনে নিয়েও তাঁকে একবার জিগ্যেস করেছিলাম—অসমাপিকা 'হয়ে' বা 'হলে' ঊর্ধ্বকমা ছাড়াই তো চলতে পারে—এদের বেলায় তো ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা নেই! উত্তরে উনি অবিচলভাবে বলেছিলেন—একজনকে দেব, আর একজনকেই বা বঞ্চিত করব কেন! বানানের ব্যাপারে তাঁকে অনেকে বাতিগ্রস্ত ব'লে থাকেন, হয়তো কিছুটা ছিলেন, কিন্তু খেয়ালখুশি মতো একেকবার একেকরকম লিখতেন না—যে-ভুল অনেক লেখকই ক'রে থাকেন। তাঁর বানান-প্রকরণ অনুসরণ করেছেন তাঁর গুণমুগ্ধ বা মন্ত্রশিষ্য অনেকেই, কিন্তু কেউই সম্ভবত তাঁর মতো সর্বাংশে নিখুঁত নন।

কী ভাষায়, কী বানানে, কী প্রুফ-দেখায় বুদ্ধদেব বসুর ছিল এক অতৃপ্ত অনুসন্ধিৎসা—যার জন্যে তিনি হয়তো জীবনের বহু রাত বিনিদ্র কাটিয়েছেন। তাই হয়তো অনেক অতিপ্রয়োজনীয় আরব্ধ কাজ অসম্পূর্ণ রেখে অসময়ে তাঁকে চলে যেতে হল।

আমার চোখে বুদ্ধদেব বসু

দেবাশিস বসু

আমাদের এই ভাষা যদি টিকে থাকে।
তবে একদিন না একদিন কৃতজ্ঞ রসবেত্তাদের
কেউ না কেউ তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকাটির
কথা লিখবেই, জোর গলায় বলবেই।*

প্রথমেই ব'লে রাখা ভালো, বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে আলোচনার কোনো যোগ্যতাই আমার নেই। তাঁর সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা করবেন গুণীজন—এমনকি তাঁর জীবন নিয়েও তাঁরা তা করতে পারেন। আমি অনধিকারী। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর একজন গুণমুগ্ধ হিসেবে যদি কিছু লিখি, সামান্য দু'চার কথা, বোধহয় খুব দোষের হবে না।

একথা ঠিক যে, তাঁর সব রচনা আমাকে সমান আনন্দ দেয়নি, তাই ব'লে কামান থেকে 'ট্র্যাশ' নামক শব্দের গোলাটি ছুঁড়ে দেয়া কি এতোই সোজা? অথচ, এরকমই অসতর্ক মন্তব্য কেউ-কেউ ক'রে ফেলেন, কত সহজে! যদিও আমরা জানি তাঁর ছেষট্টি বছরের জীবনে সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে কোনো ফাঁকি ছিলো না, শর্ট-কাট ব্যাপারটাতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না মোটেই। না হ'লে বাজারের হাওয়া বুঝে কিছু গরম উপন্যাস লিখেই ক্ষান্ত থাকতেন, হাত দিতেন না জটিল সব বিষয়ের ওপর অমন সুললিত প্রবন্ধ রচনায়। নাটক এবং কাব্য নাটক রচনায়ও অনাগ্রহী থাকতে পারতেন। ক্ষতিটা কার হ'তো? তাঁর, না আমাদের? প্রসঙ্গত আধুনিক কবিতার কথাও এসে পড়ে, আধুনিক কবিতাকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা—প্রায় একক্ও বলা হয়।

'তোমার নিকটে এসে বৃক্ষের ভরোসা পেতো কবি'...শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই একটিমাত্র লাইনেই অনেক কিছু বলা হ'য়ে গেছে।

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বও আমাকে আকর্ষণ করে। এই সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের ছাপ তাঁর রচনাকর্মের মধ্যেই পরিস্ফুট। আরো কিছু জানা যায় কল্লোল-যুগের সময়কার ইতিহাস থেকে এবং 'কবিতা' পত্রিকা সম্পাদনার

ঘরনাটি থেকেও। ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিলেন, আমি তাঁদের দু'চারজনের কাছ থেকেও কৌতূহলবশবর্তী হ'য়ে কিছু কিছু জেনেছি। সব মিলিয়ে মনে-মনে তাঁর যে সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বটি এঁকে তুলেছিলাম, তা মোটামুটি এইরকম :

(১) প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, একই সংগে মানবিক

(২) নিষ্ঠাবান এবং পরিশ্রমী

(৩) অরাজনৈতিক ও আপোষরফায় অবিশ্বাসী

(৪) যা-কিছু মহৎ তার প্রতি আনুগত্য এবং শস্তা স্টান্টকে ঘৃণা করবার মতো সৎসাহস।

তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত অজিত দত্ত, সন্তোষকুমার ঘোষ, দিব্যেন্দু পালিত এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধা আলোচনার অনেক অংশে আমার ধারণার সমর্থনও খুঁজে পেয়েছি।

আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, তাঁর প্রথম মৃত্যু-বার্ষিকীতে কোথাও কোনো স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়নি, যতদূর মনে পড়ে কাগজের কোনোরকম ঘোষণা দেখিনি। আমি জানি, অনেকে বললেন, কী এসে যায়। সত্যি কিছু যে যায়-আসে না তা আমিও স্বীকার করি। তবু ভয় হয়, এভাবে আমরা তাঁকে আস্তে আস্তে ভুলে যাচ্ছি না তো?

কিছুদিন আগে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থানে রিলকে জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হ'লো। এ-ব্যাপারেও বুদ্ধদেব বসুর কাছে আমাদের ঋণ থেকেই যায়। তিনিই প্রথম রিলকে, হেল্ডার্লিন, বোদলেয়ারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন—স্বভাবতই সে-কথাও মনে পড়ে। অনুবাদ-কবিতা কিংবা মৌলিক প্রবন্ধের ভেতর যাওয়ার আগে শুধু ভূমিকা পড়েই কত কিছু জেনেছি। সেই সব ভূমিকা আমাদের পথপ্রদর্শকের কাজ করেছে।

'দেশ' পত্রিকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বুদ্ধদেব বসুর নিন্দুকদের তিন ভাগে ভাগ করেছেন :

(ক) ঈর্ষাপরায়ণ অক্ষম

(খ) রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

(গ) যাঁরা বুদ্ধদেব বসুকে চিনতে পারেননি, এবং নানারকম গুজবে বিশ্বাসী হয়েছেন।

কিন্তু আমার ধারণা এ-ছাড়াও আর একটি দল আছে—সেই দলভুক্তরা শস্তা স্টান্টবাজিতে বিশ্বাসী, চপলমতি এবং কখনো বুদ্ধদেব বসুর কাছে প্রশ্রয়

পাননি। এখন তাঁরা যে তাঁকে হেনস্তা করবার সুযোগ খুঁজবেন এতে আশ্চর্যের কী আছে।

'মেকি লেখকের লক্ষণই এই যে তিনি শ্রমবিমুখ।'—তাঁর এই বিশ্বাস হয়তো আরো অনেকেরই বিশ্বাস। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু নিজের জীবনব্যাপী যে শ্রম ও সাধনার চূড়ান্ত ব্যবহার দেখিয়ে গিয়েছেন তার তুলনা মেলা ভার। সাহিত্যক্ষেত্রে অশিক্ষিত পটুত্ব এবং শিক্ষিত অপটুত্ব দুই-ই সমান উপদ্রব ব'লে তিনি মনে করতেন, এবং আরও অনেক কিছুই তিনি মনে করতেন যা হয়তো চলতি হাওয়ার বিরুদ্ধেই যাবে, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে কোনো ফাঁক ছিলো না। এটিও একটি অন্যতম বিরল গুণ, যে-কারণে বুদ্ধদেব বসু আমার কাছে শ্রদ্ধেয়।

উদ্ধৃতি : সন্তোষ কুমার ঘোষ

অপর্ণার শত্রু বুদ্ধদেব

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রাত্যহিক মৃত্যুসংবাদের তালিকায় বুদ্ধদেব বসুর মৃত্যুসংবাদ একটা ছোট ঘটনামাত্র। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের কতটা ক্ষতি হলো তার পরিমাপ করতে পারবো না, কিন্তু শিল্প-সাহিত্য—সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে অপূরণীয় শূন্যতা—সেটা উপলব্ধি করা যায়। রুদ্ধরতির বিরুবোধে যখন এদেশের গুণীব্যক্তিরা প্রায় সকলেই ভুলতে শুরু করেছেন যে সূক্ষ্ম অনুভূতি ও দক্ষ রূপায়নের সাধনা অকম্প আত্মপ্রত্যয় এবং আদর্শ নিষ্ঠার পরিপন্থী নয়, তখন সেই মারাত্মক বিস্মরণের বিরুদ্ধে প্রায় একক প্রতিবাদ হিশেবে বুদ্ধদেব আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দুঃখের কথা, আজকের দিনে যখন তথাকথিত জনরুচি সেই সব শিল্পকর্মকেই তারিফ করছে, যাতে হয় আছে শস্তা ভাঁড়ামি আর না হয় নির্বোধ ন্যাকামি, যাতে ধর্মের সন্ত্রস্ত অসহায়বোধের সঙ্গে মেশানো আছে ক্লীবের যৌন লালসা কিংবা মাতলামির সঙ্গে ক্রাইমের রোমাঞ্চ, তখন বুদ্ধদেবের মগ্ন কবিচিত্ত স্বাভাবিকভাবেই সমাদৃত নয়।

আসলে বুদ্ধদেব সাহিত্যশিল্পে স্বৈরাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। শিল্পকর্মের ন্যায় সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিলো খুবই পরিষ্কার। তিনি লিখেছেন—"জাগতিক দুঃসময়ের চিন্তা যদি কোনো কবির মনে এমন তীব্রভাবে আঘাত করে যে তিনি কবিতা লেখাই বন্ধ করে দিলেন তাহলে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু যদি তিনি কিছু লেখেন, আজ দুর্দিন বলে সে রচনাকে খাতির করলে চলবে না, দেখতে হবে সেটা শিল্পের আদর্শে উত্তীর্ণ হলো কিনা। আমি যদি আমার রচনায় ধনতন্ত্রের কালান্তক মূর্তির বর্ণনা করি তাহলেই যেমন লাফিয়ে ওঠার কিছু নেই তেমনি যদি প্রিয়ার আঁখির বন্দনা করি তাতেও হতাশ হবার কারণ দেখিনা। যে কোনো অবস্থায়, যে কোনো দুরবস্থায় উভয় বস্তুই কাব্যের বিষয় হতে পারে এবং উভয় ক্ষেত্রেই শুদ্ধ এটুকু বিচার করতে হবে যে রচনাটা 'যথার্থ সাহিত্য হয়েছে কি না'' (সব পেয়েছির দেশ) প্রকৃতপক্ষে, তাঁর মতে মহৎ কাব্য আত্মতুষ্টি বা পাঠকতুষ্টির উপাদান নয়, বরং তাতে পাওয়া যায় আত্ম উন্মীলনের সূক্ষ্মসতেজ অনুসন্ধান, মানবাত্মার একটি নিবিড় আকাঙ্খা, আহ্বান ও আবেদন। তাই তিনি রুদ্ধ ঘরে সঙ্গীহীন হয়ে আত্মরতির সম্মোহনে

দিন কাটান নি। তিনি বিশ্বাস করতেন কবিগুরু কথিত 'জীবনদেবতা' নয়, কোনো রহস্যময়ী দৈবশক্তি নয়, মানুষই ক্লান্তিহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লাভ করেছে আত্মপ্রকাশের অধিকার। তিনি লিখেছেন—আমি যে রচিবো কাব্য এতদ্দেশ্য ছিলো না স্রষ্টার/তবু কাব্য রচিলাম, এই গর্ব বিদ্রোহ আমার।

আমরা স্বকৃত নিয়মের ও প্রকৃতির ও কারাগারে বন্দী এবং একেই আমরা বিধাতা-নির্দিষ্ট ভাগ্য বলে মেনে নিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকি। কবি বুদ্ধদেব প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, অভ্যাসেব জোয়ালটানা আপ্তবাণীর জাবরকাটা অর্থহীন জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। কোনোরকম ভণ্ডামিকে প্রশ্রয় দেননি তিনি। ভিক্টোরীয় কবিতার ঐতিহ্যে ফেঁপে ওঠা প্রেমের তথাকথিত বিদেহী সত্তাকে তিনি রুদ্ধরতিপ্রসূত বিকার বলে মনে করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে প্রেম —ক্ষণিকের উত্তেজনা—সেই জীর্ণ, পুবাতন চুম্বন-আশ্লেষ...ফলে সীতাসাবিত্রীর চিরন্তনী সতীত্বের আদর্শ এবং কালিদাসেব প্রেমাদর্শ—যা দার্শনিকদের বাক্‌বিস্তারে অসম্ভব রাজ্যের এক অপ্রাকৃত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে, তাকে ধিক্কার জানিয়েছেন। তিনি জানেন, সীতাসাবিত্রীর উপর চাপিয়ে দেওয়া প্রেমাদর্শের দার্শনিক তাৎপর্য আসলে সামাজিক কদর্যতাকে চাপা দেওয়ার প্রয়াস মাত্র। কারণ—

শয্যাকক্ষে একনিষ্ঠতায়
সীতার সতিত্ব শিক্ষা, সন্তানের বহুবচনতা
সাবিত্রীর সুপবিত্র প্রেমের লক্ষণ
অথবা
কুমারীত্ব করিতে মোচন
পটুতার নাহি ছিলো সীমা নারীমেধ যজ্ঞমাঝে
ইন্ধন হয়েছে শত শকুন্তলা

বুদ্ধদেবের মৃত্যুতে তার বাংলাদেশ হারিয়েছে একজন সত্যান্বেষীকে, যিনি সুধীন্দ্রনাথের মতোই বিশ্বাস করতেন, কাব্যের পথে উল্লম্ফন চলে না; সে পথের প্রতিটি খাত পদব্রজে তরনীয়, প্রতিটি ধূলিকণা শিরোধার্য এবং পথের প্রতিটি কণ্টকই রক্তপিপাসু।

বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে

সুবো আচার্য

১. বুদ্ধদেব বসুর জীবনাবসানের ঘটনা আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন জাগ্রত, চেতনাশীল, এবং বড়ো লেখকদের কুয়াশাময় অহমিকা তাঁকে নষ্ট করতে পারেনি।

২. তাঁর গদ্য, গদ্যের ভেতরকার কিছু কিছু অন্তঃসার ও অসাধারণ ভাষা আমায় প্রেরণা দেয়। তাঁর গদ্য থেকে আমি লেখার মতো কিছু পাই, যা অন্য কোন বাঙালী লেখকের গদ্যে পাই না।

৩. তাঁর কবিতা, 'বন্দীর বন্দনা' ও শেষপর্বের কবিতা আমার ভালো লাগলেও মাথার ভিতরের শেকড়ে টান পড়ে না' চড়চড় করে খুলি ফাটে না, সেরকম অগ্নি-সাক্ষাৎ হয় না তাঁর কবিতা পড়ে।

৪. কখনও কখনও তাঁকে দুঃখবিলাসী মনে হয়েছে। এ নিশ্চিত অশ্লীল।

৫. আধুনিক জীবনের বিষম জটিলতা থেকে তাঁর রচনা কিছুটা মুক্ত বলেই আমার আপত্তি। পাণ্ডিত্য ও ইন্টেলেকটের যে পদ্ধতি তাঁর নিজস্ব ছিল, তা আমার খুবই শ্রদ্ধেয় মনে হয়। এমনও হতে পারে, আধুনিক সাহিত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে লড়াই করেছেন তাতে লাভবান হয়েছি আমরা সকলেই কিন্তু জীবনীশক্তির অপচয় হয়েছে তাঁর।

৬. 'বিপন্ন বিস্ময়' নামক তাঁর উপন্যাসটি আমার প্রিয়। পাঠক, এই বইটি থেকেই আমি প্রথম আধুনিকতার সূত্র খুঁজে পাই।

৭. তাঁর রাসবিহারী এ্যাভেন্যু ফ্ল্যাটে আমি একবার গিয়েছিলাম, ১৯৬২ সালে; ইনফ্লুয়েঞ্জায় শুয়েছিলেন তিনি, তবু সামান্য একটু সময় আমায় দিয়েছিলেন। তুলনামূলক সাহিত্যের, ক্লাসে আমি ভর্তি হয়েছিলাম তাঁরই পরামর্শে।

৮. হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন 'ওরা নিরক্ষর।' এটা এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার বলে আমার মনে হয়নি। প্রত্যেক প্রতিভাবান লেখকই তাঁদের পরবর্তী কালের লেখকদের সম্পর্কে অসহিষ্ণু হন; 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' যাঁর মানসিক প্রশান্তি ও ধৈর্য ছিল অবিচল, তিনিও তরুণ লেখকদের

সম্পর্কে বক্র মন্তব্য করেছেন। বুদ্ধদেবের ঐ মন্তব্য হাংরিদের নিঃসংশয় শক্তিরই প্রমাণ বলে আমার মনে হয়।

৯. অত্যন্ত বেশী পড়াশুনো তাঁর রচনার কিছু ক্ষতি করেছে। গ্রন্থ এবং জীবন অথবা শিল্প এবং জীবন একরকম নয়; শিল্প মানেই একটু খাদ একটুখানি ভানও অভিনয়—বুদ্ধদেব ছিলেন প্রকৃত অর্থে শিল্পী। শিল্পের জন্য দুঃখবরণও তিনি করেছেন।

১০. তাঁর রচনায় জীবনের ক্রূরতা ও ভয়াবহতা, অন্ধকারাচ্ছন্ন দুঃখ ও সূর্যোকরোজ্জ্বল সত্যের ইশারা, আমার প্রার্থনা অনুযায়ী, কম পাই।

১১. তিনি তাঁর জীবনকে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। শুধুমাত্র লেখালিখি যে একজন মানুষকে গৌরবময় ও উজ্জ্বল জীবন দিতে পারে তিনি তাঁর দৃষ্টান্ত।

১২. জীবনের প্রথম ও শেষপর্বে তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে—অশ্লীলতার অভিযোগে, সেই তাঁকে, যিনি মনে করতেন সার্থক সাহিত্যমাত্রই "ভগবানের বন্দনা"।

১৩. রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের রচনার মর্মে ঢোকার ব্যাপারে তিনি সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেন।

১৪. আমার সাহিত্যবোধ গড়তে তাঁর রচনা আমায় সাহায্য করেছে অসম্ভব পরিমাণে, আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করি।

১৫. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে তাঁর মোহ ও উচ্ছ্বাস অকারণ মনে হয়—তিনি সুধীন্দ্রনাথের রচনা সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ করেছেন তার প্রসাদগুণ আমাকে আকর্ষণ করলেও।

১৬. যে জীবনের কবিতা বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন সেই জীবনের কোন ভগ্নাংশের অস্তিত্ব আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় না। যে মূল্যবোধগুলি তিনি বিশ্বাস করেছেন, না-ভেঙে গ্রহণ করেছেন, সেগুলি একান্তভাবে তাঁর অস্তিত্বেরই ব্যাপার—সুতরাং আমাদের জীবনদর্শনে তাঁর মৌলিক প্রভাব অথবা অন্তর্দর্শনের প্রভাব প্রায় নেই বললেই চলে।

একটা প্রধান সাদৃশ্য অবশ্যই আছে—তিনি, জীবনের মধ্যপর্ব থেকে আত্মদর্শনের দিকে জোর দিয়েছেন, আমরাও আত্মদর্শনের দিকে মূল শক্তি নিয়োগ করি। তাঁর শেষপর্বের কবিতা, যেগুলি প্রেমের কবিতা নয়, আমার মানসলোকে কিছু তীব্র ছাপ রাখে। তবে যে নির্বিকারতা, নিরাসক্তি এবং শান্তভাব তাঁর আছে সেটা অবশ্যই আমার ঈর্ষাযোগ্য মনে হয়।

বুদ্ধদেব ছিলেন ভালোবাসার, শান্তির স্বস্তি ও আনন্দের কবি। চির-প্রবহমান সংশয় ও ধ্বংসের ঝড় তাঁকে টানতে পারেনি।

আমরা ঠিক কবি নই, কবিকে আমাদের ভালোলাগা সত্ত্বেও—আমরা আবিষ্কারক, আমরা সত্যপিপাসু, সত্যাশ্রয়ী ও সত্যকে অবিকল দেখতে চাই। কোনরকম মনসাফাই-এ আমাদের বিশ্বাস নেই।

নেই, সেজন্যেই যে বোদলেয়ার ও রিলকে-কে তিনি আবিষ্টের মতো গ্রহণ করেছিলেন, আমরা তাঁদের প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হই। বোদলেয়ার রিলকে, বুদ্ধদেব বসু যতো বড়ো কবিই হন, একজন মানুষের সত্যতাকে নিজেকেই আবিষ্কার করে নিতে হয়। এবং সেই জগতে প্রত্যেক স্রষ্টাই বড়ো অসহায়ভাবে একা।

বুদ্ধদেব বসুর রামায়ণ ভাবনা

ড: প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

বিশ শতকের নাগর-কবি বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮—১৯৭৪) ধ্যানে-ধারণায়, আত্মায়-মননে যে মুক্তির সন্ধানী ছিলেন—সে মুক্তি নির্বাণ-কল্প নয়, নির্বিকল্প শৈল্পিক চেতনার মুক্তি। মানবমনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিল গ্রন্থিমোচনের সংগে একজাতীয় প্রসন্ন-দীপ্ত মুগ্ধতাবোধ যা আত্মময়তার প্রকাশ-রূপে বিধৃত এবং যাঁকে ঘিরে তাঁর কবি-প্রত্যয় আবর্তিত, প্রতিধ্বনিত এবং সর্বত্র সঞ্চারী। প্রতিভা তাঁর বিচিত্রমুখী, গভীরতা ও বৈচিত্র্যও অনিঃশেষ। আর সেই প্রতিভাজাত ফসলও আধুনিক মানসিকতায় পরিশীলিত, নতুন শিক্ষা-সংস্কৃতির স্পর্শে সঞ্জীবিত, নতুন ভাব ও ভাষার বিন্যাসে ব্যক্তি-মুক্তির ভাববহ ! আর এই বিপুল-ব্যাপ্ত ভাব পরিচয়ের ক্ষেত্রে প্রাচ্য-প্রতীচ্য সংযোগ-সম্পর্কের এক অননুকরণীয় শিল্প-ব্যক্তিত্ব বুদ্ধদেব বসু। বোদ্‌ল্যার-রিল্‌কে-হেল্ডারলিন থেকে বাল্মীকি-ব্যাসদেব-কালিদাসে তিনি সম-পরিমাণেই আত্মস্থ। বাক্‌-ছন্দের সংগে কাব্য-ছন্দের মেল-বন্ধনের যে সাধনায় বুদ্ধদেব আজীবন নিরত—বাক্যরীতি সেখানে মৌখিক-রীতি থেকে ভ্রষ্ট না হয়েও 'সগম্ভীর সাংস্কৃতিক'। এই রীতির সাধনার সপক্ষে তিনি মন্তব্য করেছেন: "সংস্কৃত শব্দ বেশি করে নিলে রচনায় যে দৃঢ়তা ও সংহতি আসে সেটা ছাড়বো কেন ? কাব্যরচনার যে বহু-ব্যবহৃত পদ্ধতি থেকে মুক্তির চেষ্টায় গদ্য কবিতার উদ্ভব, সে মুক্তি পদ্যে আবদ্ধ থেকেও অর্জন করা অসম্ভব নয়। আমি দেখছি পদ্যকে দিয়েও গদ্যের কাজ করিয়ে নেওয়া যায়·· অধুনা পদ্যের সেই রূপটিই আমার মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করছে।···নানা সময়ে নানা কবিতা লিখতে বসে এই ধারণাই আমার মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে যে, বাক্‌রীতির সংঙ্গে কাব্যনীতি মেলাতে হলে পয়ারই শ্রেষ্ঠ বাহন—পয়ার শতরূপী ও সর্বব্যাপী।" কাব্যচেতনার আধুনিকতার প্রতিনিধি হয়েও পয়ারের মধ্যে প্রাণাবেগের ধ্যান-মূর্তিকে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। শিল্পের ভাবরূপ ও আঙ্গিকের মধ্যে আধুনিকতা ও পুরাতনী রীতিকে এক সমন্বয়ী দৃষ্টিতে তিনি মিলিত করে দিয়েছেন, এক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানরীতির মধ্যে আন্তরিকতায় তাকে লালন করেছেন। পুরাতনী চালচিত্রকে সাহিত্যে ব্যবহার করে কাহিনীর সিদ্ধরসের রূপাঙ্গিকে নবচেতনায় ও

রূপরূপে অভিষিক্ত করেছেন। শিল্পী হিসেবেও বুদ্ধদেব কোন চিহ্নিত কাল-পরিধির সীমায় নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চাননি।

বুদ্ধদেব বসুর পুরাণ-চেতনায় বা প্রাচ্যবিদ্যাচর্চায় রামায়ণ-মানসিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। 'আমার যৌবন' গ্রন্থের ২৮ চিহ্নিত অধ্যায়ে তিনি উল্লেখ করেছেন : "কলকাতা বাসের আরম্ভকালে নিজেকে আমি নাট্যকার রূপে কল্পনা করেছিলাম…প্রভুচরণ নানা দেশের নাটক দেখেছেন, গবেষণা করেছেন বাংলা নাটকের বিবর্তন নিয়ে—কলকাতার নাট্য জগতে তিনি সম্মানিত। তাঁর সাহায্যে থিয়েটারের অন্দরমহলে আমার প্রবেশ ঘটল, পরিচয় হল বিখ্যাত মঞ্চাধিকারী হারাণ ঠাকুরতা বা প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয়ের সংগে….তারই ধাক্কায় রচিত বা নির্মিত হল আমার 'রাবণ' নাটক….আমার ঢাকা-জীবনের সর্বশেষ রচনা।…আমি চেয়েছিলাম পুরোদস্তুর মঞ্চোপযোগী হতে, মেনে নিয়েছিলাম শ্যামবাজারিক সব বিধি-বিধান। পাঁচ-অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক, সখীবৃন্দ-কর্তৃক অনুষ্ঠিত নৃত্যগীত কিছুই আমি উপেক্ষা করিনি। সরমা আছেন সীতা দেবীর সান্ত্বনা-দাত্রী, রাবণের সমালোচক আছেন বিভীষণ, অশোকবনে ও রাবণের সভায় মঞ্চ সজ্জার অবকাশ আছে। সবই বলা যায় গতানুগতিক—আমার নতুনত্ব শুধু এটুকুতে যে আমার রাবণ পুরোপুরি একটি দুরাত্মা নন, সীতাকে হরণ করে এনে এখন চান হৃদয় দিয়ে তাঁকে জয় করতে—তাঁর মনের একটি অংশে তিনি ভাবপ্রবণ। এই প্রথাচ্যুত রোমান্টিক রাবণকে গ্রহণ করলেন হারাণ ঠাকুরতা—তিনি তখন ষ্টার ছেড়ে দিয়ে নতুন খুলেছেন নাট্য-নিকেতন। মহড়া থেকে পোস্টার পর্যন্ত এগিয়ে গেল আমার নাটক।" কিন্তু বুদ্ধদেবের 'রাবণে'র উদ্বোধনী রজনী কোনদিনই আসেনি। সেদিন রামায়ণ অবলম্বী বুদ্ধদেবের 'রাবণ' নাটকের বিরুদ্ধে প্রধান অভিনেত্রী শ্রীমতী নীহারবালা এবং অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বুদ্ধদেবের সংলাপরীতি প্রসংগে আপত্তি তুললেন। আপত্তির কারণ বিষয়ে বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন : "আমার ভাষা আর একটু 'রিমোট' হলে ভালো হত—আমি বুঝে নিলাম রাবণ-সীতার মুখে সমকালীক চলতি ভাষা বসানো আমার ভুল হয়েছিল।" বুদ্ধদেবের রামায়ণ-কেন্দ্রিক এই পুরাণ-চেতনাই পরবর্তিকালের পুরাণ-অবলম্বী রচনাগুলির অঙ্কুর-পর্ব। প্রথম জীবনের ব্যর্থ নাট্যকার জীবনের স্বপ্ন—জীবনের উপান্ত লগ্নের মহাভারত-কেন্দ্রিক নাট্যরচনার মূলে শেষ পর্যন্ত সক্রিয়। প্রথম শিল্পী-জীবনের রামায়ণ-মানসিকতাই এর পশ্চাতে দৌত্য করেছে। রাবণকে 'দুরাত্মা রূপে চিহ্নিত না করে তাকে মানবিক ও রোমান্টিক করে তুলবার যে চেতনা—মহাভারত-কেন্দ্রিক রচনাগুলির মধ্যেও প্রাথমিক পর্বের সেই শিল্পধারণাই আরও পূর্ণতর প্রত্যয়ে

প্রতিষ্ঠিত। সংলাপে সমকালীন চলতি ভাষার ব্যবহার রীতিই মহাভারত-কেন্দ্রিক নাট্যকবিতাগুলির রচনারীতিতে অনুসৃত। কাজেই জীবনের প্রথম নাট্যরচনার যে আকাঙ্ক্ষিত স্মৃতি—যার মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব তাঁর অপরিতৃপ্ত শিল্প-অভিপ্রায়কে শেষ জীবনে সার্থক ও প্রত্যয়দীপ্ত শিল্পসামর্থ দিয়েছিলেন মহাভারত-কেন্দ্রিক নাট্যকাব্যগুলি রচনা করে। সুতরাং পুরাণ-চেতনা তাঁর শিল্প-অভিপ্রায়কে শেষাবধি নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাঁর পুরস্কৃত কাব্যগ্রন্থ 'স্বাগত বিদায়ের' নাম-কবিতাতেও বিদেশবাসের পটভূমিতে বৃষ্টির ধারাপাতের অজস্রতায় অবচেতন-মনের স্মৃতি-শৈশবকে যখন স্মরণ করেছেন—তখন রামায়ণ-মানসিকতাটিপুনরুজ্জীবিত হয়েছে—'কাঁথার স্পর্শে, শ্যাওলার বিস্ময়ে, শব্দের আদরে মাথা অফুরাণ ছোট্ট রামায়ণ' বাঙ্‌মুখর হয়ে উঠেছে। এই প্রসংগে বুদ্ধদেব বসুর 'হনুমানের জীবন ও মৃত্যু' কবিতাটির গুরুত্বও স্মরণযোগ্য। হনুমানের মধ্যে মানবিকচেতনা এনে তিনি চরিত্রটির অভ্যন্তরে রোমান্টিকতার রঙ্‌ ছড়িয়েছেন। হনুমানকে বিশাল সমুদ্র অতিক্রম করতে হবে অথচ তার পন্থা তাব অজানা। কল্পনায় উদিতা সীতার দুঃখিনী মূর্তিই মানবিক সংবেদনায় তাকে সমুদ্র অতিক্রমের প্রেরণা যোগাল। কিন্তু প্রভুভক্ত হনুমানের মধ্যে পুরাণ-অতিক্রমী নব মানবানুভূতি সঞ্চার করেছেন বুদ্ধদেব। হনুমানের রোমান্টিক অনুভূতিলোকে সে আজ নির্বিশেষ রাজপুত্র—সীতা বন্দিনী রাজকন্যা। সেই রাজকন্যার উদ্ধারব্রতে রাজপুত্রের রোমান্টিক হৃদয়-সংবেদনাই কার্যকর। এই অনুভূতিরই স্পষ্ট হনুমানে হনুমান পশুত্ব বর্জন করেছে। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতোই হনুমান এক আবেগ-তপ্ত হৃৎপিণ্ডের বিস্মিত আবির্ভাব নিজের মধ্যে লক্ষ্য করেছে। জান্তব দেহে নূতন হৃৎস্পন্দন অনুভব করে 'মানুষ হবার পর হনুমানেব দ্বিতীয় অনুভূতি' জেগেছে। কিন্তু তার মৃত্যু হল বিকারে, বিভ্রমে ও বিস্মরণে—'যে কোন জন্তুর মতো মৃত্যু হল তার।'

'সাহিত্যচর্চা' প্রবন্ধ-গ্রন্থের 'রামায়ণ' প্রবন্ধে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছোট্ট রামায়ণ' প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—'ছোট্ট, সচিত্র, বিচিত্র মধুর, সে বই ছিলো আমার প্রিয়তম সংগী……কিন্তু শুধু পদাবলী আউড়ে আমার তৃপ্তি নেই, রামলীলার অভিনয়ও করা চাই। বাঁশের তীর ধনুক হাতে নিয়ে বাড়ির উঠোনের রঙ্গমঞ্চে আমার লম্ফঝম্ফ: আমিই রাম এবং আমিই লক্ষ্মণ, আর ঐ যে মাচার লাউ-কুমড়ো ফোঁটা ফোঁটা শিশিরে সেজে আছে—ঐ হল তাড়কারাক্ষসী। সীতাকে না হলেও তখন আমার চলতো, এমন কি রাবণকে না হলেও—কেননা রাম-লক্ষ্মণের বনবাসের অমন অপরূপ মূর্তিটা হ'ল তো সীতা-রাবণের জন্যেই।'

রামায়ণ-বর্ণিত নদী-বন-পাহাড়ের মধুর ও স্বপ্নাবিষ্ট নামগুলি কবি বুদ্ধদেবকে ছবির তন্ময়তার মগ্নমানস করে তুলেছে, সমস্ত চৈতন্য জুড়ে সংগীতের ব্যাপ্তি এনেছে, মন্ত্রবৎ সংহতিতে বুদ্ধদেব ভাবাবিষ্ট হয়েছেন আর সেই সংগে জাগ্রত হয়েছে তাঁর সদানিবিষ্ট কবিপ্রাণের ভাব-ভাবনা—"কবিতার যাদুবিদ্যার সংগে সেই আমার প্রথম পরিচয়।" কৃত্তিবাসের সংগে পরিচয়ে অসম্ভব ভালো লাগার কোন স্মৃতি মনে আনতে পারেননি বুদ্ধদেব। বাল্মীকি আর বাঙালীর মধ্যে দেব ভাষার ব্যাবধান উনিশ শতকীয় উদ্দীপনার দিনেও কেন দূরীভূত হয়নি তা নিয়ে বুদ্ধদেবের চেতনায় ক্ষোভ ছিল। এই প্রসংগেতিনি যে তুলনামূলকআলোচনা করেছেন—তার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে বুদ্ধদেব-মানসের রামায়ণ—রসরসিকতার পূর্ণায়ত পরিচয় মেলে—"বলা বাহুল্য, কৃত্তিবাস বাল্মীকির বাংলা অনুবাদক নন, তিনি রামায়ণের বাংলা রূপকার; তাঁর কাব্যে রাম-লক্ষ্মণ সীতা শুধু নন, দেব-দানব-রাক্ষসেরা সুদ্ধ, বাঙালী চরিত্র, গ্রন্থটির প্রাকৃতিক এবং মানসিক আবহাওয়া একান্তই বাংলার। এ কাব্য বাঙালীর মনের মতো হ'তে পারে, কিন্তু এর আত্মার সংগে বাল্মীকির আত্মার প্রভেদ রবীন্দ্রনাথের 'কচ ও দেবযানীর সংগে মহাভারতের দেবযানী উপাখ্যানের প্রভেদের মতোই, মাপে ঠিক ততোটা না হ'লেও জাতে তাই।' কৃত্তিবাসের রামায়ণের রম্যকাননে আদি-কবির রূপদী সাহিত্যিক রীতি তিনি প্রত্যাশা করেননি। আদি মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যকে বুদ্ধদেব নিরাসক্ত ও নির্মম বাস্তবিকতা রূপে বিবৃত করেছেন—বলেছেন, সম্পূর্ণ সত্যের নির্বিকার দর্পণ। মহাকাব্যকে বুদ্ধদেব পৃথিবীর সেই কিশোর বয়সের সৃষ্টি রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। সেই 'কৈশোর-সরলতাকে' কিংবা মহাকাব্যিক অচেতন সত্যনিষ্ঠা থেকে মুক্ত হয়ে পুরাণের কিঞ্চিৎ পুনর্জন্মের শৈল্পিক তাৎপর্য নির্ণীত না হলে সাহিত্যকলার বিচিত্র ঐশ্বর্যের অবিরাম উদ্ভাসিত রূপের পরিচয় দুর্লভ হতো বলেই বুদ্ধদেবের সমালোচক সত্তা বিশ্বাসী। মহাভারতের অপরিসীম ও অনির্বচনীয় জীবনের ব্যাপ্তির তুলনায় রামায়ণের মূল্যায়ন প্রসংগে বুদ্ধদেব বলেছেন : "শুধু পৃষ্ঠাসংখ্যায় নয়, জীবন-দর্শনের ব্যাপ্তিতেও রামায়ণ অনেকটা ছোটো। কিন্তু কাব্য-হিসাবে—এবং কাহিনী হিসেবেও—তাতে ঐক্য বেশী, এবং আমরা যাকে কবিত্ব বলি তাতে রামায়ণ সম্ভবত সমৃদ্ধতর। এটা ভালোই, যদি আধুনিক সাহিত্যের ঐশ্বর্য-জটিল বিশাল প্রাসাদ ছেড়ে আমরা কখনো-কখনো বেরিয়ে পড়ি বাল্মীকির তপোবনে পৃথিবীর কৈশোর-সারল্যে, মানবজাতির শৈশবের স্বতঃস্ফূর্ততায়।'

রাজশেখর বসুর বাল্মীকি-রামায়ণের সারানুবাদ প্রসংগে বুদ্ধদেব বসু

যেখানে রসপ্রমাতা—সেখানে রামায়ণ-বিষয়ক ধারণার সম্পূর্ণতাও তিনি প্রকাশ করেছেন। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষা ও শরৎ ঋতুর বর্ণনা কৃত্তিবাস পরিহার করেছেন। কিন্তু রাজশেখর বসু বাল্মীকির অনুসরণেই তাকে রূপান্তরিত করেছেন। এই প্রসংগে বুদ্ধদেবের মন্তব্য তাঁর রামায়ণ বিশ্লেষণের পূর্ণতার দাবী রাখে—'কবিত্ব, নাটকীয়তা এবং চরিত্রণ তিন দিক থেকেই এই ঋতু বিলাস সুসংগত ও সুন্দর। ঘনজটিল বনের ভিতর চলতে-চলতে হঠাৎ যেন একটি স্বচ্ছ-নীল হ্রদের ধারে এলাম, সেখানে নৌকো আমাদের তুলে নিয়ে জলের গান শোনাতে লাগল: ওপারে জটিলতর পথ, কুটিলতম কাঁটা—কিন্তু এই অবসরটুকু এমন মনোহরণ তো সেইজন্যই। বনবাসের দুঃখ সীতা-হারানোর দুঃখ, বালীবধের উত্তেজনা ও অবসাদ—সমস্ত শেষ হয়েছে, সামনে পড়ে আছে মহাযুদ্ধের বীভৎসতা: দুই ব্যস্ততার মাঝখানে একটু শান্তি, সৌন্দর্য সম্ভোগের বিশুদ্ধ একটু আনন্দ। এই বিরতির প্রয়োজন ছিলো সকলেরই—কাব্যের, কবির এবং পাঠকের, আর সব চেয়ে বেশি রামের।"

বুদ্ধদেব গণমানসে 'যুগে যুগে রূপান্তর ও ভাবান্তরের' মধ্য দিয়ে লোকোত্তর পুরুষরূপে পর্যবসিত রামচন্দ্রের চরিত্র প্রসংগে আধুনিকোত্তম মতবাদ দিয়েছেন—"আদি রামের মহিমা অনেকটা জুলিয়াস সীজারের অনুরূপ, যে রামরাজ্য আর সাম্রাজ্য আসলে অভিন্ন, যে সাম্রাজ্যবাদের উচ্চতম আদর্শের মহত্তম ব্যঞ্জনা যেমন সীজার জীবনে, তেমনি রাম-চরিতে। তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ কূটনীতিজ্ঞ বাল্মীকি পড়ে তা ভালোই জানা যায়, শ্রেষ্ঠ এই কারণে যে কূটনীতির সংগে ধর্মনীতিকে মোটের উপর মেলাতে পেরেছেন।" আধুনিক যুগের সংস্কার নিয়ে রামায়ণের যথোচিত বিচার যে সম্ভব নয়—এ-বিষয়ে বুদ্ধদেব রাজশেখর বসুর মতামতের সমর্থক। রামচন্দ্রের মানবীয় রূপকে বুদ্ধদেব সর্বদেশের সর্বকালের মনুষ্যত্বের মহত্তম আদর্শ রূপে ব্যাখ্যা করেছেন—"দেহধারী মানুষ হ'য়ে, স্থানে ও কালে সীমিত হয়ে, যতটা মুক্ত, শুদ্ধ সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব, রামচন্দ্র তা-ই।" বালী হত্যার হীনতা, সীতা বর্জনের কলঙ্ক, শম্বুকবধের অপরাধ ইত্যাদি অন্যায় করেছিলেন বলেই তাঁর নরজীবন সার্থক—নচেৎ তাঁর 'মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকতো, তবে তিনি হতেন নিয়তির অতীত, প্রকৃতির অতীত, অর্থাৎ আমরা তাঁকে আমাদের একাত্ম বলে মনে করতে পারতাম না—আর তাহ'লে রামায়ণের কাব্যগৌরব কতটুকু থাকতো?...... আদি কবির নির্ভুল বাস্তবিকতা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছে যে মহামানব তিনি নন, কিন্তু তিনি যে মানব, এই সত্যটাই মহান।" রামায়ণের ঘটনাচক্রে

এই মনুষ্যত্বের বহুল বিচিত্র কল্পনার উপলক্ষ হিসেবে বুদ্ধদেব ব্যাখ্যা করেছেন।

বুদ্ধদেবের নিজস্ব পরিকল্পনায় রামায়ণের অসংখ্য অসংগতির প্রসংগও উত্থাপিত হয়েছে। সম্ভাব্য কৌতূহলের সেই সম্পূর্ণ উপেক্ষা বিষয়ে উপেক্ষিতা ঊর্মিলাকে বিখ্যাত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বুদ্ধদেব আলোকপাত করেছেন অন্যত্র: "কেউ হয়তো বললেন যে রাম ছাড়া অন্য সকলেই তাঁর কাছে উপেক্ষিত: অন্য সব চরিত্রই খণ্ডিত, মাত্র একটি লক্ষণ-সম্পন্ন; লক্ষ্মণ শুধুই ভাই, হনুমান শুধুই সেবক, রাবণ শুধুই শক্তিশালী—একমাত্র রাম সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ। কিন্তু রামের সম্বন্ধেই কবির উপেক্ষা কি কম! রাম প্রেমিক, রাম-সীতার জীবন দাম্পত্যের মহৎ আদর্শ, কিন্তু তাঁদের যুগল-জীবনের পরিধি কতটুকু!…যখন সীতাহরণ, যখন পুনর্জিতার প্রত্যাখ্যান, যখন গণরঞ্জনী সীতাবর্জন—এই তিনবারের একবারও রামকে তেমন শোকার্ত আমরা দেখলাম না, মনে মনে বললাম, রাজধর্মের তাগিদে না হয় বাধ্যই হয়েছিলেন, তাই বলে দুঃখও কি পেতে নেই।……কিন্তু রামের উদাসীনতায়, কিংবা রামের প্রতি কবির উদাসীনতায়, আমাদের মনে যে দুঃখ, সেই দুঃখই তো রামের।" আদি-কবির এই উদাসীনতাকে শিল্পপ্রজ্ঞায় ব্যাখ্যা করেছেন বুদ্ধদেব বসু—"হয়তো উদাসীনতাই অভিনিবেশের চরম, হয় তো উপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ নিরীক্ষা, হয়তো শিল্পহীনতার অচেতনেই শিল্পশক্তির এমন একটি অব্যর্থ সন্ধান ছিলো, যা ফিরে পেতে হলে সমস্ত সভ্যতা লুপ্ত ক'রে দিয়ে মানবজাতিকে আবার নতুন ক'রে প্রথম থেকে আরম্ভ করতে হবে।"

রামায়ণ-চিন্তা এবং বিশ্লেষণ বুদ্ধদেব-মানসের ও তাঁর শিল্পী-আত্মার একটি বিশিষ্ট পাঠ।